উপক্রমণিকা

মহান দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র বসুর নামাঙ্কিত নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনে আপনাকে স্বাগত। ২০২১-এ এই প্রতিষ্ঠান দেশের সর্বপ্রথম রাজ্য সরকারি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ন্যাক (NAAC) মূল্যায়নে "এ" গ্রেড প্রাপ্ত হয়েছে এবং ২০২৪-এ সমগ্র দেশের মুক্ত শিক্ষাব্যবস্থাক্ষেত্রে NIRF মূল্যায়নে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। পাশাপাশি, ২০২৪-এই 12B-র অনুমোদন প্রাপ্তি ঘটেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন প্রকাশিত জাতীয় শিক্ষানীতি (NEP, ২০২০)-র নির্দেশনামায় সিবিসিএস পাঠক্রম পদ্ধতির পরিমার্জন ঘটানো হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes (CCFUP)-এ চার বছরের স্নাতক শিক্ষাক্রমকে ছ'টি পৃথক প্রকরণে বিন্যস্ত করার কথা বলা হয়েছে। এগুলি হল- "কোর কোর্স", "ইলেকটিভ কোর্স", 'মাল্টি ডিসিপ্লিনারি কোর্স' "স্কিল এনহান্সমেন্ট কোর্স", "এবিলিটি এনহ্যান্সমেন্ট কোর্স" এবং ভ্যালু অ্যাডেড কোর্স। ক্রেডিট পদ্ধতির ভিত্তিতে বিন্যস্ত এই পাঠক্রম শিক্ষার্থীর কাছে নির্বাচনাত্মক পাঠক্রমে পাঠ গ্রহণের সুবিধে এনে দেবে। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ষান্মাসিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা এবং ক্রেডিট ট্রান্সফারের সুযোগ। জাতীয় শিক্ষানীতি পরিমাণগত মানোন্নয়নের পাশাপাশি গুণগত মানের বিকাশ ঘটানোর লক্ষ্যে National Higher Education Qualifications Framework (NHEQF), National Credit Framework (NCrF) এবং National Skills Qualification Framework (NSQF)-এর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে চার বছরের স্নাতক পাঠক্রম প্রস্তুতির দিশা দেখিয়েছে। শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক এই ব্যবস্থা মূলত গ্রেড-ভিত্তিক, যা অবিচ্ছিন্ন ও অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের মাধ্যমে সার্বিক মূল্যায়নের দিকে অগ্রসর হবে এবং শিক্ষার্থীকে বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত সুবিধা দেবে। শিক্ষাক্রমের প্রসারিত পরিসরে বিবিধ বিষয় চয়নের সক্ষমতা শিক্ষার্থীকে দেশের অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আন্তঃব্যবস্থায় অর্জিত ক্রেডিট স্থানান্তরে সাহায্য করবে। শিক্ষার্থীর অভিযোজন ও পরিগ্রহণ ক্ষমতা অনুযায়ী পাঠক্রমের বিন্যাসই এই জাতীয় শিক্ষানীতির লক্ষ্য। উচ্চশিক্ষার পরিসরে এই পদ্ধতি এক বৈকল্পিক পরিবর্তনের সূচনা করেছে। আগামী ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে স্নাতক স্তরে এই নির্বাচনভিত্তিক পাঠক্রম কার্যকরী করা হবে, এই মর্মে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বর্তমান পাঠক্রমগুলি উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রের নির্ণায়ক কৃত্যকের যথাবিহিত প্রস্তাবনা ও নির্দেশাবলী অনুসারে রচিত ও বিন্যস্ত হয়েছে। বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে সেইসব দিকগুলির প্রতি যা ইউ.জি.সি-র জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০২০ কর্তৃক চিহ্নিত ও নির্দেশিত।

মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে স্ব-শিক্ষা পাঠ-উপকরণ শিক্ষার্থী-সহায়ক পরিষেবার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সি.বি.সি.এস পাঠক্রমের এই পাঠ-উপকরণ মূলত বাংলা ও ইংরেজিতে লিখিত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সুবিধের কথা মাথায় রেখে আমরা ইংরেজি পাঠ-উপকরণের বাংলা অনুবাদের কাজেও এগিয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ শিক্ষকরাই মূলত পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন, যদিও পূর্বের মতোই অন্যান্য বিদ্যায়তনিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের সাহায্য আমরা অকুণ্ঠচিত্তে গ্রহণ করেছি। তাঁদের এই সাহায্য পাঠ-উপকরণের মানোন্নয়নে সহায়ক হবে বলেই বিশ্বাস। নির্ভরযোগ্য ও মূল্যবান বিদ্যায়তনিক সাহায্যের জন্য আমি তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এই পাঠ-উপকরণ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণ পদ্ধতি প্রকরণে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনের পঠন প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত সকল শিক্ষকের সদর্থক ও গঠনমূলক মতামত আমাদের আরও সমৃদ্ধ করবে। মুক্ত শিক্ষাক্রমে উৎকর্ষের প্রশ্নে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষক, আধিকারিক ও কর্মীদের আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এবং ছাত্রদের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

অধ্যাপক (ড.) ইন্দ্রজিৎ লাহিড়ি
উপাচার্য

Netaji Subhas Open University
Four Year Undergraduate Degree Programme
Under National Higher Education Qualification Framework (NHEQF) &
Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes
Bachelor of Arts in Education (Honours) (Education) (NED)
Course Type : Skill Enhancement Course (SEC)
Course Title : Application of ICT in Education
Course Code : NSE-ED-01

প্রথম মুদ্রণ : মার্চ, 2025

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।

Printed in accordance with the regulations of the Distance Education Bureau of the University Grants Commission.

Netaji Subhas Open University

Four Year Undergraduate Degree Programme
Under National Higher Education Qualification Framework (NHEQF) &
Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes
Bachelor of Arts in Education (Honours) (Education) (NED)
Course Type : Skill Enhancement Course (SEC)
Course Title : Application of ICT in Education
Course Code : NSE-ED-01

: বিষয় সমিতি :

: সদস্য :

ড. অতিন্দ্রনাথ দে
Director, SoE, NSOU, Chairperson (BoS)

ড. শিবপ্রসাদ দে
Professor SoE, NSOU

ড. কে. এন. চট্টোপাধ্যায়
Professor, Dept. of Education, University of Burdwan

ড. অভিজিৎ কুমার পাল
Professor, Dept. of Education, West Bengal State University

ড. দিব্যেন্দু ভট্টাচার্য
Professor, Dept. of Education, University of Kalyani

ড. ডি. পি. নাগ চৌধুরি
Professor, SoE, NSOU

ড. পাপিয়া উপাধ্যায়
Assistant Professor, SoE, NSOU

ড. পরিমল সরকার
Assistant Professor SoE, NSOU

ড. নিমাই চাঁদ মাইতি
Professor, SoE, NSOU

: রচনা :

ড. প্রণয় পাণ্ডে
Assistant Professor
Department of Education
Bhatter College

: সম্পাদনা :

ড. পাপিয়া উপাধ্যায়
Associate Professor SoE, NSOU

: বিন্যাস সম্পাদনা :

ড. পরিমল সরকার
Assistant Professor SoE, NSOU

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনো অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনোভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

অনন্যা মিত্র
নিবন্ধক (অতিরিক্ত ভারপ্রাপ্ত)

UG : শিক্ষা
স্নাতকোত্তর স্তর

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

Course Title : Application of ICT in Education

Course Code : NSE-ED-01

স্নাতকোত্তর স্তর

একক - 1 ❑ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সার্বিক ধারণা (Overview of ICT) 7 – 70

একক - 2 ❑ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি, পর্যায় এবং সামর্থ্য (Approaches, Stages and Competencies related to ICT) 71 – 90

একক - 3 ❑ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির নতুন ধারা (New Trends in ICT) 91 – 138

একক - 4 ❑ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সমন্বিত শিক্ষা (ICT Integrated Education) 139 – 154

একক - 5 ❑ তথ্য নির্ভর দক্ষতা (Information Age Skills) 155 – 168

একক - 1 ❑ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সার্বিক ধারণা (Overview of ICT)

গঠন (Structure)

1.1 উদ্দেশ্য (Objectives)

1.2 ভূমিকা (Introduction)

1.3 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি : অর্থ, প্রকৃতি এবং পরিধি (ITC :Meaning Nature and scope)

- **1.3.1** তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অর্থ ও ধারণা (Meaning and Concept of Information and Communication Technology)
- **1.3.2** তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রকৃতি (Nature of Information & Communication Technology)
- **1.3.3** তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির পরিধি (Scope of Information & Communication Technology)
- **1.3.4** তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিগত সিস্টেমের উপাদানসমূহ (Components of Information & Communication Technology System)
- **1.3.5** তথ্য ও ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রকারভেদ (Types of Information Communication Technology)
- **1.3.6** তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের সুবিধাসমূহ (Advantages of using Information and Communication Technology)
- **1.3.7** তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের অসুবিধাসমূহ (Disadvantages of using Information and Communication Technology)
- **1.3.8** সমাজে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রভাব (Impact of Information and Communication Technology in Society)
- **1.3.9** তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে নৈতিকতা (Morality in using Information & Communication Technology)

1.3.10 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন (Economic development through Information and Communication Technology)

1.3.11 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহারিক ক্ষেত্র (Practical Field of Information & Communication Technology)

1.4 ওয়েব (Web)

1.4.1 ওয়েব 1.0 (Web 1.0)

1.4.2 ওয়েব 2.0 (Web 2.0)

1.5 ফ্রি এবং ওপেন সোর্স সফটওয়্যার (Open Educational Resources)

1.5.1 মুক্ত বা ফ্রি সফটওয়্যার (Free Software)

1.5.2 উন্মুক্ত উৎস বা ওপেন সোর্স সফটওয়্যার (Open Source Software)

1.5.3 মুক্ত এবং উন্মুক্ত উৎস সফটওয়্যার (Free and Open Source Software)

1.6 মুক্ত শিক্ষা সম্পদ (Open Educational Resources)

1.6.1 প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়ক ওপেন এডুকেশনাল রিসোর্স (Open Educational Resources for Natural Sciences)

1.6.2 সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ক ওপেন এডুকেশনাল রিসোর্স (Open Educational Resources)

1.6.3 মানবিক বিদ্যা বিষয়ক ওপেন এডুকেশনাল রিসোর্স (Open Educational Resources for Humanities)

1.6.4 গণিত বিষয়ক ওপেন এডুকেশনাল রিসোর্স (Open Educational Resources for Mathematics)

1.7 সারসংক্ষেপ (Summary)

1.8 প্রশ্নাবলি (Questions)

1.9 তথ্য (References)

1.1 উদ্দেশ্য (Objectives)

এই অধ্যায়টি সমাপ্ত হওয়ার পরে, শিক্ষার্থীরা

- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অর্থ ও ধারণা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবে।
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রকৃতি ও পরিধি সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়গুলিকে সঠিকভাবে অনুধাবন করবে।
- শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রভাব সম্পর্কে জানবে।
- ওয়েব 1.0 এবং ওয়েব 2.0-এর ধারণা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করবে এবং এদের মধ্যেকার সাধারণ পার্থক্যগুলিকে চিহ্নিত করতে পারবে।
- মুক্ত এবং ওপেন সোর্স সফটওয়্যার সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবে।
- মুক্ত শিক্ষা সম্পদ সম্পর্কিত ধারণা গঠন করবে এবং বিভিন্ন প্রকার মুক্ত শিক্ষা সম্পদগুলিকে চিহ্নিত করতে পারবে।

1.2 ভূমিকা (Introduction)

একবিংশ শতাব্দীর এই বিশ্বায়নের যুগে তথ্য ও প্রযুক্তির ব্যবহার সর্বত্র বিদ্যমান। সারা দেশে প্রযুক্তির ব্যবহার ব্যাপক ভাবে বিস্তৃতি লাভ করছে। একথা অনস্বীকার্য যে প্রযুক্তি ছাড়া গোটা পৃথিবীই আজ অচল। গবেষণা থেকে শুরু করে, ব্যবসা, শিক্ষা, কৃষি, চিকিৎসাসহ ঘরে-বাইরে, মহাকাশে, মহাসমুদ্রে সকল ক্ষেত্রেই আজ প্রযুক্তির ছোঁয়া। প্রযুক্তির ব্যবহার ছাড়া আজকের পৃথিবীতে কোন কিছুই কল্পনা করা যায় না। ব্যবসায়, শিক্ষা, কৃষি, উন্নয়নমূলক, সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকান্ডসহ সকল কর্মক্ষেত্রে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহারের লক্ষ্যে সরকার বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এছাড়াও দেশের জনগোষ্ঠীকে তথ্য ও প্রযুক্তিতে দক্ষ করে গড়ে তুলতে বিভিন্ন পদক্ষে গ্রহণ করেছে সরকার। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিশ্বের জ্ঞান ও তথ্য ভাণ্ডারে প্রবেশের অসীম সম্ভাবনার দরজা খুলে দিয়েছে। দৈনন্দিন জীবনে, যোগাযোগে, অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে, মেধাচর্চা ও সৃজনশীলতার বিকাশ, বিনোদন ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে এটি কর্মসম্পাদনের এক শক্তিশালী হাতিয়ার হিসাবে স্বীকৃতি অর্জন করেছে।

1.3 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি : অর্থ, প্রকৃতি এবং পরিধি (ICT- Meaning–Nature and (cope)

1.3.1 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অর্থ ও ধারণা (Meaning and Concept of Information and Communication Technology)

আধুনিক সভ্যতার উন্নয়ন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সঠিক প্রয়োগের ওপর নির্ভরশীল। বর্তমানে ইলেকট্রনিকস এবং কম্পিউটার প্রযুক্তির উৎকর্ষের কারণে টেলিযোগাযোগ, কম্পিউটিং, কনজিউমার ইলেকট্রনিকস ও বিনোদন শিল্পসহ প্রযুক্তির বিভিন্ন শাখাকে পৃথকভাবে কল্পনা করা যায় না। এসব প্রযুক্তি মিলেমিশে সৃষ্টি হয়েছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির কল্যাণে মানুষ এখন তথ্যসমাজের দিকে ধাবিত হচ্ছে। এই তথ্য সমাজে অবস্থান করার জন্য তিনটি প্রধান কাজ হল—(1) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বা আইসিটির অবকাঠামো ও তাতে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করে বর্তমান সমাজকে তথ্য সমাজের দিকে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত করা, (2) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বা আইসিটি দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা, যাতে তথ্য সমাজের জন্য প্রয়োজনীয় মানবসম্পদের উন্নয়ন হয় ও (3) সব ক্ষেত্রেই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বা আইসিটির ব্যবহার নিশ্চিত করা। সভ্যতার ক্রমবিকাশের ফলে বর্তমানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মানুষের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে কাজ করছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ধারণাটি দুটি ভিন্ন ধারণার সমন্বয়ে তৈরি হয়েছে। একটি হল তথ্য প্রযুক্তি (Information Technology) ও অন্যটি হল যোগাযোগ প্রযুক্তি (Communication Technology)।

তথ্য প্রযুক্তি (Information Technology)

তথ্য প্রযুক্তি শব্দটি 'তথ্য' ও 'প্রযুক্তি' এই দুটি শব্দের সমাহার। 'তথ্য' শব্দটির ইংরেজি পরিভাষা হল 'Information'। ইংরেজি 'ইনফরমেশন" শব্দটি ল্যাটিন শব্দ 'informatio' থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। এই শব্দটির ক্রিয়ামূল 'informare', যার অর্থ হল 'কাউকে কোনো কিছু অবগত করা", "পথ দেখানো", 'শেখানো', 'আদান-প্রদান' ইত্যাদি। অর্থাৎ সংগৃহীত ডেটা বা উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণের পর প্রয়োজন মত সাজানো বা অর্থপূর্ণ অবস্থাকে তথ্য বা ইনফরমেশন বলা হয়। অন্য ভাবে বললে বলা যায় যে, বিভিন্ন ডেটাকে প্রক্রিয়াজাতকরণ, পরিচালন এবং সংঘবদ্ধকরণের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফলকে তথ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয় যা কোন মানুষের মস্তিষ্কে প্রেরণ করা হলে তার জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। একটি ধারণা হিসেবে নিলে তথ্য শব্দটির প্রচুর অর্থ আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে এবং প্রযুক্তি খাতে দৃষ্ট হয়।

আর 'প্রযুক্তি' শব্দটির ব্যবহার বহুমাত্রায় লক্ষ করা যায়। আধুনিক জীবনযাত্রায় ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতির

সমন্বয়ে জীবনযাত্রা পূর্বের তুলনায় আরও সহজ হয়ে উঠে। অর্থাৎ প্রযুক্তি হল কিছু প্রায়োগিক কৌশল যা মানুষ তার উন্নয়নকার্যে ব্যবহার করে থাকে। অন্য ভাবে বললে বলা হয় যে, যেকোন যন্ত্র এবং প্রাকৃতিক উপাদান সম্বন্ধে জ্ঞান এবং তা দক্ষভাবে ব্যবহারের ক্ষমতারকেও প্রযুক্তি বলা হয়।

বিভিন্ন কাজে মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে মানুষের কাছে উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত তথ্য পাওয়ার গুরুত্ব অনেকাংশেই বেড়ে গেছে। কারণ মানুষের নিজের পক্ষে সব ধরনের তথ্যকে মনে রাখা বা হাতের কাছে পাওয়া সম্ভব হয় না। এর জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত প্রযুক্তি যার মাধ্যমে মানুষ চাহিদামাত্রই সহজে ও দ্রুততম সময়ে তথ্য পেতে পারে।

তথ্য সংগ্রহ, এর সত্যতা ও বৈধতা যাচাই, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, আধুনিকীকরণ, পরিবহন, বিতরণ ও ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তিকে তথ্য প্রযুক্তি বা ইনফরমেশন টেকনোলজি বলা হয়। এক কথায়, তথ্য ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তিকে তথ্য প্রযুক্তি বলা হয়।

অন্যভাবে বললে বলা যায় যে, কম্পিউটার এবং টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ, একত্রীকরণ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং বিনিময় বা পরিবেশনের ব্যবস্থাকে তথ্য প্রযুক্তি বলে।

বর্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য, অথবা দক্ষ ব্যবস্থাপনার জন্য তথ্য আহরন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরন ও তথ্য বিতরনের গুরুত্ব অনেক। আর এই তথ্য আহরন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরন, তথ্য বিতরনের ও এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সামগ্রিক কার্যাবলী পরিচালনার বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়াকেই এক কথায় তথ্য প্রযুক্তি বলা হয়।

অক্সফোর্ড ইংলিশ দিকশনারীর মতে, Information Technology is the branch of technology concerned with the dissemination– processing and storage of information– esp. by means of computers and the convergence of telecommunication and computing technology is generally known as Information Technology.

Information Technology Association of America (ITAA), এর সংজ্ঞা অনুসারে তথ্য প্রযুক্তি হল “the study, design, development, implementation, support or management of computer-based information systems, particularly software applications and computer hardware”. (তথ্য প্রযুক্তি হল কম্পিউটার নির্ভর একটি তথ্য প্রক্রিয়া যা বিশেষ করে সফওয়্যার অ্যাপ্লিকেশন এবং কম্পিউটার হার্ডওয়্যারের অধ্যয়ন, ডিজাইন, উন্নয়ন ও বাস্তবায়নে দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে)।

UNESCO-এর মতে Information Technology is defined as Scientific technology and engineering disciplines and the management techniques used in information

handling and processing their application– computers and their interaction with men and machines and associated social– economic and cultural matters.

যোগাযোগ প্রযুক্তি (Communication Technology) :

তথ্য প্রযুক্তি শব্দটির মতই, যোগাযোগ প্রযুক্তি শব্দটিও 'যোগাযোগ' ও 'প্রযুক্তি' এই দুটি শব্দের সমাহার। যোগাযোগ হল তথ্য আদান প্রদানের উপায়। একটি নির্দিষ্ট মাধ্যমের দ্বারা (যেমন - শব্দ, আলো বা রেডিও-ওয়েভ) মানুষ থেকে মানুষ বা যন্ত্র থেকে যন্ত্রে তথ্য আদান প্রদান হতে পারে।।

ইংরেজি 'কমিউনিকেশন' শব্দটি ল্যাটিন শব্দ 'communis' থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। যোগাযোগের অর্থ হল প্রেরক ও গ্রহীতার মধ্যে অভিন্ন সংকেতের বিনিময় (Exchange of common code between sender and receiver.)

George Lundberg-এর Communication as– a sub category of interaction, namely the form of interaction using symbols, gesture, picture, verbal or any other which would serve as stimuli to behaviour.

Newman ও Summer-দের মতে– Communication is an exchange of facts– ideas– opinions or emotions by two or more persons (যোগাযোগ হল দুই বা ততোধিক ব্যক্তির তথ্য, ধারণা, মতামত বা আবেগের বিনিময়)।

Theo Haiman-এর Communication is defined as the process of passing information and understanding from one person to another. It is the process of imparting ideas and making one self-understood by other.

ডেটা কমিউনিকেশন ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তিকে যোগাযোগ প্রযুক্তি বা কমিউনিকেশন টেকনোলজি বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ যোগাযোগ ব্যবস্থার ডিজাইন, নির্মাণ ও পরিচালনা করা সম্পর্কিত কার্যকলাপকে যোগাযোগ প্রযুক্তি বা কমিউনিকেশন টেকনোলজি বলা হয়।

অন্যভাবে বললে বলা যায় যে, একস্থান থেকে অন্যস্থানে ডেটা বা উপাত্ত আদান প্রদানের জন্য-ব্যবহৃত প্রযুক্তিকে যোগাযোগ প্রযুক্তি বা কমিউনিকেশন টেকনোলজি বলা হয়।

UNESCO-এর মতে, Communication Technology' implies the knowledge, skills and understanding needed to exchange information verbally or no verbally. It is processing of information in terms of accessing information, decoding information and sending it via a medium and changer to the receivers. Medium or channel can be written or oral or gesture form of information through speech, action or any electronic machine.

Charles Cooley -এর মতে Communication Technology is defined as the mechanism through which all human relations exists and developed-all the symbols of the mind together with the means of conveying through space and preserving them in time.

তথ্য প্রযুক্তি ও যোগাযোগ প্রযুক্তির একীভূতকরণ (Integration between Information Technology and Communication Technology)

মানুষের জীবনে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রাপ্তি সহজতর করার লক্ষ্যে তথ্য প্রযুক্তির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। আর এই তথ্য প্রযুক্তির বিবর্তনের পাশাপাশি যোগাযোগ প্রযুক্তিরও ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। কারণ, যোগাযোগ প্রযুক্তির সাহায্য ছাড়া শুধুমাত্র তথ্য প্রযুক্তি মানুষের চাহিদার সঠিক যোগান দিতে অক্ষম। তাই বর্তমানে, তথ্য প্রযুক্তি ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উভয়ের উন্নয়নের ফলে মানুষের এই চাহিদা পূরণ হচ্ছে। আর সার্বিকভাবে প্রযুক্তির ব্যাপক উন্নয়নের ফলেই আজ তথ্য প্রযুক্তি ও যোগাযোগ প্রযুক্তির একীভূতকরণ করা সম্ভব হয়েছে। আর এই একীভূতকরণের দ্বারাই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিগত ধারণার সৃষ্টি হয়েছে।

সাধারণভাবে বললে বলা যায় যে, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বা আইসিটি হল তথ্য প্রযুক্তি বা ইনফর্মেশন টেকনোলজির সাথে অন্যান্য প্রযুক্তি প্রধানত যোগাযোগ প্রযুক্তি বা কমিউনিকেশন টেকনোলজির সমন্বয় সাধন (Information and Communication Technology (ICT) is defined as the combination of Information technology with other, related technologies, specifically Communication technology)।

যে কোন প্রকারের তথ্যের উৎপত্তি, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, সঞ্চালন এবং বিচ্ছুরণে ব্যবহৃত সকল ইলেক্ট্রনিক্স প্রযুক্তিকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বা ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি বলা হয়।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি একপ্রকার একীভূত যোগাযোগ ব্যবস্থা। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এমন এক ধরনের ব্যবস্থা যার মাধ্যমে একজন ব্যবহারকারী খুব সহজে তথ্য গ্রহন, সংরক্ষণ, সঞ্চালন ও বিশ্লেষণ করতে পারেন। সাল ১৯৮০ (থেকেই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি Information and Communication Technology) শব্দটির শিক্ষাগত ক্ষেত্রে ব্যবহার শুরু হয়। কিন্তু এই ধারণাটি সাল থেকে জনপ্রিয়তা পেতে শুরু করে। বর্তমানে তথ্য ও যোগাযোগ ১৯৯৭ প্রযুক্তির দ্বারা একক লিংক সিস্টেমের মাধ্যমে টেলিফোন, অডিওভিজুয়াল ও কম্পিউটার নেটওয়ার্কের সমন্বয় প্রযুক্তিকে প্রকাশ করা হয়।

UNESCO কর্তৃক প্রকাশিত 'ICT in Education Programme' শীর্ষক বইয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে নিম্নলিখিত ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে- The term 'Information and Communication Technology (ICT)' refers to forms of technology that are used to transmit, process,

store, create, display, share or exchange information by electronic means. এই প্রসঙ্গে UNESCO একটি তালিকাও প্রকাশ করেছিল। তথ্যকে উৎপাদন (Creation), প্রক্রিয়াকরণ (Processing)– সংরক্ষণ (torage), আদান-প্রদান (Exchange), প্রকাশ (Display) ও সঞ্চালনের (Transmission) জন্য যে সমস্ত প্রযুক্তিকে ব্যবহার করা হয়ে থাকে সেইগুলিকে এই তালিকাটিতে প্রকাশ করা হয়েছিল।

Information	**Technologies**
Creation	Personal Computers, Digital camera, Scanner, Smartphone
Processing	Calculator, PC, Smartphone
Storage	CD, DVD, Pen drive, Microchip, Cloud
Display	PC, TV, Projector, Smartphone
Transmission	Internet, Teleconference, Video conferencing, Mobile technology, Radio
Exchange	e-mail, Cell phone

1.3.2 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রকৃতি (Nature of Information & Communication Technology)

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বলতে সাধারণভাবে তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, বিশ্লেষণ, প্রক্রিয়াকরণ, উৎপাদন ও বিস্তরণ তথা যোগাযোগের কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরণের আধুনিক প্রযুক্তিগত উপকরণকে বোঝায়। তথ্য আদান-প্রদান ও যোগাযোগের জন্য প্রতিনিয়ত নতুন নতুন প্রযুক্তি আবিস্কৃত হচ্ছে, তবে বর্তমানে বহুল ব্যবহৃত উপকরণগুলোর মধ্যে কম্পিউটার, ইন্টারনেট, মাল্টিমিডিয়া সিস্টেম, মোবাইল ফোন, রেডিও, টেলিভিশন উল্লেখযোগ্য। তথ্যপ্রযুক্তিকে শুধুমাত্র কম্পিউটারের মধ্যে সীমিত না রেখে মোবাইল ফোন, রেডিও, টেলিভিশন, নেটওয়ার্কিং কিংবা সকল তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণের ব্যপক অর্থে ব্যবহার করার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ করতে হবে। সারা বিশ্বে অন্য যেকোনো বিষয়ের চেয়ে সবচেয়ে বেশী গতিতে যে ধারণাটি মানুষের কাছে একযোগে অগ্রাধিকার পেয়েছে এবং মানুষও উৎসাহের সাথে মূল্যায়ন করেছে তা হল তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি। যার ফলে কোন প্রকারের বিরতি ছাড়াই সৃজনশীলতার সাথে এগিয়ে গেছে এই ধারনাটি। আধুনিক জীবনযাপনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির গুরুত্ব অপরিসীম। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মানুষের জীবনকে করেছে উন্নত, জীবনযাত্রাকে করছে সহজ। তথ্যপ্রযুক্তি মূলত একটি সমন্বিত মাধ্যম, যা অডিও, ভিডিও, টেলিযোগাযোগ, কম্পিউটিং, সম্প্রচারসহ আরো বহুবিধ প্রযুক্তির সম্মিলনে দীর্ঘদিন ধরে চর্চার ফলে প্রতিনিয়ত সমৃদ্ধি লাভ করছে।

তথ্যপ্রযুক্তির বিপুল বিকাশের ফলে সমাজের বিভিন্ন স্তরে নানা ধরনের পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে। এর ফলে অসংখ্য নতুন নতুন কাজের ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে শিক্ষা, চিকিৎসা, গবেষণা, যোগাযোগ, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিনোদনসহ নানা ধরনের সেবা পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে মোবাইল ফোনের ব্যাপক প্রসারের ফলে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের সঙ্গে সারা বিশ্বের যোগাযোগ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ইন্টারনেট, ই-মেইলের মাধ্যমে সারা পৃথিবীর মানুষ আজ একে অন্যের সঙ্গে তাৎক্ষণিক যোগাযোগ করতে পারছে। ইন্টারনেটের বিকাশের ফলে বর্তমানে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর জনগণ ঘরে বসে অন্য দেশের কাজ করে আত্মকর্মসংস্থানে সক্ষম হচ্ছে। বর্তমানে শিক্ষাব্যবস্থায় তথ্যপ্রযুক্তির কল্যাণে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান থেকে শুরু করে ফর্ম ফিল-আপ, ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি নানা শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্যেও প্রযুক্তির ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে চাকরিদাতা ও প্রার্থী অনলাইনে খুব সহজে যোগাযোগ করতে পারছে। অনলাইনের মাধ্যমে পণ্যের প্রচার এবং বিক্রিও এখন দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকারি কর্মকাণ্ডে তথ্যপ্রযুক্তি সবচেয়ে উদ্ভাবনী ও কুশলী প্রয়োগ হল জনগণের কাছে নাগরিক সেবা পৌঁছে দেওয়া। মোবাইল ফোন, রেডিও, টেলিভিশন ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে নাগরিকসেবাগুলো সরাসরি নাগরিকদের দোরগোড়ায় এবং তার হাতের মুঠোয় পৌঁছে দেওয়া যায়। চিকিৎসা ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে রোগীর রোগ নির্ণয় করা সহজ হয়েছে। টেলিমেডিসিনের মাধ্যমে চিকিৎসা এখন আরো সময় সাশ্রয়ী ও সহজতর হয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তির কারণে গবেষণা জগতেও সম্পূর্ণ নতুন একটি মাত্রা যোগ হয়েছে। মানুষ এখন সাহিত্য, শিল্প, গণিত, প্রযুক্তি আর বিজ্ঞান, যা নিয়েই গবেষণা করুক না কেন, তারা কম্পিউটার এবং তথ্যপ্রযুক্তির সাহায্য ছাড়া সেই গবেষণার কথা চিন্তা করতে পারে না।

ক. ই-লার্নিং (E-learning) :

ইলেকট্রনিকস প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থাকে ইলেকট্রনিক লার্নিং বা সংক্ষেপে ই-লার্নিং বলা হয়। রেডিও থেকে মোবাইল অ্যাপস পর্যন্ত সবই ই-লার্নিংয়ের অন্তর্ভুক্ত। ই-লার্নিং বর্তমানে বিশ্বব্যাপী অনেক জনপ্রিয়। ই-লার্নিং এর মাধ্যমে শিক্ষার্থী তার প্রয়োজন মত একই ডিজিটাল কনটেন্ট বা ভিডিও ক্লিপ, ইচ্ছে মতো বারবার ব্যবহার করার সুযোগ পায়। ভিডিও কনফারেন্সিং আবিষ্কারের পরে এখন শিক্ষক শিক্ষার্থীকে আলাদা আলাদা জায়গায় থেকেও সরাসরি কথা বলতে পারছে। ই-লার্নিং-এর ওয়েবসাইটগুলিতে সাধারণত ভিডিয়ো লেকচার ও কোর্সওয়্যার আপলোড করা থাকে। এর সঙ্গে রেফারেন্স বইয়ের নামের তালিকা, আলোচনার ফোরাম, প্রাসঙ্গিক অনলাইন উইকি ও নানা ধরনের প্রাসঙ্গিক কেস স্টাডিজ থাকে। পাঠ্য বিষয়বস্তু টু ও থ্রি-ডি অ্যানিমেশন, ল্যাবরেটরি ডেমনস্ট্রেশন, অডিও এবং ভিডিও ক্লিপিং-এর মাধ্যমে বোঝানো হয়। ই-লার্নিং-এর প্রবর্তক হলেন বার্নার্ড লাস্কিন (Bernard Luskin)। তাঁর মতে, E-learning refers to the use of technology in learning and education.

- Weggen ও Urdan (2000)-দের মতে, e-learning is defined as the delivery of content via all electronic media, including the Internet, intranets, extranets, satellite broadcast, audio/video, interactive TV and CD-ROM.
- Darin E. Hartley (2001)-এর মতে, E-learning is defined as a teaching and learning process by using internet media, intranet or other computer network in order to give the material to the students.
- Jenkins ও Hanson (2003)-দের মতে, E-learning is defined as learning facilitated and supported through the use of Information and Communication Technology.
- Tastle (2005)-এর মতে, e-learning is the delivery of training and learning through electronic means, such as computers, Internet or Intranet.
- Matt Comerchero-এর মতে, E-learning is a means of education that incorporates self-motivation, communication, efficiency, and technology.

শিক্ষার্থীদের কাছে বিকল্প শিক্ষামাধ্যম হিসেবে দ্রুত জনপ্রিয়তা পাচ্ছে প্রযুক্তিনির্ভর ই-লার্নিং বা ই-শিক্ষা। সরাসরি ক্লাসে উপস্থিত না হয়েও এ ব্যবস্থায় অনলাইনে নিজের সুবিধামতো সময়ে শিক্ষালাভ করা যায়। সারাদিন কাজ সেরে রাতে ঘরে বসেই খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভার্চুয়াল ক্লাসে অংশ নিচ্ছেন অনেকেই। ই-লার্নিং পদ্ধতি দূরত্ব কমিয়ে পড়াশোনার সুযোগ করে দেওয়ার পাশাপাশি কমিয়ে দিয়েছে শিক্ষার খরচও। এছাড়া যাদের কোন কারণে পড়াশোনা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, এমন অনেকেই এখন নতুন করে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারছে। ইলেকট্রনিক ডিভাইসের মাধ্যমে পড়াশোনার একটি আকর্ষণীয় দিক হল এখানে সর্বশেষ তথ্য পাওয়া সম্ভব। এর ফলে যেকোনো পেশার মানুষের পক্ষে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হয়ে উঠছে। একই সাথে কমপিউটার, মোবাইল, অনলাইন, সফটওয়্যার, টিভি, রেডিও, ডিভিডি, ভিসিডি, প্রজেক্টর ব্যবহার করে শিক্ষা যেকোনো বয়সী মানুষের জন্যই আনন্দদায়ক করে তোলা সম্ভব। গণিত, জ্যামিতি, পদার্থবিদ্যা ও ইংরেজির অনেক জটিল বিষয়গুলিকেও সহজ করে উপস্থাপন করা সম্ভব। এর ফলে বিজ্ঞানকে আরও জনপ্রিয় করে তোলা সহজ হচ্ছে।

ই-লার্নিং-এর বৈশিষ্ট্যসমূহ (Characteristics of e learning) :

- ই-লার্নিং ডিজিটাল প্রযুক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।
- ই-লার্নিং খুব সহজ ও সরলভাবে ব্যাবহারকারীদের ইন্টারফেস প্রদান করে থাকে।
- প্রাসঙ্গিক এবং অর্থপূর্ণ তথ্য পরিবেশন করে থাকে।

- ই-লার্নিং-এর মাধ্যমে সহজ এবং নির্দ্বিধায় বাড়ীতে বসে যে কোন কোর্সকে অ্যাক্সেস করা যায়।
- ই-লার্নিং-এর দ্বারা পরিচালিত কোর্সগুলিকে ব্যবহার করাও সহজ।
- ই-লার্নিং উপকরণগুলি সময়ের সাথে সাথে নিয়মিতভাবে নিজেকে আপডেট রাখে।
- ই-লার্নিং-এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের নিজস্ব জ্ঞানকে মূল্যায়ন করতে পারে।
- ই-লার্নিং শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত কর্মক্ষমতাকে প্রতিফলিত করতে সাহায্য করে থাকে।

ই-লার্নিং-এর সুবিধা (Advantages of e-learning)

- ই-লার্নিং শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক শিক্ষণ নীতির উপর নির্ভরশীল।
- ই-লার্নিং-এর প্রকৃতির নমনীয় হয়।
- শিক্ষার্থীদের স্বতন্ত্র নির্দেশ প্রদান করে থাকে।
- ই-লার্নিং প্লাটফর্ম একটি মান-সম্মত শিক্ষার উপরকরণ নিশ্চিত করে থাকে।
- শিক্ষার্থীদের স্ব-শিখন এবং স্ব উন্নতিতে (self learning and self improvement) সাহায্য করে থাকে।
- ইন্টারনেটের মাধ্যমে পৃথিবীর যে-কোনও প্রান্ত থেকে যে কেউ বিনামূল্যে বা ফি দিয়ে পড়াশোনা করতে পারে।
- দক্ষতা এবং সম্পদের প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়।
- ওপেন কোর্সওয়্যারের ভিডিও, অডিও, ইমেজ, অ্যানিমেশন ও ইন্টারঅ্যাক্টিভ পদ্ধতির সাহায্যে শিক্ষার্থী নিজেই নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।
- শিক্ষার্থীরা তাদের নিজস্ব জ্ঞান এবং আগ্রহ স্তরের ওপর ভিত্তি করে শিখন শেখার উপকরণ নির্বাচন করতে পারে।
- ই-লার্নিং পদ্ধতিতে ভার্চুয়াল গবেষণাগারে কম্পিউটার অ্যানিমেশনের মাধ্যমে সহজেই বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা যায়।

ই-লার্নিং-এর অসুবিধা (Disadvantages of e-learning) :

- প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও দক্ষতার প্রয়োজন হয়।
- সকলের থেকে বিচ্ছিন্নতার মনোভাব অনুভূত হয়।
- শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামের অভাব লক্ষ্য করা যায়।

- সহ-পাঠক্রমিক কার্যক্রমের অভাব পরিলক্ষিত হয়।
- উপকরণের অসামঞ্জস্যতা লক্ষ্য করা যায়।
- ই-লার্নিং প্রক্রিয়াটি ব্যয়বহুল।
- শিক্ষাবিজ্ঞানগত ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়।

খ. মোবাইল লার্নিং (Mobile-learning) :

এম-লার্নিং বা মোবাইল লার্নিং হল ব্যক্তিগত ইলেকট্রনিক ডিভাইস ব্যবহারের দ্বারা বিষয়বস্তুকে আত্তীকরণের মাধ্যমে শিখন। এটিকে দূরশিখনের একটি মাধ্যম হিসাবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। এই শিখনে শিক্ষার্থীরা মোবাইল ডিভাইসকে তাদের শিক্ষাগত প্রযুক্তির মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করে থাকে। হ্যান্ডহেল্ড কম্পিউটার (Handheld Computers), এমপি৩ প্লেয়ার (MP3 players), নোটবুক (Notebooks), মোবাইল ফোন (Mobile Phones) এবং ট্যাবলেট (Tablets) এম-লার্নিং প্রযুক্তির অন্তর্ভুক্ত। এম-লার্নিং শিক্ষার্থীর গতিশীলতার উপর গুরুত্ব দেয়। বর্তমান শিক্ষাজগতে, অপ্রথাগত শিক্ষা পদ্ধতিতে, শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহনের ক্ষেত্রে মোবাইলের ব্যবহার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছে। মোবাইল লার্নিং, মোবাইল ফোন, পিডিএ ও ট্যাবলেটের ওপর ভিত্তি করে শিখন প্রক্রিয়াটিকে পরিচালিত করে থাকে। ই-লার্নিং তথাকথিত শিখনের বাইরে এসে শিক্ষার্থীদের নিজেদের ইচ্ছামত শিখনে উৎসাহিত করে থাকে। আর মোবাইল লার্নিং, ই-লার্নিং প্রক্রিয়াকে আরো সহজে ব্যবহার করার সুযোগ প্রদান করে থাকে। নতুন মোবাইল প্রযুক্তির ক্ষেত্রে, হ্যান্ডহেল্ড ভিত্তিক ডিভাইসগুলি শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের শিখন সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য আদান-প্রদানে সাহায্য করে থাকে। মোবাইল লার্নিং হল এমন এক ধরনের শিখন পদ্ধতি যেখানে ব্যক্তিগত পকেট ডিভাইস যেমন—পিডিএ (PDA), স্মার্টফোন (Smart Phone) এবং মোবাইল ফোনের (Mobile Phone) মাধ্যমে শিক্ষামূলক বিষয়ের আদান-প্রদান হয়ে থাকে।

Lan and Sie (2010)-দের মতে, মোবাইল লার্নিং (এম-লার্নিং) হল এমন একটি শিখন মডেল যা শিক্ষার্থীদের যে কোন স্থান থেকে যে কোন সময়ে মোবাইল প্রযুক্তি এবং ইন্টারনেট ব্যবহার করার মাধ্যমে শিখন উপকরণকে ব্যবহার করার সুযোগ প্রদান করে থাকে।

Quinn (2000)-এর মতে, mobile learning is defined as simply learning that takes place with the help of mobile devices, or the intersection of mobile computing Sthe application of small, portable and wireless computing and communication devicesV and e-learning Slearning facilitated and supported through the use of information and communications technology).

Laurillard ও Pachler (2007)-দের মতে, এম-লার্নিং হল একটি প্রযুক্তি নির্ভর, অভিযোজনমূলক, অনুসন্ধানমূলক ও যোগাযোগসাধনকারী শিখন কার্যক্রম।

Traxler (2005)-এর মতে, mobile learning is defined as an educational provision where the sole or dominant technologies are handheld or palmtop devices.

UNESCO-এর মতে, Mobile learning involves the use of mobile technology– either alone or in combination with other information and communication technology (ICT), to enable learning anytime and anywhere. Learning can unfold in a variety of ways : people can use mobile devices to access educational resources, connect with others, or create content, both inside and outside classrooms. Mobile learning also encompasses efforts to support broad educational goals such as the effective administration of school systems and improved communication between schools and families.

Yi (2009)-এর মতে, m-learning is an array of ways that people learn or stay connected with their learning environments including their classmates, instructors, and instructional resources while going mobile.

মোবাইল লার্নিং-এর বৈশিষ্ট্যসমূহ (Characteristics of Mobile-learning) :

- **স্বতঃস্ফূর্ততা (Spontaneous) :** মোবাইল লার্নিং অন্যান্য লার্নিং প্রক্রিয়ার থেকে অনেক বেশি স্বতঃস্ফূর্ত।
- **মোবাইল টুলসের সুবহ আকার (Portable size of mobile tools) :** মোবাইল লার্নিং-এ ব্যবহৃত টুলসগুলি ছোট এবং বহন যোগ্য হয়। শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষা কার্যক্রম চলাকালীন সর্বত্র এই টুলসগুলিকে ব্যবহার করতে পারেন।
- **ওয়্যারলেস নেটওয়ার্কিং (Wireless networking) :** ওয়্যারলেস নেটওয়ার্কিং মোবাইল লার্নিং-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।
- **পারস্পরিক ক্রিয়াশীলতা (Interactivity) :** মোবাইল লার্নিং তিনটি দিকের সাথে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত থাকে। সেইগুলি হল—শিক্ষাগত জ্ঞানীয় পরিবেশ (Educational Cognitive Environment), শিক্ষার্থী (Learners) ও দক্ষতা (Skill)।
- **নমনীয় (Flexible) :** মোবাইল লার্নিং-এর প্রকৃতি খুব নমনীয় হয়।
- **তাৎক্ষণিক তথ্য (Instant Information) :** মোবাইল লার্নিং-এর মাধ্যমে খুব দ্রুত তথ্য আদান-প্রদান করা যায়
- **সহজেই অ্যাক্সেস করা যায় (Easily accessible) :** মোবাইল লার্নিং-এর মাধ্যমে গৃহীত তথ্যকে খুব সহজেই অধিগত করা যায়।

এম-লার্নিং-এর মৌলিক উপাদানসমূহ (Basic Elements of M-Learning) :

মোবাইল লার্নিং-এর মৌলিক উপাদানগুলি হল—শিক্ষার্থী (learners), শিক্ষক (teachers) পরিবেশ (environment), বিষয়বস্তু (content) এবং অ্যাসেসমেন্ট (assessment)। নিচের চিত্রে মোবাইল লার্নিং-এর মৌলিক উপাদানগুলিকে দেখানো হল।

➢ **শিক্ষার্থী (Learners) :** আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায়, শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ার কেন্দ্রে থাকে শিক্ষার্থী। মোবাইল লার্নিং-এর ক্ষেত্রেও শিক্ষার্থীর ইচ্ছা, অভিজ্ঞতা এবং চাহিদার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। Makoe (2010) মতে, mobile learning concept implies, the pedagogical approach places the student at the centre of the learning process.

➢ **শিক্ষক (Teachers) :** বই ও অন্যান্য মিডিয়া তথ্যকে সংরক্ষণ করে রাখে এবং শিক্ষক এইসব তথ্যগুলিকে গতানুগতিক শিক্ষণ পরিবেশে শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছে দেন। মোবাইল লার্নিং-এর ক্ষেত্রেও, শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের মুখোমুখি না হয়েও প্রযুক্তির সাহায্যে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকেন ও শিখনে সাহায্য করে থাকেন। Ghaln (2011)-এর মতে, before television the main roles of the teachers were the role of the domain expert that presents information to the students.

➢ **পরিবেশ (Environment) :** শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইতিবাচক শিখন অভিজ্ঞতা প্রদানের জন্য সঠিক শিখন পরিবেশ রচনা করা প্রয়োজন। মোবাইল লার্নিং-এর ক্ষেত্রে, গতানুগতিক শিক্ষার মত শিখন পরিবেশ রচনা করা না গেলেও একটি কৃত্রিম শিখন পরিবেশ রচনা করার মাধ্যমে শিখন কার্যটি পরিচালনা করা হয়। Uzunboylu and Ozdamli (2011)-দের মতে, m-learning with handheld devices eradicated geographical borders, enabling co-operative learning environments which have individual and group interaction in the education.

➢ **বিষয়বস্তু (Content) :** বিষয়বস্তু সম্পর্কিত সমস্ত রকম সিদ্ধান্ত সমস্ত ধরনের স্টেকহোল্ডার যেমন—শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবকদের সাথে পরামর্শ করে নেওয়া উচিত। মোবাইল লার্নিং-এর ক্ষেত্রেও, বিষয়বস্তু সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণে শিক্ষার্থীদের প্রাধান্য দেওয়া হয়ে থাকে। Siragusa (2007)-এর মতে, the detail and extent of the content provided to students may vary depending upon the studentsóó pedagogical needs.

➢ **অ্যাসেসমেন্ট (Assessment) :** মোবাইল প্রযুক্তি শিক্ষার্থীদের রেকর্ড এবং কর্মক্ষমতাকে মূল্যায়ন করতে সাহায্য করে থাকে। মোবাইল লার্নিং-এ, শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন সফটওয়্যার

প্যাকেজ, অনলাইন পরীক্ষা, চ্যাট রুম, আলোচনা বোর্ড, অনলাইন ক্যুইজ বা প্রকল্প মূল্যায়নের মাধ্যমে হয়ে থাকে। এছাড়াও, এখানে শিক্ষার্থীরাও তাদের নিজেদের মূল্যায়ন নিজেরা করে থাকে। এই ধরনের মূল্যায়ন শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা ও সৃজনশীলতার অ্যাসেস করে থাকে। Behera (2011)-এর মতে, the assessment should help the learner clear all his doubts based on the course and at the same time, learn a little bit more about the same.

মোবাইল লার্নিং-এর সুবিধা (Advantages of Mobile learning) :

- এই ধরনের লার্নিং প্রক্রিয়া খুব নমনীয় হয়।
- শিক্ষার্থীরা তাদের নিজস্ব জ্ঞান এবং আগ্রহ স্তরের ওপর ভিত্তি করে শিখন শেখার উপকরণ নির্বাচন করতে পারে।
- সময় ও শিক্ষার স্থান নিয়ে কোনো নিয়ন্ত্রণ বা বিধিনিষেধ থাকে না।
- শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক শিক্ষণ নীতির উপর নির্ভরশীল।
- স্ব-শিখনে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করে থাকে।
- ভিডিও, অডিও, ইমেজ, অ্যানিমেশন ও ইন্টারঅ্যাক্টিভ পদ্ধতির সাহায্যে শিক্ষার্থীর কোনো একটি বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করে থাকে।
- মোবাইল লার্নিং-এ খুব সহজেই বিষয়বস্তুকে অ্যাক্সেস করা যায়।
- সহযোগিতামূলক শিখনে সাহায্য করে থাকে।

মোবাইল লার্নিং-এর অসুবিধা (Disadvantages of Mobile learning) :

- সীমিত কার্যকারিতা সম্পন্ন মোবাইলের ক্ষেত্রে সর্বদা মোবাইল লার্নিং উপযুক্ত নাও হতে পারে।
- কম মেমরি স্টোরেজ যুক্ত মোবাইল ডিভাইসের ক্ষেত্রে মোবাইল লার্নিং-এর জন্য উপযুক্ত কন্টেন্টকে অনেকসময় ধারণ করে রাখা যায় না।
- বেশীরভাগ সময় প্রযুক্তিগত সমস্যা পরিলক্ষিত হয়।
- সীমিত ব্যান্ডউইথ থাকার কারণে অনলাইন কন্টেন্ট অ্যাক্সেস করতে অনেক সময় অসুবিধা হয়।
- প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও দক্ষতার প্রয়োজন হয়।
- মোবাইল লার্নিং প্রক্রিয়াটি ব্যয়বহুল।

গ. অনলাইন লার্নিং (On-line learning) :

ইন্টারনেটের মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণের একটি পদ্ধতি হল অনলাইন লার্নিং। অনলাইন লার্নিং হল দূরশিখনের একটি প্রকার যেখানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী ইন্টারনেটের দ্বারা যোগাযোগের মাধ্যমে শিখন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষা বিভাগের মতে, অনলাইন লার্নিং হল এমন এক ধরণের লার্নিং যা ইন্টারনেটের মাধ্যমে একটি কম্পিউটারের দ্বারা গ্রহণ করা হয় (Online learning is learning that is undertaken on a computer by means of the Internet)।

Benson ও Conrad (2002)-দের মতে, Online learning is described by most authors as access to learning experiences via the use of some technology.

অনলাইন লার্নিং সর্বপ্রথম ১৯৮৯ সালে ফিনিক্স বিশ্ববিদ্যালয়ের (University of Phoenix) ইন্টারনেটের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে। পরবর্তীকালে, ১৯৯৩ সালে ইউনিভার্সিটি অফ ইলিনয় এট আর্বানাশ্যাম্পেইন (University of Illinois at Urbana-Champaign)-এ প্রথম ইন্টারনেট ওয়েব ব্রাউজার তৈরীর সাথে সাথে অনলাইন লার্নিং আরো বিকশিত হতে শুরু করে। ১৯৯৮ সালে প্রথম সম্পূর্ণরূপে নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি (New York University), ওয়েস্টার্ন গভর্নর বিশ্ববিদ্যালয় (Western Governor's University) এবং ক্যালিফোর্নিয়া ভার্চুয়াল ইউনিভার্সিটি (California Virtual University)তে অনলাইন প্রোগ্রাম চালু হয়েছিল। 2000 সালে মাত্র 4% শিক্ষার্থী অনলাইন কোর্সে নিজেদের নাম নথিভুক্ত করে। কিন্তু, 2008 সালে সেই হার 20% বৃদ্ধি পায়। 2013 সালের পর থেকে অনলাইন লার্নিং-এ ভর্তির হার দ্রুতহারে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

অনলাইন লার্নিং-এর বৈশিষ্ট্যসমূহ (Characteristics of Online learning) :

- অনলাইন লার্নিং ডিজিটাল প্রযুক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।
- প্রাসঙ্গিক এবং অর্থপূর্ণ তথ্য পরিবেশন করে থাকে।
- কোর্স পছন্দের ক্ষেত্রে অনেক সুবিধা পাওয়া যায়।
- যে কোনো বয়সের ব্যক্তিরা এই ধরনের শিক্ষা লাভের সুযোগ পেয়ে থাকে।
- অনলাইন লার্নিং হল ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও চাহিদাভিত্তিক শিখন প্রক্রিয়া।
- শিক্ষার্থীর নিজের সময়মত ও পছন্দমত স্থানে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে।
- অনলাইন লার্নিং একটি স্ব-নির্দেশনামূলক শিখন পদ্ধতি।
- অনলাইন লার্নিং শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত কর্মক্ষমতাকে প্রতিফলিত করতে সাহায্য করে থাকে।

অনলাইন লার্নিং-এর সুবিধা (Advantages of Online learning) :

- সহযোগিতামূলক এবং অনুসন্ধানমূলক শিক্ষার পরিবেশ রচনাতে সাহায্য করে থাকে।
- তথ্যকে অ্যাক্সেস খুব সহজেই করা যায়।
- শিক্ষার্থীদের ইচ্ছা ও চাহিদাকে গুরুত্ব প্রদান করে থাকে।
- কোন আলাদা বা স্বতন্ত্র প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয় না।
- বিভিন্ন ধরণের শিখন পদ্ধতির মধ্যে সমন্বয় সাধন করে থাকে।
- শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধরণের তথ্য অনুসন্ধানের জন্য সুযোগ প্রদান করে।

অনলাইন লার্নিং-এর অসুবিধা (Disadvantages of Online learning) :

- অনলাইন লার্নিং-এর দ্বারা ব্যবহারিক বিষয়গুলিকে সঠিকভাবে আয়ত্ত করা সম্ভবপর হয় না।
- শিক্ষার্থীদের সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায় না।
- শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ অভাব পরিলক্ষিত হয়।
- শিক্ষার্থীদের দ্বারা অধিকৃত জ্ঞানের মূল্যায়ন সঠিকভাবে করা যায় না।
- সঠিক প্রতিক্রিয়া অভাব লক্ষ্য করা যায়।

1.3.3 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির পরিধি (Scope of Information & Communication Technology)

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির পরিধি ব্যক্তিজীবন সমাজজীবন, জাতীয় জীবন এবং আন্তর্জাতিক স্তরে এত দ্রুত গতিতে বিস্তৃত হচ্ছে যা এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার মধ্যে বেঁধে রাখা সম্ভব নয়। আমাদের আলোচনা যেহেতু শিক্ষা প্রসঙ্গে সীমাবদ্ধ তাই শিক্ষাব্যবস্থায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির পরিধি নিম্নে আলোচিত হল। শিক্ষাব্যবস্থার যেসব ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয় তা হল—

(১) শ্রেণিকক্ষ শিক্ষণ

(২) শিক্ষা ব্যবস্থাপনা

(৩) শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতা পরিমাপন

(৪) দূরশিক্ষা

(৫) স্বয়ং শিখন।

(1) শ্রেণিকক্ষ শিক্ষণ (Classroom Teaching) : শ্রেণিকক্ষ শিক্ষণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নিম্ন ক্ষেত্রগুলিতে হৃত হয়, যেমন-

- শ্রেণিকক্ষে উভয়মুখী যোগাযোগ অর্থাৎ শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়েই পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া করার সুযোগ পায়।
- উত্তম শিখনের জন্য কার্যকরী ফিব্যাক পাওয়া যায়। এই ফিডব্যাকের মাধ্যমে শিক্ষক বুঝতে পারেন শিক্ষার্থীরা তাঁর বক্তব্য সঠিকভাবে বুঝতে পেরেছে কিনা। অন্যথা হলে শিক্ষক পুনরায় সচেষ্ট হবেন এবং প্রয়োজনমতো নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করবেন।
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রেষণা সঞ্চার হয়। উপযুক্ত মনোযোগ ব্যতীত শিক্ষার্থী শিক্ষকের বক্তব্য অনুধাবন করতে পারে না। এমতাবস্থায় শিক্ষার্থী আরও মনোযোগ দেয় অর্থাৎ তার মধ্যে প্রেষণা সঞ্চারিত হয়।
- শিক্ষাপোকরণ হিসাবে তথ্য ও প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়।

(2) শিক্ষা ব্যবস্থাপনা (Educational Management) : শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

- অর্থ, ফিস, অনুদান ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য সংরক্ষণ করা হয়।
- বিভিন্ন কার্যাবলির ফলাফল সংরক্ষণ করা।
- প্রয়োজন মতো তথ্যগুলিকে লেখচিত্রে রূপদান।
- কোন কাজ কোনসময় এবং কবে করা হবে তা নির্দিষ্ট করে রাখা।
- দৈনন্দিন কার্যাবলি তালিকাবদ্ধ করা।
- জাতীয়স্তরে ডেটা ব্যাংকের প্রয়োজনমতো বিদ্যালয় সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ করা।
- বিদ্যালয় কর্মচারী সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সংরক্ষণ করা।
- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভরতির ক্ষেত্রে বর্তমানে তথ্য এবং যোগাযোগ প্রযুক্তিকে ব্যবহার করা হচ্ছে।

(3) শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতা পরিমাপ (Assessment of Learner Performance) : বর্তমানে শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতা পরিমাপের ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অন্যতম কৌশল অনলাইনের ব্যবহার। পরে পরিমাপের মানগুলিকে কম্পিউটারের সাহায্যে সংরক্ষণ করা যায় যা পরবর্তী সময়ে প্রয়োজনমতো ব্যবহার করা হয়। শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষাগত পারদর্শিতা সম্পর্কে নিজেই বিচার করতে পারে।

(4) দূরশিক্ষা (Distance Education) : সাম্প্রতিককালে দূরশিক্ষার চাহিদা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে যার ফলে আশাতীতভাবে দূর শিক্ষার প্রসার ঘটেছে। বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে দূরশিক্ষার সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ভূমিকার উপর অর্থাৎ দূরশিক্ষা বর্তমানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির কৌশল, যেমন টেলিকনফারেন্সিং, ভিডিয়ো ক্যাসেট, ইন্টারনেট প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়।

(৫) স্বয়ং শিখন (Self Learning) : স্বয়ং শিখনের ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রোগ্রামড শিখন, ওয়েবসাইট ইন্টারনেট প্রভৃতির সাহায্যে শিক্ষার্থীরা নিজেরাই নিজেদের জ্ঞান বৃদ্ধি করছে। অর্থাৎ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির আবিষ্কৃত বিভিন্ন বৈদ্যুতিন মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির পরিধি আলোচনায় উপরোক্ত বিষয়গুলি ছাড়া আরও কিছু বিষয় সংযোজন করা যায়। যেমন ভাষা শিক্ষা (Language Teaching), ETV, অণুশিক্ষণ (Micro Teaching), বেতার এবং দূরদর্শনের মাধ্যমে সম্প্রচার ইত্যাদি ক্ষেত্রেও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার প্রসার লাভ করেছে।

1.3.4 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিগত সিস্টেমের উপাদানসমূহ (Components of Information & Communication Technology System)

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিগত সিস্টেমের ছয়টি উপাদান রয়েছে। সেইগুলি হল—

- **সফওয়্যার (Software) :** সফওয়্যার বলতে সাধারণত কম্পিউটার প্রোগ্রামের সমন্বয়কে বোঝায় যা প্রত্যেকটি কাজকে ধাপে ধাপে সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করে থাকে। এর সাহায্যে কম্পিউটারে কোনো নির্দিষ্ট প্রকারের কাজ সম্পাদন করা যায়। কম্পিউটারের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকারের সফওয়্যারকে চালানো যায় ও সার্বিকভাবে কম্পিউটার পরিচালনার জন্য এক প্রকারের সফওয়্যার রয়েছে যেগুলিকে অপারেটিং সিস্টেম বলা হয়। যেমন লিনাক্স, ম্যাক ওএস, মাইক্রোসফট উইন্ডোজ, ইত্যাদি। আবার সফওয়্যারগুলি কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার ও অন্যান্য সফওয়্যারের মাঝে সমন্বয় সাধন করে এবং কম্পিউটারের মাধ্যমে সকল প্রকারের কাজ সম্পাদনে সাহায্য করে।
- **হার্ডওয়্যার (Hardware) :** এইগুলি হল একটি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিগত সিস্টেমের ভৌত উপাদান। হার্ডওয়্যারের অন্তর্গত ইনপুট ডিভাইসগুলি হল কীবোর্ড, মাউস, স্ক্যানার, ইত্যাদি, স্টোরেজ ডিভাইসগুলি হল মেমরি, হার্ড-ড্রাইভ, ইত্যাদি এবং আউটপুট ডিভাইসগুলি হল প্রিন্টার, প্লটার ইত্যাদি। এক কথায় বললে বলা যায় যে, কম্পিউটারের ইনপুট ডিভাইস ও আউটপুট ডিভাইসসহ অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সকল যন্ত্রংশকে একসাথে কম্পিউটার হার্ডওয়্যার বলা হয়।

- **তথ্য (Information) :** সংগৃহীত ডেটা বা উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণের পর প্রয়োজন মত সাজানো বা অর্থপূর্ণ অবস্থাকে তথ্য বা ইনফরমেশন বলা হয়। অন্য ভাবে বললে বলা যায় যে, বিভিন্ন ডেটাকে প্রক্রিয়াজাতকরণ, পরিচালন এবং সংঘবদ্ধকরণের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফলকে তথ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

- **প্রক্রিয়া (Procedure) :** প্রক্রিয়া বলতে কোন একটি কার্যক্রমকে পরিচালিত করার নির্দিষ্ট ক্রমকে বোঝানো হয়। বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে ডেটা বা তথ্য আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের প্রক্রিয়াকে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

- **ব্যক্তি (People) :** এরা আইসিটি সিস্টেমের জন্য তথ্য সরবরাহ করে থাকে ও আউটপুট সিস্টেমের থেকে প্রাপ্ত তথ্যকে সঠিক ভাবে যাচাই করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে।

- **উপাত্ত (Data) :** কোন নির্দিষ্ট কর্মসূচীপরিকল্পনা প্রণয়ন, বা সিদ্ধান্ত গ্রহনের জন্য উপাদান হিসেবে যা ব্যবহৃত হয় তাকেই উপাত্ত বলা হয়ে থাকে। 'উপাত্ত' হল একটি তথ্যের ক্ষুদ্রতম একক; যার অর্থ রয়েছে, কিন্তু এটি পূর্ণাঙ্গ নয়। আর কতিপয় 'উপাত্ত' একত্রিত হয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ 'তথ্য' তৈরি করে।

1.3.5 তথ্য ও ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রকারভেদ (Types of Information Communication Technology)

প্রয়োগক্ষেত্রের উপর ভিত্তি করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে মোটামুটি চারটি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। সেইগুলি হল—

ক. **কম্পিউটিং অ্যান্ড ইনফর্মেশন সিস্টেম (Computing and Information (system) :** কম্পিউটারসহ সকল ধরনের ইলেক্ট্রনকিস ডেটা প্রসেসিং যেখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও এক্সপার্ট সিস্টেম ইত্যাদির ব্যবহার করা হয় তা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অন্তর্গত।

খ. **ব্রডকাস্টিং (Broadcasting) :** একমুখী তথ্য সম্প্রচারের সাথে যুক্ত প্রযুক্তিগত উপকরণ যেমন—রেডিয়ো, টেলিভিশন এই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অন্তর্গত।

গ. **টেলিকমিউনিকেশন (Telecommunication) :** সকল ধরনের টেলিফোনি পরিসেবা যেমন — টেলিফোন ও মোবাইল বা সেলুলার ফোনসহ সকল ধরনের টেলিযোগাযোগ এই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অন্তর্গত।

ঘ. **ইন্টারনেট সিস্টেম (Internet (system) :** টেলিকমিউনিকেশন অবকাঠামো ব্যবহার করে গড়ে ওঠা আন্তর্জাতিক কম্পিউটার নেটওয়ার্ককে আমরা ইন্টারনেট বলে থাকি। যার দ্বারা

আমরা যে কোন সময় যে কোন স্থান থেকে যে কোন ধরনের তথ্যকে আদান-প্রদান করতে পারি। এই ধরনের পরিসেবা এই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অন্তর্গত।

1.3.6 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের সুবিধাসমূহ (Advantages of using Information and Communication Technology)

এই প্রযুক্তির ব্যবহারের সুবিধাগুলি হল—

- **যোগাযোগ ব্যবস্থাকে উন্নত করে :** এই প্রযুক্তি বর্তমানে নতুন যোগাযোগ পদ্ধতির পরিসরকে বিস্তৃত করেছে। যার মাধ্যমে আমরা তাৎক্ষণিকভাবে ও স্বল্প মূল্যে পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে থাকা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করতে পারি। এই প্রযুক্তির সাহায্যে খুব সহজেই কোনোরকম সরাসরি সামাজিক যোগাযোগ ছাড়াও টেক্সট-ভিত্তিক কম্পিউটার কমিউনিকেশনের মাধ্যমে মানুষ একে অপরের সাথে যোগাযোগ রাখা সক্ষম।

- **বিশ্বায়ন :** আইসিটির আগে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে ভিডিও কনফারেন্সিং করতে হলে দেশে-বিদেশে অনেক মূল্য খরচ করতে সেই স্থানগুলোতে পৌঁছতে হতো। কিন্তু, এই প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহারের ফলে ভিডিও কনফারেন্সিং-এর ব্যবস্থাটি অনেক সরল ও সাশ্রয়ী হয়ে উঠেছে। এই আইসিটি কেবলমাত্র দেশ ও জনগণকে কাছাকাছি নিয়ে এসেছে তা নয়, বরং এই প্রযুক্তি বিশ্ব অর্থনীতিকে একটি স্বাধীন আন্তঃনির্ভর ব্যবস্থায় পরিণত করেছে; যাতে ব্যবসা বা ব্যক্তিগত যোগাযোগ মাধ্যমের রাস্তা আরও প্রশস্ত হয়ে ওঠে।

- **যোগাযোগের খরচ কার্যকরীভাবে কমায় :** তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রধান সুবিধাগুলোর মধ্যে অন্যতম হল এই যে, এটি একটি অতিরিক্ত সাশ্রয়ী যোগাযোগ মাধ্যম। যেকোনো টেলিফোন কলিং, মেসেজিং অনেকটাই ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ। অন্যদিকে, ইন্টারনেট মাধ্যম অনেকটাই সস্তা ও অনেক বেশি পরিমাণ দূরত্বের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করতে সক্ষম। আর, উন্নত যোগাযোগ মাধ্যম হওয়ার ফলে, এই প্রযুক্তি মানুষের তথা প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনশীলতা ও আয় বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। এছাড়াও, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করার ফলে, ব্যবসাগুলো মূল্য বা গুণমানের সাথে আপস না করে, কম খরচেই যোগাযোগের ব্যবস্থা ব্যবহার করতে সক্ষম হয়।

- **সারাক্ষণ যোগাযোগ মাধ্যমের উপলব্ধতা :** একটা ফোন কল নির্দিষ্ট সময়ের পর শেষ হয়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু, ইন্টারনেট মাধ্যম ও আইসিটি ব্যবহার করে আপনি কোনো ইমেইল বা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে বার্তা পাঠালে, তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে অন্যদের কাছে ২৪ ঘন্টা বা সপ্তাহের যেকোনো দিন উপলব্ধ থাকে। ফলে, এই প্রযুক্তি যেকোনো যোগাযোগ মাধ্যমকে অনেক বেশি সহজলভ্য করে তুলেছে।

- **সাংস্কৃতিক ব্যবধান পূরণ :** যেহেতু, এই প্রযুক্তির ব্যবহার সারা বিশ্বকে আমাদের হাতের মুঠোতে এনে দিয়েছে; এই কারণেই আমরা বিভিন্ন জাতি-ধর্ম-ভাষা-সংস্কৃতির মানুষের সাথে ভার্চুয়ালভাবে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারছি। এর ফলে, আমরা বিভিন্ন সংস্কৃতির লোকেদের সাথে সাংস্কৃতিক ব্যবধানও পূরণ করতে পারছি। বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষদের মধ্যে মতামত ও ধারণার আদানপ্রদান সম্ভব হচ্ছে এই আইসিটির সাহায্যেই। যার কারণে মানুষের মনে সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে ও কুসংস্কারের মাত্রাও অনেকটা কমছে।

- **কৌশলগত চিন্তাভাবনাকে উৎসাহিত করে :** ভালো যোগাযোগ ব্যবস্থা কিন্তু সমালোচনামূলক চিন্তাকে আরও বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে। যার ফলে, প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা খুব কম সময়ের মধ্যেই তথ্যের আদানপ্রদান করতে পারে। যোগাযোগের চিন্তা না থাকায়, কর্মীরা কাজের উন্নতির জন্য আরও ভালো কৌশল ব্যবহার করতে সক্ষম হয়। তাই, ডেটা কমিউনিকেশনের অন্যতম সুবিধা হল এই যে, এটি আমাদেরকে আরও কার্যকর পরিকল্পনা করতে সাহায্য করে। এই প্রযুক্তি, আমাদের জ্ঞান আদানপ্রদান ও কৌশলগত চিন্তাভাবনাকে উৎসাহিত করে। আইসিটি যেকোনো সংস্থাকে উন্নতি করতে সাহায্য করে।

- **শিক্ষাক্ষেত্রের ব্যাপক প্রসার :** তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যাপক উন্নতি ইন্টারনেট মাধ্যমের পথ আরও প্রশস্থ করেছে। বর্তমানে, এই আইসিটি সকল ব্যক্তিকে বিশাল তথ্য ভান্ডারের অ্যাক্সেস প্রদান করে। যার ফলে, পড়ুয়ারা তাদের পছন্দমতো বিষয় সম্পর্কে কেবল পাঠ্য পুস্তক ছাড়াও ইন্টারনেট মাধ্যম ব্যবহার করেও পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারে। তাছাড়াও, এখনকার ই-লার্নিং অ্যাপ ও নানান ধরণের এডুকেশনাল ওয়েবসাইট পড়াশোনার জগৎকে অনেক বেশি বাস্তবসম্মত ও জ্ঞান আহরণের শ্রেষ্ঠ জায়গাতে রূপান্তরিত করেছে। আইসিটির মাধ্যমে ইন্টারনেটে প্রাপ্ত ছবিগুলোকে সহজেই শিক্ষাদানে ও শিক্ষার্থীদের স্মৃতিশক্তির উন্নতিতে ব্যবহার করা সম্ভব। এই ধরণের প্রযুক্তি ব্যবহার করে শিক্ষকরা সহজে জটিল গঠন ও নির্দেশনা বিদ্যার্থীদের কাছে ব্যাখ্যা করতে পারেন।

এর সাহায্যে শিক্ষার্থীরা খুব সহজেই পড়াশোনার বিষয়গুলো বুঝতে পারে।

1.3.7 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের অসুবিধাসমূহ (Disadvantages of using Information and Communication Technology)

বেশ কিছু সুবিধার পাশাপাশি এই আধুনিক প্রযুক্তির ক্ষেত্রে রয়েছে বেশ কিছু অসুবিধাও। সেই অসুবিধাগুলি হল—

- **শিক্ষার ক্ষেত্রে বাধার অবকাশ :** সবরকমের আর্থিক অবস্থার মানুষের পক্ষে এই প্রযুক্তির ব্যবহার সব সময় সম্ভব হয়ে ওঠে না। এই কারণেই, অনেক মানুষ শিক্ষাক্ষেত্রে অবাধে

ইন্টারনেট মাধ্যম ব্যবহার করে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারে না। তাছাড়াও, ইন্টারনেট মাধ্যমের ভার্চুয়াল পড়াশোনাতে পড়ুয়াদের অমনোযোগী হয়ে যেতেও দেখা যায়। তাই, বলা যেতে পারে, পড়াশোনার ক্ষেত্রে সবসময় এই প্রযুক্তি ফলপ্রদ হয় না।

- **কাজের নিরাপত্তার অভাব :** বর্তমানে বেশিভাগ প্রতিষ্ঠানই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকেই প্রধান কর্মচারী হিসেবে বিবেচনা করছে। আর, বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞরা বিশ্বাস করেন যে, আইসিটি মানুষের চাকরির নিরাপত্তাকে অনেক বড় সমস্যার সম্মুখীন করে তুলেছে। যেহেতু, প্রযুক্তি দিনের পর দিন উন্নত হয়েই চলেছে; তাই এই প্রযুক্তি সম্পর্কে মানুষকে সবসময় অধ্যয়ন করে যেতে হবে বা অন্ততপক্ষে তাদের পেশার পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে এগোতে হবে। যদি, তারা নিজেদেরকে সময়ের সাথে সাথে আপডেট করতে না পারে, তাহলে তাদের চাকরির নিরাপত্তা চলে যেতে পারে।

- **সংস্কৃতির আগ্রাসন :** আইসিটি বিশ্বকে একটি গ্লোবাল ভিলেজ পরিণত করেছে, তা ঠিক। তবে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কোনো বড় সংস্কৃতি ছোট ছোট সংস্কৃতিগুলোর ক্ষেত্রে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। তাই, এই ক্ষেত্রে আইসিটির মাত্রাতিরিক্ত প্রসারে একটি সংস্কৃতি আরেকটি দুর্বল সংস্কৃতিকে গ্রাস করে নিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলে যেতে পারে যে, পশ্চিমী দেশের সংস্কৃতি প্রাচ্য দেশগুলোর সংস্কৃতির উপর গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে চলেছে।

- **গোপনীয়তার নিরাপত্তহীনতা :** যেহেতু, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এক বিশাল তথ্য ভান্ডারের রাস্তা উন্মুক্ত করেছে; তাই এখানে তথ্যের নিরাপত্তা খুবই দুর্বল। যদিও, এই প্রযুক্তি যোগাযোগকে দ্রুত, সহজ ও সুবিধাজনক করে তুলেছে; তবে মানুষের তথ্যের গোপনীয়তার ক্ষেত্রে তৈরী হয়েছে নানান ধরণের সমস্যা। তা ফোন সিগন্যাল ইন্টারসেপশন হোক কিংবা ই-মেইল হ্যাকিং, সবক্ষেত্রেই মানুষের ব্যক্তিগত তথ্য গোপনীয়তাহীনতার কবলে পড়ে যায়।

- **প্রযুক্তির উপর নির্ভরতা :** যেহেতু, প্রযুক্তি জীবনকে সহজ করার কাজে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে; সেই কারণেই সামান্য অংকের হিসেবে করতেও মানুষ খাতা-কলমের বদলে ক্যাল্কলেটরের ব্যবহার করছে। কিংবা, জীবনের নানান নিত্য-নৈমিত্তিক কাজেও তারা এই প্রযুক্তির ব্যবহার করছে, যেমন—অনলাইন শপিং, অনলাইন গ্রোসারি শপিং ও ইত্যাদি। যা মানুষকে ক্রমে নিষ্ক্রিয় ও প্রযুক্তি নির্ভর করে তুলছে। প্রকৃতপক্ষে, মানুষের মধ্যে সামাজিকতা ব্যাপারটি কমে যাচ্ছে।

- **তথ্যের নির্ভরযোগ্যতার অভাব :** যে কেউ একটি কম্পিউটার ও ইন্টারনেট সংযোগ ব্যবহার করে তথ্য আপলোড করতে পারে। তাই, ইন্টারনেট মাধ্যমে কোনো কিছু থাকার মানেই যে এটি সবসময় নির্ভরযোগ্য হবে, তা কিন্তু নয়। উদাহরণস্বরূপ, ওপেন সোর্স এনসাইক্লোপিডিয়া

(যেমন- উইকিপিডিয়া) তথ্যের ভালো উৎস হিসেবে বিবেচিত হলেও, এইগুলো একাডেমিক প্রতিষ্ঠানগুলোর দ্বারা বিশ্বস্ত রেফারেন্স হিসাবে গ্রাহ্য করা হয় না। এছাড়াও, নানা ধরণের ক্ষতিকারক কম্পিউটার ভাইরাস, ট্রোজান, ম্যালওয়্যার, স্প্যাম, ওয়ার্ম, ফিশিং- এই সমস্তই মানুষের দৈনন্দিন জীবনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারে ও জীবনকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলতে পারে।

- **অভিজ্ঞতার অভাব :** বিশ্বের সব মানুষ এই প্রযুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে এটি ব্যবহার করতে নাও জানতে পারেন। তাই, এই আইসিটি টুল ব্যবহার করে অভিজ্ঞতার অভাবের অনেক মানুষই সঠিকভাবে এই প্রযুক্তির ব্যবহার করতে পারেন না। আবার, এই ধরণের প্রযুক্তির ডিভাইসগুলো সেট আপ করাও অনেক সময় ঝামেলার হতে পারে।

1.3.8 সমাজে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রভাব (Impact of Information and Communication Technology in Society)

বর্তমান যুগ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যুগ। আধুনিক সভ্যতার ক্রমবিকাশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রভাব অপরিসীম। বর্তমান সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। তথ্য প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, যোগাযোগ, শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্প, অফিস-আদালত সর্বোপরি মানুষের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষণীয়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়ন মানব সমাজের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রকে পরিবর্তিত করেছে এবং বিভিন্নভাবে আমাদের জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করছে।

সমাজ জীবনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রভাব কখনও ইতিবাচক আবার কখনও নেতিবাচক। বর্তমানে যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি হয়েছে। যার প্রধান কারণ হল ইন্টারনেট পরিসেবা। অতীতে একস্থান থেকে অন্যস্থানে কোন কিছু তথ্য আদান-প্রদানের জন্য অনেক সময় লাগত। কিন্তু বর্তমানে, ইন্টারনেটের মাধ্যমে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে খুব সহজেই তথ্যকে আদান-প্রদান করা যায়। এছাড়াও, ইন্টারনেটের ব্যবহারের দ্বারা যোগাযোগ খরচ অন্যান্য যোগাযোগের মাধ্যম যেমন—টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, ইত্যাদির তুলনায় অনেক কম হয়।

সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ইতিবাচক প্রভাবগুলিকে নিম্নে আলোচনা করা হল—

1. **শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রভাব (Impact of Information and Communication Technology in Education) :**

   শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে অন্তর্ভূক্ত করার নানাবিধ প্রয়াস দেখা যায়। বিভিন্ন দেশের সরকার তাদের নাগরিকদেরকে

তথ্যপ্রযুক্তিতে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে শিক্ষাক্রমেতথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে অন্তর্ভূক্ত করেছে। আবার তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে আকর্ষণীয় ডিজিটাল শিক্ষা উপকরণ প্রস্তুত করা যায় যার সাহায্যে শিক্ষার্থীরা সহজে ও আনন্দের সাথে শিখতে পারে। শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বহুবিধ প্রয়োগকে তিনটি শ্রেনীতে ভাগ করা যেতে পারে। সেইগুলি হল—(ক) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে জানা ও আয়ত্ব করা, (খ) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে শেখা এবং (গ) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

(ক) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে জানা ও আয়ত্ব করা (Learning about Information and Communication Technology) :

UNESCO কর্তৃক International Commission on Education for Twenty-First Century-এর প্রতিবেদনে ICT-কে একবিংশ শতাব্দীর জন্য একটি আবশ্যকীয় দক্ষতা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ফলে শিক্ষার্থীদেরকে তথ্যপ্রযুক্তিতে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে প্রস্তুত করার লক্ষ্য থেকে বিশ্বের প্রায় সকল দেশের শিক্ষাক্রমে নতুন বিষয় হিসেবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

(খ) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে শেখা (Learning with Information and Communication Technology) :

শিক্ষণ-শিখন (teaching-learning) কার্যক্রমকে আকর্ষণীয় ও কার্যকর করার এক অভূতপূর্ব সুযোগ সৃষ্টি করেছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে আকর্ষণীয় ডিজিটাল শিক্ষা উপকরণ প্রস্তুত করা যায়, যা গতানুগতিক শিক্ষা উপকরণের চেয়ে অনেক বেশি কার্যকর। শিক্ষকগণ ডিজিটাল শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করে সফলভাবে শ্রেণিতে পাঠদান করতে পারেন। ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব (www) এবং ইন্টারনেটের ব্যবহার করে শিক্ষার্থীরা তাদের শ্রেণীকক্ষ ও পাঠ্য পুস্তকের সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্বব্যপী জ্ঞানের সন্ধান করতে পারে। আবার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সাহায্যে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য বিভিন্ন Computer Assisted Learning (CAL) ও Computer Assisted Instruction (CAI) সফটওয়্যার প্রস্তুত করা যায়। ফলে বিশ্বব্যাপী সবার জন্য শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

(গ) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা (Learning through Information and Communication Technology) :

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির কল্যাণে শিক্ষাব্যবস্থায় এক নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। এখন যে কোন মানুষ যে কোন সময় যে কোন স্থান (anyone, anytime, anywhere) থেকে শিক্ষা

লাভ করতে পারে। ভারতে বসেও এখন একজন শিক্ষার্থী চাইলে আমেরিকার কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্স করতে পারে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বহুমুখী সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে এটা সম্ভব হয়েছে। বাস্তবে একজন শিক্ষার্থী তার শিক্ষককে মুখোমুখী না দেখেও বরং ইমেইল, চ্যাটিং, ভিডিও কনফারেন্সিং-এর সাহায্যে পাঠ গ্রহন করতে পারেন। অনলাইনে শিক্ষক তার শিক্ষার্থীর পরীক্ষা গ্রহণ ও মূল্যায়ন করে সার্টিফিকেট প্রদান করতে পারে। আর এই ব্যবস্থাকে সহজভাবে Virtual Learning Environment (VLE) বলা হয়। এই ধরণের শিক্ষা ব্যবস্থা বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় হচ্ছে এবং বর্তমানে বিভিন্ন দেশে Virtual University, Virtual Library, Virtual Museum ইত্যাদি গড়ে উঠেছে।

2. ব্যবসা-বাণিজ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রভাব (Impact of Information and Communication Technology in Business) :

আধুনিক জীবন যাপনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির গুরুত্ব অপরিসীম। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মানুষের জীবনকে করেছে উন্নত, জীবনযাত্রাকে করছে সহজ। তথ্যপ্রযুক্তির ক্রমবিকাশের ফলে পরিবর্তন এসেছে সমাজের বিভিন্ন স্তরে। জীবনের অন্য সব ক্ষেত্রের মতো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রয়োগ ব্যবসা-বাণিজ্যে আমূল পরিবর্তন এনেছে। ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা ও মানোন্নয়নের জন্য দ্রুত ব্যবসায়িক যোগাযোগ রক্ষা, পণ্য বা সেবা প্রদান ও অন্যান্য ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যাপক ভূমিকা পালন করছে। আজকাল ব্যাংক, বিমা, ক্রেডিট কোম্পানি, বিমান, পরিবহন ইত্যাদি সম্পূর্ণ প্রযুক্তিনির্ভর। যে কোনো ব্যবসার মূল উদ্দেশ্য থাকে কম সময়ে এবং কম খরচে পণ্য উৎপাদন করা। একই সঙ্গে দ্রুততম সময়ে তা ভোক্তার কাছে পৌঁছে দেওয়া। পণ্যের জন্য কাঁচামাল সংগ্রহ থেকে শুরু করে কর্মী ব্যবস্থাপনা, কর্মীদের দক্ষতার মানোন্নয়ন, উৎপাদন ব্যবস্থাপনা, বিপণন ও সেবার বিনিময় মূল্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে। হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যারের সমন্বিত এবং উদ্ভাবনী প্রয়োগের মাধ্যমে ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসার উন্নয়নের পাশাপাশি মুনাফাও বাড়াতে পারে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সহায়তায় ব্যবসায় নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি অর্জিত হয়—

- আইসিটি নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে কম সময়ে অধিক উৎপাদন করা যায়। তাতে উৎপাদন খরচ হ্রাস পায়।
- মোবাইল ফোন ও ইমেইলের মাধ্যমে ব্যবসা সম্পর্কিত সব ধরনের যোগাযোগ দ্রুত সম্ভব হয়।
- ইন্টারনেটে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে পণ্যসেবার খবর সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেওয়া যায়, ব্লগ কিংবা সামাজিক যোগাযোগ সাইটের মাধ্যমে স্বল্প মূল্যে কিংবা বিনা মূল্যে পণ্য বা সেবার বিজ্ঞাপন প্রচার করা যায়।

- বিভিন্ন ধরনের ডাটাবেস সফটওয়্যার ব্যবহার করে পণ্যের মজুদ, কর্মীদের তথ্যাবলি, গ্রাহকের তথ্যাবলি এবং সঠিক হিসাব সংরক্ষণ করা যায়।

3. গবেষণায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রভাব (Impact of Information and Communication Technology in Research) :

বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের ধারায় তথ্য প্রযুক্তির বৈপ্লবিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। অতীতে কোনো একজন গবেষক তার গবেষণার কাজটি অসমাপ্ত রেখে মারা গেলে অথবা অন্য কোনো কারণে তার গবেষণার কাজটি চালিয়ে যেতে না পারলে, গবেষণার কাজটি সেখানেই সমাপ্ত হয়ে যেত কোনো ফলাফল ছাড়া। এছাড়াও, অতীতে এমন ঘটনাও ঘটেছে যেখানে দুটি ভিন্ন দেশের গবেষক একই সাথে একই বিষয়ের ওপর গবেষণা করছে কিন্তু তাদের মধ্যে কোন যোগাযোগ না থাকার কারণে তারা এই বিষয়ে অবগত হতে পারতেন না। একজন গবেষক অন্য গবেষকের গবেষণা সংক্রান্ত অগ্রগতি ও ফলাফল সম্পর্কেও জানতে পারতেন না। কিন্তু বর্তমানে, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সহায়তায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন গবেষণা কর্ম নতুনভাবে প্রকাশিত হওয়ার ফলে টেলিফোন, টেলিভিশন, ইন্টারনেট, ই-মেইল ইত্যাদির মাধ্যমে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে এবং একইসাথে গবেষণা কর্মও সমৃদ্ধি লাভ করছে। গবেষণার ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ৩টি ক্ষেত্রের বর্ণনা দেওয়া হল—

- **বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি :** বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নানা ধরনের উৎকর্ষ সাধনে গবেষণার প্রয়োজন। মানুষ সাহিত্য, শিল্প, সমাজবিজ্ঞান, গণিত, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যা নিয়েই গবেষণা করুক না কেন, তথ্যপ্রযুক্তি ছাড়া চিন্তাই করা যায় না।

- **তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণে :** গবেষণা কর্মটিকে সঠিকভাবে পরিচালিত করতে নানা ধরনের তথ্যের প্রয়োজন হয়। আর এসব তথ্য সংগ্রহ করতে হয়, প্রক্রিয়া করতে হয়, বিশ্লেষণ করতে হয় এবং গবেষণা শেষে তথ্যকে সুন্দরভাবে প্রদর্শন করতে হয়। আগে মানুষকে এসব কাজ দৈহিক পরিশ্রম করে করতে হত, কিন্তু বর্তমানে, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সাহায্যে এসব কাজ অনেক সহজ হয়ে গেছে।

- **তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক গবেষণা :** গবেষণাগুলোকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন-তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক। তাত্ত্বিক গবেষণায় গবেষকরা একটা বিষয়ে তাত্ত্বিক অংশটুকু নিয়ে চিন্তাভাবনা করেন এবং সে জন্য তাঁদের কম্পিউটারের ওপর নির্ভর করতে হয়। গবেষণার কাজটুকু ঠিকভাবে অগ্রসর হচ্ছে কি না সেটা দেখার জন্য তাঁদের তথ্যের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হয় এবং এ জন্য বিশাল ডাটাবেস বা তথ্য ভাণ্ডারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হয়, তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার করতে হয়। ব্যবহারিক গবেষণা করতে হয় ল্যাবরেটরিতে। নানা রকম যন্ত্র ব্যবহার করে সেখানে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। অবধারিত ভাবেই বলে দেওয়া যায়, একটি যন্ত্র থেকে

তথ্য নিয়ে সেটা প্রক্রিয়া করার জন্য সব সময়ই কম্পিউটার ব্যবহার করা হয়। তাই আধুনিক সব ধরনের গবেষণায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

4. অফিস-আদালতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রভাব (Impact of Information and Communication Technology in Office) :

যে কোনো দেশের সরকার জনগণের জন্য নিরাপদ, সৃজনশীল উদ্ভাবনের বিকাশ হয় এমন কর্মসংস্থান এবং সর্বোপরি মানুষকে দারিদ্র্য থেকে মুক্ত করার জন্য নানা ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে। সরকারের সাধারণ কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে আইন ও নীতি প্রণয়ন এবং তার বাস্তবায়ন। সরকার বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দপ্তর ও সংস্থার মাধ্যমে এসব কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এসব কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে সরকারি সব কাজেই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োগ রয়েছে। যেমন- বর্তমানে ওয়েবসাইট বা পোর্টালের মাধ্যমে সরকারের বিভিন্ন দিকনির্দেশনা কিংবা নিয়মকানুন সর্বসাধারণের কাছে খুব সহজে পৌঁছে দেওয়া সম্ভবপর হয়েছে। এছাড়াও, সরকারের বিভিন্ন নীতিমালা, আইন ইত্যাদি প্রণয়ন এবং অনেক ক্ষেত্রে সংশোধন বা পরিমার্জনের জন্য জনগণের মতামত ইন্টারনেটের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। বর্তমান অফিস ব্যবস্থাপনায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে দৈনন্দিন কাজকে আরো সহজ-সরল ও সাবলীল করে তুলেছে। বর্তমান অফিস ব্যবস্থাপনায় যুক্ত হয়েছে নতুন কিছু শব্দ, এর মধ্যে ই-গভর্নেন্স অন্যতম। রাষ্ট্রীয় পরিচালনাধীন অফিস ও স্বায়ত্বশাসিত অফিস সমূহ ই-গভর্ণনেন্সের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অভূতপূর্ব উন্নয়নের ফলে আমরা পেয়েছি সহজ ও বোধগম্যতা সম্পন্ন অফিস ব্যবস্থাপনা।

5. চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রভাব (Impact of Information and Communication Technology in Medical Science) :

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নতির ফলে চিকিৎসা শাস্ত্র হয়ে উঠেছে চিকিৎসা বিজ্ঞান। চিকিৎসা বিজ্ঞান বা চিকিৎসা শাস্ত্র হল রোগ উপশমের বিজ্ঞান কলা বা শৈলী। মানব শরীর এবং মানব স্বাস্থ্য ভালো রাখার উদ্দেশ্যে রোগ নিরাময় ও রোগ প্রতিষেধক বিষয়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানে অধ্যায়ন করা হয় এবং প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। সমসাময়িক চিকিৎসা বিজ্ঞানে স্বাস্থ্য বিজ্ঞান অধ্যয়ন, গবেষণা, এবং সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যবহার করে লব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে ঔষধ বা শল্য চিকিৎসার দ্বারা রোগ নিরাময় করার চেষ্টা করা হয়। ঔষধ বা শল্য চিকিৎসা ছাড়াও মনোচিকিৎসা (psychotherapy), কৃত্রিম অঙ্গ সংস্থাপন, আনবিক রশ্মির প্রয়োগ, বিভিন্ন বাহ্যিক উপায় (যেমন, স্প্লিন্ট (Splint) এবং ট্রাকশন), জৈবিক সামগ্রী (রক্ত, অণু জীব ইত্যাদি), শক্তির অন্যান্য উৎস (বিদ্যুৎ, চুম্বক, অতি-শব্দ ইত্যাদি) ইত্যাদিরও প্রয়োগ করা হয়। অধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ভূমিকা অপরিসীম। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে মোবাইল ফোন এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে খুব সহজেই স্বাস্থ্য পরিসেবা

পাওয়া যায়। ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের ওয়েবসাইট থেকে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরিসেবা পাওয়া যায়। অনলাইনের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের কাছ থেকে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরও পাওয়া যায়।

বর্তমানে টেলিমেডিসিনের মাধ্যমে চিকিৎসা পরিসেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। টেলিমেডিসিন হল যোগাযোগ প্রযুক্তির সাহায্যে দূর থেকে চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করার পদ্ধতি। এই ব্যবস্থায় পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কেউ যে কোনো সমস্যায় যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে এবং চিকিৎসা পরিসেবা নিতে পারে। বিজ্ঞানের যে কয়টি শাখা দ্রুত উন্নতি করেছে, চিকিৎসাবিজ্ঞান তার মধ্যে অন্যতম। তথ্যপ্রযুক্তির কল্যাণে বিশ্বের যে কোনো স্থানে বসেই এখন চিকিৎসা পরিসেবা গ্রহণ করা সম্ভব। তথ্যপ্রযুক্তির কল্যাণে চিকিৎসকেরা আর অনুমানের ওপর নির্ভর করে না। একজন রোগী সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে শরীরকে সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করা এবং রোগ নির্ণয় তথ্যপ্রযুক্তির সাহায্যে করা যায়। শুধু তাই নয়, প্রাপ্ত তথ্যগুলো ভবিষ্যতে প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্য ডেটাবেজে সংরক্ষণ করা যেতে পারে। তাই বলা যায়, চিকিৎসাক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ভূমিকা অপরিসীম।

6. বিনোদনের ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রভাব (Impact of Information and Communication Technology in Entertainment) :

বিনোদন ও সামাজিক যোগাযোগও বর্তমানে তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর হয়ে পড়ছে। দ্রুত ইন্টারনেট সংযোগ ও স্যাটেলাইট ব্যবসার সহজলভ্যতা বিশ্বব্যাপী যে কোন বিনোদন বিষয়কে এক সঙ্গে প্রচারের ব্যবস্থা করতে পারছে। বর্তমানে ক্রিকেট বা ফুটবল কিংবা অলিম্পিকের মতো ক্রীড়া অনুষ্ঠান বিশাল পর্দার জীবন্ত হয়ে সরাসরি সম্প্রচার করা হচ্ছে। কম্পিউটার গেম বিনোদনের এক প্রধান মাধ্যম। দ্রুত ইন্টারনেটের কল্যানে অনলাইনে দূর দেশের অন্য কারো সাথে গেমও খেলা যাচ্ছে। এ গেমগুলো শুধু যে বিনোদনই দেয় তা নয়, কম্পিউটারে দক্ষতা আনার জন্য গেমগুলো ভালো ভূমিকা পালন করতে পারে। এছাড়া, পৃথিবীর বিখ্যাত সিনেমা, গল্প, উপন্যাস, ডকুমেন্টারী ইত্যাদি অনলাইনে দেখা যায়। যে কেউ ইচ্ছা করলে যে কোনো সময় তা উপভোগ করতে পারে। অনলাইনের মাধ্যমে বিভিন্ন খেলাধুলোর তাৎক্ষণিক আপডেট বা সরাসরি খেলা দেখার সুযোগ রয়েছে। বর্তমানে, ইন্টারনেটে বসেই কাগজের পরিবর্তে বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকা বা ম্যাগাজিনের ডিজিটাল ভার্সন পড়া যায়। মোট কথা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আমাদের বিনোদনের সকল চাহিদাকে পূরণ করতে পেরেছে।

7. কৃষিক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রভাব (Impact of Information and Communication Technology in Agriculture) :

আমাদের দেশ কৃষি প্রধান দেশ। কৃষি শিল্পের সাথে সারা দেশের উন্নতি নির্ভর করে থাকে। আর

বর্তমান যুগে, কৃষি উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। আজ কাল জমির মাটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মাটির বিভিন্ন উপাদানের উপস্থিতির উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করতে পারা যায়, কোনো মাটিতে কোনো ফসল ভালো উৎপাদন হবে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির দৌলতে বিভিন্ন ফসলের উৎপাদন কৌশলও কৃষকরা জানতে পারেন। মানসম্মত হাইব্রিড জাতের কৃষিজ পণ্য উদ্ভাবনের সুযোগ সৃষ্টি করা বর্তমান সময়ের একটি অকল্পনীয় চাহিদা। বায়োটেকনোলজি একটি অত্যন্ত জটিল প্রক্রিয়া হওয়ায় এক্ষেত্রে উন্নত বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে আমাদের অভ্যন্তরীণ নতুন প্রযুক্তিবিদদের মধ্যে কৃষিতে আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রসার ঘটানো অত্যন্ত দরকারি বলে আমরা মনে করি। বহুমূল্য কৃষিজ পণ্যের রোগ নির্মূলে প্রতিরোধক তৈরির কাজে জরুরী পেপটাইড বিশ্লেষণ ইত্যাদি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোকে হাজারগুণে সহজ করে দেয় বায়োইনফরমেটিক্স-এর জ্ঞান। অনলাইন কৃষি বাজারও চালু হয়েছে। যার ফলে কৃষকরা সহজে বেশি দামে কৃষিপণ্যকে বিক্রি করতে পারে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন গবেষণা ও প্রয়োগের ফলে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মাধ্যমে উন্নত, অধিক ফলনশীল, প্রতিকূল পরিবেশে সহনশীল খাদ্যশস্য আবিষ্কার করছে যা কৃষিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে।

8. যোগাযোগের ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রভাব (Impact of Information and Communication Technology in Communication) :

যোগাযোগ ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এনেছে বিপ্লব। বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী এবং দ্রুততম যোগাযোগ ব্যবস্থা হল ইলেক্ট্রনিক যোগাযোগ মাধ্যম। কম্পিউটার-ভিত্তিক ইন্টারনেট ব্যবহার করে তাৎক্ষণিকভাবে পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে তথ্য আদান-প্রদান করে খুব সহজেই যোগাযোগ রক্ষা করা যায়। টেলিফোন, ফ্যাক্স, টেলিভিশন, টেলিপ্রিন্টার, কম্পিউটার, ইলেকট্রনিক মেইল ইত্যাদি যোগাযোগ মাধ্যম পৃথিবীকে এনেছে আমাদের হাতের মুঠোয়। সারা বিশ্বে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যাপক উন্নতির ফলে মানুষ মুহুর্তের মধ্যেই টেলিফোন, মোবাইল বা ইন্টারনেটের মাধ্যমে পৃথিবীর যেকোন জায়গায় যোগাযোগ করতে পারে। ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে যোগাযোগের জন্য অনেকগুলি মাধ্যম আছে। তার মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য মাধ্যমকে নিম্নে আলোচনা করা হল—

(ক) **ইলেক্ট্রনিক মেইল (Electronic Mail) :** ইলেকট্রনিক মেইলের সংক্ষিপ্ত রূপ হল ই-মেইল যা এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে মানুষ পরস্পর পরস্পরের সাথে যোগাযোগ করে থাকে। যদিও মূলত এটি একটি টেক্সট বেসড কমিউনিকেশন সিস্টেম কিন্তু প্রযুক্তির আধুনিকায়নের ফলে আজ এর মাধ্যমে এটাচমেন্ট হিসেবে বিভিন্ন ফরমেটের ফাইল, ছবি কিংবা চলমান ভিডিও পাঠানো সম্ভবপর হয়েছে। অন্য কথায় বলতে গেলে এটি এমন একটি দ্রুত ও নিরাপদ যোগাযোগ ব্যবস্থা যার মাধ্যমে একজন ইউজার অন্যজন ইউজারের কাছে নিমিষেই যে কোন ধরনের ইনফরমেশান পাঠাতে পারে।

(খ) **টেলিকনফারেন্সিং (Teleconferencing) :** প্রচলিত অর্থে টেলিকনফারেন্সিং মানে হল, টেলিফোন ব্যবস্থায় ততোধিক বেশি লোকের সংলাপ। অফিসের কাজের জন্য অনেক রকম সভা অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয়। বিভিন্ন স্থান থেকে টেলিযোগাযোগের মাধ্যমে সভা অনুষ্ঠানের প্রক্রিয়াকে টেলিকনফারেন্সিং বলা হয়। টেলিফোন সংযোগ ব্যবহার করে অডিও ও ভিডিও যন্ত্রের সাহায্যে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে এই সভায় অংশগ্রহণ করা হয়। সময় ও যাতায়াত খরচ কমিয়ে উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর জন্য টেলিকনফারেন্সিং একটি সহায়ক উপায়। বিভিন্ন ধরনের টেলিকনফারেন্সিং ব্যবস্থা রয়েছে। যেমন—পাবলিক কনফারেন্স, ক্লোজড কনফারেন্স, রিড অনলি কনফারেন্স ইত্যাদি। পাবলিক কনফারেন্স সকলের জন্য উন্মুক্ত। যে কেউ এই কনফারেন্স অংশগ্রহণ করতে পারে। ক্লোজড কনফারেন্স সবার জন্য উন্মুক্ত নয়, পাসওয়ার্ড প্রটেকটেড। নির্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গই এতে অংশগ্রহণ করতে পারেন। রিড অনলি কনফারেন্সে শুধুমাত্র অংশগ্রহণ করে বিষয়বস্তুটিকে দেখা ও পড়া যায় কিন্তু কোনরূপ প্রতিক্রিয়া জানানো যায় না। বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার ব্যবস্থার মাধ্যমে টেলিকনফারেন্সিং নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। টেলিকনফারেন্সিং ব্যবস্থায় সভায় অংশগ্রহণকারীরা কিবোর্ডের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় কম্পিউটারে তাদের বক্তব্য বা উত্তর পাঠায়।

(গ) **ভিডিও কনফারেন্সিং (Video Conferencing) :** ভিডিও কনফারেন্সিং হল একটি ইন্টারঅ্যাকটিভ টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তি যেগুলো দুই বা ততোধিক অবস্থান হতে নিরবচ্ছিন্ন দ্বিমুখী অডিও এবং ভিডিও সম্প্রচারের মাধ্যমে একত্রে যোগাযোগ স্থাপনের সুযোগ দিয়ে থাকে। এটি এমন একটি কনফারেন্সিং ব্যবস্থা যেখান মনিটর বা পর্দায় অংশগ্রহণকারীর পরস্পরের সম্মুখীন হয়ে একে অপরকে দেখে কথোপকথনে অংশগ্রহণ করে থাকে। এক জায়গা থেকে বা এক দেশ হতে অন্য দেশে যেকোনো ব্যক্তি ইন্টারনেট সংযোগের মাধ্যমে ভিডিও কনফারেন্সিং করতে পারে। এজন্য বিশেষ কিছু সফটওয়্যার ব্যবহার করতে হয়। বড় বড় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সাধারণত বিভিন্ন সফটওয়্যার কোম্পানির তৈরি করা বাণিজ্যিক সফটওয়্যাটসমূহ এই কাজে ব্যবহার করে থাকে। তবে সর্বসাধারণের ক্ষেত্রে বিশ্বের বহু দেশের মতো আমাদের দেশের লোকজনও এখন স্কাইপ বা ইয়াহু মেসেঞ্জার ব্যবহার করে খুব সহজেই ভিডিও কনফারেন্সিং করে থাকেন। ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের জন্য যে যে উপকরণগুলির প্রয়োজন হয় সেইগুলি হল—কম্পিউটার, ওয়েবক্যাম, ভিডিও ক্যাপচার কার্ড, মডেম, মাইক্রোফোন, টেলিফোন সংযোগ, ইন্টারনেট সংযোগ ও প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার।

সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির নেতিবাচক প্রভাবগুলিকে নিম্নে আলোচনা করা হল—

- **নৈতিক অবক্ষয় :** তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে বর্তমানে এমন কিছু বিষয় যুক্ত হয়েছে যা শিশু-কিশোরদের নৈতিক অবক্ষয়ের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

- **নিরাপত্তা ও ব্যক্তিগত গোপনীয়তা হ্রাস :** ইন্টারনেটের প্রসারের সাথে সাথে নতুন নতুন অপরাধ ও অনৈতিক কাজের ব্যপকতা বাড়ছে, যেমন—অন্যের গোপন তথ্য চুরি করা (Hacking), অন্যের কম্পিউটারে অনাকাঙ্খিত প্রোগ্রাম প্রবেশ করিয়ে ক্ষতি করা (Computer Virus), অন্যকে ভয়ভীতি দেখানো, পর্ণগ্রাফি ছড়িয়ে দেওয়া ইত্যাদি। এই ধরণের কাজগুলি অনৈতিক এবং বিভিন্ন দেশে আইন করে এগুলিকে অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এগুলিকে সাধারণভাবে Cyber Crime বলা হয়। সাইবার ক্রাইম থেকে নিরাপদ থাকার জন্য বাজারে বিভিন্ন ধরণের অনলাইন সিকিউরিটি ও অ্যান্টিভাইরাস সফটওয়্যার পাওয়া যায়, কিন্তু এগুলি ব্যয়বহুল হওয়ায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা ক্রয় করা সম্ভব হয়ে উঠে না।

- **বেকার সমস্যা :** তথ্যপ্রযুক্তির সাফল্যে এখন সর্বক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয়তার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তাই বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বেকারত্ব সৃষ্টি হচ্ছে।

- **ডিজিটাল ডিভাইড :** তথ্যপ্রযুক্তির সবচেয়ে বড় কুফল হচ্ছে ডিজিটাল ডিভাইড। বর্তমানে পৃথিবীর উন্নত দেশগুলো তথ্যপ্রযুক্তির সব সুবিধা ভোগ করছে এবং তারা আরও উন্নত হচ্ছে। পক্ষান্তরে, অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশ তথ্যপ্রযুক্তির প্রায় সব সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে কিংবা যা কিছু সুবিধা পাচ্ছে, তা সব পুরোনো। ফলে তারা আরও পিছিয়ে পড়ছে। বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে একই পৃথিবীতে বাস করেও দুটি মানবগোষ্ঠীর মধ্যে যে বিশাল পার্থক্য সৃষ্টি হচ্ছে, তাই ডিজিটাল ডিভাইড।

- **শারীরিক সমস্যা :** তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিভিন্ন যন্ত্রপাতি বিশেষ করে কম্পিউটারকে বিভিন্ন প্রকার স্বাস্থ্য সমস্যার জন্য দায়ী করা যায়, চোখের ওপর চাপ, কবজির ক্ষতি, পিঠের সমস্যা, মানসিক চাপজনিত সমস্যা, পেটের আলসার ইত্যাদি।

সমাজের জন্য তথ্যপ্রযুক্তির সুফল কিংবা কুফল নির্ভর করে তার ব্যবহারের ওপর। তাই বৃহৎ স্বার্থে এর নৈতিক ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার, দ্রুত প্রসার ও উন্নয়ন সাধিত হলে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে তথ্যপ্রযুক্তি সমাজের জন্য আশীর্বাদ।

1.3.9 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে নৈতিকতা (Morality in using Information & Communication Technology)

বর্তমান শতকে মানবজাতির সামগ্রিক জীবনে যে বিষয়টির সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তা হল নৈতিকতার যথাযথ প্রয়োগ। নৈতিকতার যথাযথ প্রয়োগের অভাবেই সামাজিক এবং মানবিক মূল্যবোধের

অবক্ষয়ের পথ প্রসারিত হয়। সামাজিক, সাংস্কৃতিক সকল পর্যায়ে শিষ্টাচারমূলক মার্জিত আচরণ সবার কাম্য। মানবজীবনের প্রতিটি বাঁকে অজস্র বাধা-বিপত্তির মোকাবেলায় নৈতিকশক্তির বিকল্প অন্য কিছু আজও উপলব্ধি করা যায়নি। মানুষের প্রতিটি আচার-ব্যবহার, চাল-চলন তার ভেতরকার মনুষ্য রূপের প্রতিচ্ছবিকে প্রকাশ করে। স্বল্প পরিসরে মনে হলেও নৈতিকতার ব্যাপক প্রভাব মানবজাতির পুরো জীবনসমুদ্রে তরঙ্গাকৃতিতে বহমান। নৈতিকতা একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। এটি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মানুষের ব্যবহারিক জীবনে প্রতিফলিত হয়। নৈতিকতা নামক এই গুণটি এমনিতেই সৃষ্টি হয় না, এটি অর্জন করতে হয় এবং এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা পালন করে শিক্ষাব্যবস্থা। শিক্ষাব্যবস্থার প্রভাবে মানুষের চিন্তা-চেতনা, আদর্শিক মূল্যবোধ এবং সৃজনশীল কর্মতৎপরতা বিকশিত হয়। এক কথায় বললে বলা যায় যে, নৈতিকতা হল মানুষের কাজ-কর্ম, আচার-ব্যবহারের সেই মূলনীতি যার উপর ভিত্তি করে মানুষ একটি কাজের ভাল বা মন্দ দিক বিচার বিশ্লেষণ করতে পারে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার সমাজের সকল ক্ষেত্রে ব্যাপক ভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। এর ফলে কম্পিউটার ও সাইবার অপরাধ, গোপনীয়তা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্রতা ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে নৈতিকতার বিষয়টির উদ্ভব হয়েছে। আমাদের উচিত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহারে নৈতিকতা বজায় রাখা। কিন্তু অনেকক্ষেত্রেই বিভিন্ন ভাবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে নৈতিকতা লঙ্ঘন করা হচ্ছে।

কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অনৈতিক কাজ	• প্রতারনা করা • মিথ্যে অপবাদ দেওয়া • ই-মেইলের মাধ্যমে হয়রানি করা • পার্সোনাল কম্পিউটার সিস্টেমের ক্ষতি সাধন করা
কোন প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অনৈতিক কাজ	• প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে সাইবার সন্ত্রাস করা • কম্পিউটার সিস্টেমে অবাঞ্ছিত প্রবেশ করা • সংরক্ষিত তথ্যকে চুরি করা
সমাজের বিরুদ্ধে অনৈতিক কাজ	• অনলাইন জুয়া খেলা • পর্নোগ্রাফির মাধ্যমে যুব সমাজকে দূষিত করা • অবৈধ তথ্য পাচার করা

নিম্নে কম্পিউটার বা ইন্টারনেটের মাধ্যমে কিছু অনৈতিক কার্যকলাপের বিবরণ দেওয়া হল—

● স্প্যামিং (Spamming) :

স্প্যাম হল অনাকাঙ্খিত মেসেজ, যা সাধারণত ইমেইলের মাধ্যমে ইউজারের কাছে প্রেরণ করা হয়। স্প্যামের মাধ্যমে সাধারণত বিভিন্ন সস্তা পন্যের বা সেবার বিজ্ঞাপন যেমন বিভিন্ন প্রকার লোন, দ্রততম সময়ে বড়লোক হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ, অর্থ উপার্জনের উপায়, লটারি সহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য বিজ্ঞাপন ইত্যাদি প্রেরন করা হয়। অনেক সময় বিভিন্ন নিউজ গ্রুপ বা বুলেটিনবোর্ডে অপ্রাসঙ্গিক পোস্টকেও স্প্যাম বলা হয়। আর এই স্প্যাম পাঠানোর প্রক্রিয়াকে স্প্যামিং বলা হয়।

● হ্যাকিং (Hacking) :

হ্যাকিং একটি প্রক্রিয়া যেখানে কেউ কোনো বৈধ অনুমতি ছাড়া কোন কম্পিউটার বা কম্পিউটার নেটওয়ার্কে প্রবেশ করে। যারা এই হ্যাকিং করে তাদের হ্যাকার বলা হয়। হ্যাকারকে সাধারণভাবে তিন ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। সেইগুলি হল—

(ক) **সাদা হ্যাট হ্যাকার (White Hat Hacker) :** যে সব হ্যাকাররা তাদের হ্যাকিং কৌশকে ভাল উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে থাকে সাধারনত তাদেরকে white hat hacker বলা হয়। White Hat Hacker রা কোন সিস্টেমের, নেটওয়ার্কের ত্রুটি বের করে তা মালিক বা কোম্পানীকে দ্রুত জানিয়ে সতর্ক করে দেয়। White Hat Hacker রা ব্যাঙ্ক, বড় বড় কোম্পানি, প্রতিষ্ঠানের সাইবার নিরাপত্তা দিয়ে থাকে। সিস্টেম এবং নেটওয়ার্কের সব ধরনের সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই হোয়াইট হ্যাট হ্যাকারদের মূল দায়িত্ব।

(খ) **গ্রে হ্যাট হ্যাকার (Gray Hat Hacker) :** Grey hat hacker কে পন্থা অবলম্বনকারী মানুষের সাথে তুলনা করা যায়। এরা ভালোও করতে পারে আবার খারাপও করতে পারে। এরা যখন একটি একটি সিকিউরিটি সিস্টেমের ত্রুটি গুলো বের করে তখন সে তার মন মত কাজ করবে। তার মন ঐ সময় কি চায় সে তাই করবে। সে ইচ্ছে করলে ঐ সিকিউরিটি সিস্টেমের মালিককে ত্রুটিসমূহ জানাতে পারে অথবা নষ্টও করতে পারে। আবার তা নিজের স্বার্থের জন্যও ব্যবহার করতে পারে।

(গ) **ব্ল্যাক হ্যাট হ্যাকার (Black Hat Hacker) :** এরা হল সবচেয়ে ভয়ংকর প্রকৃতির হ্যাকার। এরা কোন একটি সিকিউরিটি সিস্টেমের ত্রুটি গুলো বের করলে দ্রুত ঐ ত্রুটি কে নিজের স্বার্থে কাজে লাগায়। ঐ সিস্টেম নষ্ট করে দেয়। বিভিন্ন ভাইরাস ছড়িয়ে দেয়। ভাবিষ্যতে নিজে আবার যেন ঢুকতে পারে সে পথ রাখে। সর্বোপরি ঐ সিস্টেমের অধিনে যে সকল সাব-সিস্টেম রয়েছে সে গুলোতেও ঢুকতে চেষ্টা করে। এদের কারনেই সবচেয়ে বেশি সাইবার ক্রাইম হয় এবং ইন্টারনেটে ধ্বংসাত্তক ভাইরাস এরাই তৈরী করে থাকে।

● **সাইবার আক্রমণ (Cyber Attack) :**

সাইবার আক্রমণ হল এক ধরনের ইলেক্ট্রনিক আক্রমণ যাতে ক্রিমিনালরা ইন্টারনেটের সাহায্যে কারও সিস্টেমে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করে ফাইল, প্রোগ্রাম বা হার্ডওয়্যারের ক্ষতি করে থাকে।

● **সাইবার চুরি (Cyber Theft) :**

এই ক্ষেত্রে হ্যাকাররা কোনো নেটওয়ার্ক-এ প্রবেশ করে লুকিয়ে থাকে এবং ইউজারের দেওয়া প্রদত্ত ইনফরমেশনের ডেটাবেজের অনুকপি তৈরি করে। পরে সেই ইনফরমেশনগুলো ব্যবহার করে জালিয়াতির মাধ্যমে যে কোন ইউজারের অ্যাকাউন্ট থেকে তার সমস্ত টাকা নিজ অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করে নেয়। সাইবার চুরি দুই ধরনের হয়ে থাকে। সেইগুলি হল

(ক) **ডেটা চুরি (Data Theft) :** কোনো ব্যক্তি বা কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে অনুমতি ব্যতীত ইনফরমেশন কপি বা সংগ্রহ করাকে ডেটা চুরি বলা হয়।

(খ) **ব্যক্তি পরিচয় চুরি (Identity Theft) :** একজনের পরিচয় ব্যবহার করে অন্য কোনো ব্যক্তি কিছু ক্রয় করে তার দায়ভার ঐ ব্যক্তির উপর চাপানোকে ব্যক্তি পরিচয় চুরি বলা হয়।

● **টাইম অ্যান্ড রিসোর্স চুরি (Time & Resource Theft) :** অনুমতি ছাড়া কোনো কম্পিউটার বা নেটওয়ার্ক ব্যবহার করাকে টাইম অ্যান্ড রিসোর্স চুরি বলা হয়।

● **সফওয়্যার পাইরেসি (Software Piracy) :** প্রস্তুতকারীর বিনা অনুমোতিতে কোন সফটওয়্যার কপি করা, নিজের নামে বিতরন করা কিংবা কোন প্রকারে পরিবর্তন করে নিজের নামে চালিয়ে দেওয়া ইত্যাদি কার্যক্রমকে সফটওয়্যার পাইরেসি বলে। ওয়ান পিসি লাইসেন্সে একাধিক পিসি চালানো, বেআইনিভাবে বন্ধুদের সাথে শেয়ার বা ভাগাভাগি করা সফটওয়্যার পাইরেসির অন্তর্গত।

● **প্ল্যাগিয়ারিজম (Plagiarism) :** অন্যের লেখা চুরি করে নিজের নামে চালিয়ে দেওয়া বা প্রকাশ করাকেই প্ল্যাগিয়ারিজম বলে। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তির কোনো সাহিত্য, গবেষণা বা সম্পাদনা কর্ম হুবহু বা আংশিক পরিবর্তন করে নিজের নামে প্রকাশ করাই হল প্ল্যাগিয়ারিজম।

১৯৯২ সালে 'কম্পিউটার ইথিকস ইন্সটিটিউট (Computer Ethics Institute)' কম্পিউটার ইথিকস এর বিষয়ে দশটি নির্দেশনা তৈরি করেছিলেন। সেইগুলি হল—

- অন্যের ক্ষতি করার জন্য কম্পিউটার ব্যবহার না করা।
- অন্য ব্যক্তির কম্পিউটারের কাজের উপর হস্তক্ষেপ না করা।
- অন্য ব্যক্তির ফাইলসমূহ হতে গোপন তথ্য সংগ্রহ না করা।

- চুরির উদ্দেশ্যে কম্পিউটার ব্যবহার না করা।
- মিথ্যা সাক্ষ্য প্রমাণ বহনের জন্য কম্পিউটার কে ব্যবহার না করা।
- যেসব সফওয়্যারের জন্য অর্থ প্রদান করা হয়নি সেগুলো ব্যবহার বা কপি না করা।
- অনুমতি ব্যতিরেকে অন্যের কম্পিউটার রিসোর্স ব্যবহার না করা।
- অন্যের বুদ্ধিবৃত্তি সংক্রান্ত ফলাফলকে নিজের ফলাফল বলে পরিচালিত না করা।
- প্রোগ্রাম লেখার পূর্বে সমাজের উপর তা কী ধরনের প্রভাব ফেলবে সেটি চিন্তা করা।
- কম্পিউটারকে ওই সব উপায়ে ব্যবহার করা যেন তা বিচার-বিবেচনা ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে।

যে কোন প্রতিষ্ঠানের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারকারী ব্যক্তির নৈতিকতার বিষয়ে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি মেনে চলা উচিত।

- ইন্টারনেট অন্যের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন না করা।
- কোন তথ্যের ভুল উপস্থাপন না করা।
- তথ্যের গোপনীয়তা ও বিশ্বস্ততা রক্ষা করা।
- কোন ব্যক্তির পার্সোনাল কম্পিউটারে তার অনুমতি ছাড়া ব্যবহার না করা।
- ভাইরাস ছড়ানো, স্প্যামিং ইত্যাদি কর্মকাণ্ড থেকে নিজেকে প্রতিহত করা।

1.3.10 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন (Economic development through Information and Communication Technology)

প্রযুক্তি মানুষকে পরিবর্তিত বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় তথ্যপ্রবণতা এবং যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ করে -কৌশল-দক্ষতা-জ্ঞান- তোলে কার্ল মার্কসের ভাষায় “প্রযুক্তি হচ্ছে মানুষের প্রতিদিনের সাথী”। মানুষ এই প্রযুক্তির সাথে প্রতিদিন অব্যাহত ভাবে গায়ে গায়ে লেগে আছে।

সোজা সরল ও সংক্ষেপে বলা যায় যে, প্রযুক্তি মানুষকে যোগায় জীবন সহায়ক ব্যবস্থা বা লাইফ সাপোর্ট সিস্টেম, যে কারনে মানুষ পৃথিবীতে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার শক্তি অর্জন করে। তথ্য প্রযুক্তির কল্যাণে মানুষের জীবন হয়েছে এখন অনেক সহজ, সরল এবং স্বাচ্ছন্দ্যময়। ঘরে বসে বিশ্ব ভ্রমণ, মার্কেটিং, ব্যাংকিং বিভিন্ন ধরনের সার্ভিস কিম্বা ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ডে ঘোরাঘুরি করা এখন একেবারে সহজ ব্যাপার। তাইতো এখন মানুষের এমন কোন কাজ নেই যেখানে প্রযুক্তির ছোয়া লাগেনি।

একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি পৃথিবীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য খুলে দিয়েছে অপার সম্ভাবনার দুয়ার। ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় কৃষি বিপ্লব, শিল্প বিপ্লবের পর বর্তমান

পৃথিবী নতুনতর এক বিপ্লবের মুখোমুখি হতে চলেছে যার নাম তথ্য বিপ্লব। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যদি এই শতাব্দীকে নতুন কোন নামে অভিহিত করা হয় তবে তথ্য প্রযুক্তির শতাব্দী হবে তার জন্য উপযুক্ত। আর সমাজের অর্থনৈতিক উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রভাব অপরিসীম।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন হল সরকারি ও বেসরকারি সমন্বিত কার্যক্রমের মাধ্যমে কোন একটি নির্দিষ্ট এলাকার মানুষের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন। অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে মানব সম্পদ উন্নয়ন, ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নয়ন, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, সামাজিক অন্তভুক্তিকরণ, স্বাক্ষরতা অর্জন, স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণ ইত্যাদিকে বোঝানো হয়ে থাকে। আর এই সকল উন্নয়নমূলক কর্মসূচীতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ভূমিকা অপরিসীম।

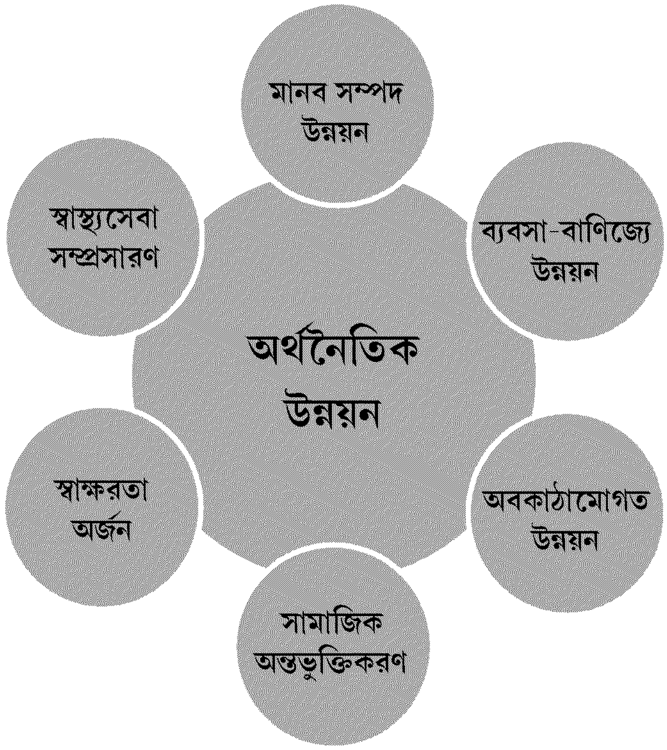

বর্তমান শতাব্দীর গ্লোবালাইজেশনের ফলে একটি দেশের উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে তথ্য এবং যোগাযোগ প্রযুক্তি অন্যতম নিয়ামকের ভূমিকা পালন করছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির হাতিয়ার হচ্ছে কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট। কম্পিউটার এবং ইন্টারনেটের দৌলতে পৃথিবী এখন গ্লোবাল ভিলেজে পরিণত হয়েছে। বলা চলে পৃথিবী হাতের মুঠোয় নয় আঙুলের ডগায় চলে এসেছে। কম্পিউটার প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার এবং সফল প্রয়োগ যে কোন অনুন্নত দেশকে উন্নত করতে অগ্রণী ভূমিকা পালনে সচেষ্ট।

কম্পিউটার এমন এক ধরনের প্রযুক্তি যার মাধ্যমে শিক্ষা, চিকিৎসা, বিনোদন, অর্থনীতি, রাজনীতি, বিনিয়োগ, ব্যবসা- বাণিজ্য, পরিকল্পনা, গবেষণা, নিয়ন্ত্রণ, ডিজাইন ইত্যাদি বিষয়াবলীকে একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংযুক্ত করা সম্ভব। আর এই তথ্য প্রবাহ একটি সম্বন্বিত সূত্রে আবদ্ধ হয়ে পৃথিবীর সকল জাতি, ধর্ম, বর্ণ গোষ্ঠীর মানুষকে সম্বন্বিত তথ্য-প্রবাহের সঙ্গে অবিরাম সংযুক্ত রাখতে সচেষ্ঠ। আমরা দেখেছি বিংশ শতাব্দীতে তথ্যের আদান প্রদান হয়েছে টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, টেলিফ্যাক্স, টেলেক্স, পোষ্টাল, কুরিয়ার সার্ভিস ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে, কিন্তু বর্তমানে বিশ্বব্যাপী যোগাযোগ ব্যবস্থার অভুতপূর্ব অগ্রগতি সাধিত হওয়ায় এখন আর এই সমস্ত মাধ্যম নতুন কিছু নয়। এখন প্রেরক প্রতিটি ক্ষেত্রেই কত দ্রুত সুষ্ঠুভাবে প্রয়োজনীয় বার্তা প্রাপকের কাছে পৌঁছাতে পারবে এই ভাবনায় এখন উদ্ভাবকের বহুবিধ উদ্ভাবনের ভিত্তি হিসাবে কাজ করছে।

কম্পিউটার এবং স্যাটেলাইট প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে তথ্য আদানপ্রদানের ক্ষেত্রে যে পদ্ধতিটি অভূতপূর্ব, যুগান্তকারী, অকল্পনীয় ও অবিশ্বাস্য বিপ্লব সাধিত করেছে তার নাম ইন্টারনেট। আজকে বিশ্বের সমস্ত উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশ ইনফরমেশন সুপার হাইওয়ে বা তথ্যের মহাসড়কে প্রবেশ করে চলেছে। কম্পিউটার ভিত্তিক তথ্য বিনিময়ের অপূর্ব এই ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে বিশ্বের তথ্য অবকাঠামো বা গ্লোবাল ইনফরমেশন ইনফ্রাস্ট্রাকচার বা সংক্ষেপে জিআইআই। পৃথিবীর প্রায় সব ধরনের তথ্য ব্যবস্থা এই জিআইআই এর অন্তর্ভূক্ত হচ্ছে; তথ্যের এই মহা রাজপথে যার অবস্থান যত দৃঢ় ঠিক সেই অনুপাতে তথ্য আর জ্ঞানের ভান্ডার চলে যাবে তার নিয়ন্ত্রণে, যা ছাড়া ভবিষ্যতে টিকে থাকা যেন এক দুসাধ্য ব্যাপার :

1.3.11 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহারিক ক্ষেত্র (Practical Field of Information & Communication Technology)

অতীতে তথ্য প্রযুক্তি, যোগাযোগ প্রযুক্তি, টেলিকমিউনিকেশন, কনজ্যুমার ইলেক্ট্রনিক্স ইত্যাদি সব পৃথক পৃথক বিষয় ছিল। কিন্তু বর্তমানে, এই পৃথক পৃথক বিষয়গুলিকে একসাথে নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে। এর ফলে একাধিক প্রযুক্তিকে একীভূত করা সম্ভবপর হয়েছে। আর এই একীভূতকরণের প্রক্রিয়াটিকে একত্রে ডিজিটাল কনভারজেন্স বলা হয়। অর্থাৎ ডিজিটাল কনভারজেন্স হল বিভিন্ন মাধ্যমের একাধিক প্রযুক্তিকে মিলিত করে একটি মাধ্যমে একীভূত করা ও কার্যকরীভাবে পরিচালনা করা। বর্তমানে, ডিজিটাল কনভারজেন্সের সাহায্যে নিম্নের চারটি ক্ষেত্রকে একীভূত করা সম্ভবপর হয়েছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারিক ক্ষেত্রগুলিকে নিম্নে আলোচনা করা হল —

1. ভার্চুয়াল রিয়েলিটি (Virtual Reality) :

প্রকৃত অর্থে বাস্তব নয় কিন্তু বাস্তবের চেতনার উদ্যোগকারী বিজ্ঞাননির্ভর কল্পনাকে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি বা অনুভবের বাস্তবতা কিংবা কল্পবাস্তবতা বলে। ভার্চুয়াল রিয়েলিটি হল কম্পিউটারনিয়ন্ত্রিত সিস্টেম, যাতে মডেলিং ও অনুকরণবিদ্যা প্রয়োগের মাধ্যমে মানুষ কৃত্রিম ত্রিমাত্রিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পরিবেশের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন বা উপলব্ধি করতে পারে। ভার্চুয়াল রিয়েলিটিতে অনুকরণকৃত পরিবেশ হুবহু বাস্তব জগতের মত হতে পারে। এ ক্ষেত্রে অনেক সময় ভার্চুয়াল রিয়েলিটি থেকে বাস্তব অভিজ্ঞতাও পাওয়া যায়। আবার অনেক সময় অনুকরণকৃত বা সিম্যুলেটেড পরিবেশ বাস্তব থেকে আলাদা হতে পারে। যেমন ভার্চুয়াল র:ক্রিয়েলিটি গেমস। এতে ত্রিমাত্রিক ইমেজ তৈরির মাধ্যমে অতি অসম্ভব কাজও করা সম্ভব হয়। ভার্চুয়াল রিয়েলিটি হল কম্পিউটার এবং বিভিন্ন প্রকার সেন্সরের সমন্বয়ে গঠিত একটি পরিবেশ। ভার্চুয়াল রিয়েলিটিতে ব্যবহারকারী সম্পূর্ণরূপে একটি কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে নিমজ্জিত হয়ে যায়। তথ্য আদান-প্রদানকারী বিভিন্ন ধরনের ডিভাইস সংবলিত হেড মাউন্ডেড ডিসপ্লে, ডেটা গ্লোভ, পূর্ণাঙ্গ বডি স্যুইট ইত্যাদি পরিধান করার মাধ্যমে ভার্চুয়াল রিয়েলিটিতে বাস্তবকে উপলব্ধি করা হয়।

2. আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স (Artificial Intelligence) :

আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স টেকনোলজি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির জগতে বহুল আলোচিত একটি বিষয়। মানুষ নিজস্ব বুদ্ধির আলোকে যেকোন কাজ বা সমস্যার সমাধান করে থাকে, সেসব কাজ কমপিউটারের মাধ্যমে করার বিজ্ঞানকে সাধারণত আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স বলা হয়। অর্থাৎ মানুষ যে ভাবে চিন্তা ভাবনা করে কৃত্রিম উপায়ে কম্পিউটারে সেভাবে চিন্তা ভাবনার রূপদান করাকে আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বলা হয়। কয়েক বছর ধরে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্সে। যেমন, আধুনিক তরুণ প্রজন্মের বেশিরভাগই স্মার্টফোনে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। এগুলো বিশেষ ধরণের সেন্সরের মাধ্যমে মানুষের বলা কথা চিনতে পারে। ইমেজ রিকগনিশন টেকনোলজি ব্যবহার করে এয়ারপোর্টে ইমিগ্রেশন কিউই কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। চালকবিহীন গাড়ি এবং স্বয়ংক্রিয় উড়ে চলা ড্রোনে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। সম্প্রতি পরীক্ষামূলকভাবে বেশ কিছু লার্নিং ও মেমরি টাস্ক সম্পন্ন হয়, যেখানে যন্ত্র মানুষের চেয়ে ভালো কাজ করছে।

স্বাভাবিক হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের তুলনায় আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স একটি যন্ত্রকে বেশি করে সক্ষম করে তোলে পরিবর্তিত পরিবেশ বোঝা ও সে অনুযায়ী সাড়া দেওয়ার ব্যাপারে।

এর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলো নেভার এন্ডিং ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং (এনইএলএল) প্রজেক্ট। এটি কার্নেগি মেলন বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি প্রকল্প। মূলত একটি কমপিউটার সিস্টেম, যা শুধু লাখ লাখ ওয়েব পেজ থেকে কেবল তথ্য পাঠই করে না, বরং ভবিষ্যতে প্রসেসে আরও ভালো পারফরম্যান্সের জন্য পাঠ ও বোঝার সক্ষমতা উন্নত করতে চেষ্টা করে থাকে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (Artificial Intelligence) জনক হলেন ব্রিটিশ গনিতবিদ অ্যালান টিউরিং। আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্সকে প্রয়োগ করার জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজকে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু হল CLISP, PROLOG, Java ইত্যাদি।

3. রোবটিক্স (Robotics) :

রোবটিক্স হল প্রযুক্তির একটি শাখা যেখানে রোবট সমূহের ডিজাইন, নির্মাণ, কার্যক্রম ও প্রয়োগ নিয়ে কাজ করা হয়। রোবট (Robot) শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে "Robota" মতান্তরে "roboti" শব্দ থেকে। শব্দটির প্রবক্তা ছিলেন ক্যারেল ক্যাপেক (Karel Capek), যিনি বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে সাইন্সফিকশন লেখার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। 'Robota' শব্দটির মানে হল দাস (slave) বা কর্মী (worker)। বর্তমানেও 'Robot' শব্দটি মোটামুটি একই অর্থ বহন করে। খুব সাধারন ভাবে বললে যে যন্ত্র করতে সক্ষম তাকে রোবট বলা হয়। আর এখানে টাস্ক (কাজ) স্ট্রাকচার কোন নির্দিষ্ট টাস্ক বলতে মানুষের মত হাটাহাটি বা সামগ্রিক মানুষের আদলে কাজকর্মকে বোঝানো হয়ে থাকে। একটা অটোম্যাটিক ডোর, যা মানুষ বা কিছু সেন্স করে নিজে নিজে ওপেন হতে পারে, তাকেও রোবট বলা হলে খুব ভুল বলা হবে না, তবে এগুলো কে সাধারনত রোবট না বলে "intelligent system" বলা হয়। কোনো স্ট্রাকচারের মোবিলিটি (mobility) মোশন (Motion), সেন্সিং (sensing ability) আর ইন্টেলিজেন্স (inteligence) থাকলে তাকে রোবট বলা যায়। সরাসরি সংজ্ঞা দিতে গেলে এরকম দাঁড়ায়, যে ইলেক্ট্রোমেকানিক্যাল স্ট্রাকচার কোন কাজ করতে সক্ষম, সেই হল রোবট। ইন্টিলিজেন্ট রোবোটে বিভিন্ন সেন্সর থাকে। বুদ্ধীমত্তার জন্য এর মধ্যে থাকে একটি সি পি ইউ (CPU)। আর থাকে অ্যাচুয়েটর (actuator)। ফিল্ড রোবোটে একচুয়েটর হল মোটর। চাহিদা ও কাজের ধরন অনুযায়ী সেন্সর নির্দিষ্ট করা হয়। সে অনুযায়ী প্রোগ্রাম লেখা ও সার্কিট ডিজাইন করা হয়। মটরের টর্ক থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু তৈরির আগে সিমুলেশন করে ঠিক করা হয় এবং ডিজাইন অনুযায়ী বানানো হয়।

আর রোবোটিক্স মূলত রোবোট কন্ট্রোল ও ডিজাইন নিয়ে কাজ করে। এটাকে ইলেক্ট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল, কম্পিউটার, মেকাট্রনিক্স এর সংমিশ্রন বলা যায়। রোবটে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করা হয়। কম্পিউটার রোবটের সব ধরনের কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। সকল রোবটের

কাজের ধারা আগের থেকে ঠিক করে দেওয়া থাকে। রোবট শুধুমাত্র ওই নির্দেশিত কাজের ধারা অনুযায়ী কাজ করে থাকে। জাপানের মুরাতা কোম্পানীর 'মুরাতা বয়, সোনি কার্পোরেশনের 'আইবো হোন্ডা কোম্পানীর 'আসিমো' রোবটগুলি প্রায় মানুষের মতই বিশেষ কাজগুলি করতে পারে।

4. ক্রায়োসার্জারি (Cryosurgery) :

ক্রায়োসার্জারি হল খুব ঠাণ্ডা বা বরফ শীতল তাপমাত্রা প্রয়োগ করে শরীরের অস্বাভাবিক কোষ বা টিস্যু ধ্বংস করার পদ্ধতি, যেখানে তরল নাইট্রোজেন বা আর্গন গ্যাস ব্যবহার করা হয়। চিকিৎসা ক্ষেত্রে এটি ক্যান্সার অথবা ক্যান্সারের পূর্ব অবস্থার চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয়। গ্রিক শব্দ cryo (ক্রায়ো) এর অর্থ বরফের মত শীতল এবং surgery (সার্জারি) এর অর্থ হাতের কাজ। প্রায় আড়াই হাজার বছর আগের থেকেই ত্বকের বিভিন্ন ক্ষতের চিকিৎসায় এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হচ্ছে। ত্বকের ক্ষেত্রে খুবই কার্যকর হওয়ায় বর্তমানেও ত্বকের বিভিন্ন অসুস্থতা যেমন, তিল, আঁচিল, এ্যাকনি, মেছতা, বিভিন্ন ধরনের টিউমার ও ক্যানসার চিকিৎসায় এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এ ছাড়া পাইলস, মুখের ক্যানসার, প্রোস্টেট, যকৃত এবং কোনো কোনো হাড়ের ক্যানসার, রেটিনোব্লাসটোমা, জরায়ুর মুখের ক্যানসারসহ বিভিন্ন অঙ্গের চিকিৎসায় এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে। তবে সাধারণত আঞ্চলিকভাবে সীমাবদ্ধ এবং এক সেন্টিমিটারের চাইতে বড় শক্ত টিউমারের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি বেশি কার্যকর হতে দেখা যায়। বয়স্ক অথবা যেসব রোগীর পক্ষে অপারেশন বা রেডিওথেরাপির ধকল সহ্য করা সম্ভব নয়, তাদের ক্ষেত্রে এবং কোনো কোনো অঙ্গের ক্যানসারের পূর্বাবস্থায় বিদ্যমান কোষকলা ধ্বংসের উদ্দেশ্যে এই থেরাপি প্রয় (মুখের ক্যানসার যেমন জরায়ুর) রোগ করা হলেও বিস্তৃত ক্যানসারের চিকিৎসায় এই পদ্ধতি তেমন কার্যকর হয় না। বরফশীতল তাপমাত্রার কোষকলা ধ্বংস করার ক্ষমতাকে ক্রায়োসার্জারি পদ্ধতিতে কাজে লাগানো হয়। এ ক্ষেত্রে অত্যন্ত শীতল তাপমাত্রায় কোষকলার অভ্যন্তরে বলের আকৃতিবিশিষ্ট ছোট ছোট বরফের কৃস্টাল তৈরি হয়ে এগুলোকে ধ্বংস করে ফেলে। তবে অসুস্থ অঙ্গের কোষকলায় রক্ত সরবরাহকারী ধমনিগুলোকে হিমায়িত করে তুলতে পারলে চিকিৎসা অধিক কার্যকর হয়ে ওঠে।

5. মহাকাশ অভিযান (Space Exploration) :

একুশ শতকে মহাকাশ অভিযান তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সাহায্য ছাড়া অসম্ভব। চাঁদে অবতরণ, মহাকাশে স্টেশন স্থাপন, অন্যান্য গ্রহে অভিযান এবং পৃথিবীর উপর লেখাপড়া করার জন্য ডেটা প্রক্রিয়াকরণ, ডেটা স্থানান্তর, সংরক্ষণ এবং বণ্টন ইত্যাদিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়। মহাকাশ অভিযানে সবচেয়ে বড় বিষয় হল অভিযানে

অংশগ্রহণকারি সকল যন্ত্র বা যন্ত্রাংশ সঠিক সময়ে সঠিকভাবে কাজ করা। কোনো কারণে কোনো একটি অংশ বিকল হলে বা কাজ না করলে সম্পূর্ণ অভিযানটি বাতিল হয়ে যায়। এতে প্রচুর সময় এবং অর্থের অপচয় হয়। বর্তমানে মহাকাশ কেন্দ্রে পাঁচটি সাধারণ কম্পিউটার ব্যবহার করা হয়। প্রত্যেকটি কম্পিউটার বিভিনড়ব অংশের সাথে যোগাযোগ রক্ষার মাধ্যমে সহজ এবং জটিল কাজগুলো সম্পন্ন করে। জটিল কাজ করার জন্য চারটি কম্পিউটার প্রয়োজন হয় এবং পঞ্চমটি কম্পিউটার হার্ডওয়্যার সমস্যা সমাধানের জন্য রাখা হয় অতিরিক্ত হিসেবে। বর্তমানে, নাসা (NASA) সেন্সর ওয়েব সিস্টেমের কথা চিন্তা করছে। এর ফলে বিশাল আকারের স্যাটেলাইটের পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের স্যাটেলাইট তৈরি করা সম্ভব। এরা প্রয়োজনে অবস্থান পরিবর্তন করতে পারবে এবং পরিবর্তিত নির্দিষ্ট এরিয়া কভার করতে পারবে। স্যাটেলাইটের কম্পিউটারগুলোকে সুপার কম্পিউটার দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হবে। ছোট ছোট স্যাটেলাইটগুলোকে পৃথিবী থেকে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। স্যাটেলাইটের কোনো একটি অংশ বিকল হলে বা কার্যক্ষমতা কমে গেলে সম্পূর্ণ স্যাটেলাইট ধ্বংস না করে ঐ নির্দিষ্ট অংশ পরিবর্তন করা বা আপডেট করা সম্ভব হবে। এই পদ্ধতিতে মহাকাশ অভিযান ব্যয় অনেক কমবে।

6. প্রতিরক্ষা শিল্প (Defence Industry) :

প্রতিরক্ষা শিল্প হল যে কোনো রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইউনিট। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিরক্ষা শিল্পকে দিয়েছে আধুনিকতার ছোঁয়া। দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সাথে প্রতিরক্ষা শিল্প নিবিড়ভাবে জড়িত। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অগ্রগতির সাথে প্রতিরক্ষা শিল্পেরও অগ্রগতি হয়ে চলেছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে যুদ্ধক্ষেত্রের পরিস্থিতি সরাসরি সম্প্রচারের মাধ্যমে যুদ্ধকালীন পর্যবেক্ষণ সম্ভব হয়েছে।

প্রতিরক্ষা শিল্পে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান হল নেটওয়ার্ক কেন্দ্রীক যুদ্ধক্ষেত্র ব্যবস্থাপনা। এর মাধ্যমে একজন মিলিটারি খুব সহজেই যুদ্ধক্ষেত্রে তার সেনাবাহিনীর অবস্থান পর্যবেক্ষণ করতে পারেন। এর মাধ্যমে সেনাবাহিনীর ভিতরের যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও উন্নত হয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির কল্যাণে প্রতিরক্ষা শিল্প বিমান বাহিনীর ব্যবহারের জন্য অনেক উন্নত মানের সরঞ্জাম প্রস্তুত করতে সমর্থ হয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যুগে প্রতিরক্ষা শিল্পে স্যাটেলাইট টেকনোলজির গুরুত্বও অপরিসীম। উন্নত দেশগুলো বিভিন্ন কারণে পৃথিবীর কক্ষপথে শতশত গুরুত্বপূর্ণ স্যাটেলাইট স্থাপন করে রেখেছে। এই স্যাটেলাইটগুলির মধ্যে অনেকগুলিই হল মিলিটারি স্যাটেলাইট। যা ওই দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে আরো শক্তিশালী করতে প্রতিনিয়ত সাহায্য করে চলেছে।

7. বায়োমেট্রিক্স (Biometrics) :

বায়োমেট্রিক্স হল জৈব বৈশিষ্ট্য/তথ্য বিশ্লেষণ এবং পরিমাপ করার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যা। বায়োমেট্রিক্স বলতে এমন একটি কৌশলকে বোঝায় যা মানব দেহের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য যেমন—ডিএনএ, আঙ্গুলের ছাপ, চোখের রেটিনা, ভয়েস প্যাটার্ন, মুখ মন্ডলের প্যাটার্ন, হাতের মাপ ইত্যাদিকে প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে বিশ্লেষণ ও পরিমাপ করে। গ্রিক শব্দ "bio" (life বা জীবন) ও metric (to measure বা পরিমাপ করা) থেকে উৎপত্তি হয়েছে বায়োমেট্রিক্সের। কম্পিউটার পদ্ধতিতে নিখুঁত নিরাপত্তার জন্য বায়োমেট্রিক্স পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। এই পদ্ধতিতে মানুষের বায়োলজিক্যাল তথ্য কম্পিউটারের ড্যাটাবেজে সংরক্ষিত করে রাখা হয় এবং পরবর্তীতে এসব তথ্য নিয়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মিলিয়ে দেখা হয়। তথ্যে মিল পেলে বৈধ বলে বিবেচিত হয় এবং অনুমতিপ্রাপ্ত হয়। অনেকেই হয়ত লক্ষ্য করেছেন, বড় বড় প্রতিষ্ঠানের গেটে ফিংগার প্রিন্ট সেন্সর লাগানো থাকে। এই পদ্ধতির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটিতে কারা ঢুকতে পারবে আগে থেকেই তাদের ফিংগার প্রিন্ট নিয়ে কম্পিউটারে বিশেষ নিরাপত্তা সফটওয়ারের ডেটাবেসে সংরক্ষিত করে রেখে দেওয়া হয়। গেটে আগত প্রবেশকারীরা আঙুল দিয়ে ফিংগারপ্রিন্ট সেন্সরের বিশেষ স্থানে চাপ দিলে ফিংগারপ্রিন্ট তৈরি হয়ে তা কম্পিউটারে যাবে এবং কম্পিউটারে রক্ষিত ফিংগারপ্রিন্টের সাথে মিলিয়ে দেখবে। যদি মিলে যায় তাহলে গেট খুলে যাবে আর মিল না পেলে গেট খুলবে না। এই ফিংগারপ্রিন্ট হলো এখানে একটি বায়োলজিক্যাল তথ্য। ফিংগারপ্রিন্ট বা আঙুলের ছাপ হল ইউনিক আইডেনটিটি। একজনের আঙুলের ছাপের সাথে অন্যজনের ছাপ কখনও মেলে না। আর এই আঙুলের ছাপকে ব্যবহার করে কম্পিউটার সফটওয়্যার নির্ভর যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয় তা-ই হল বায়োমেট্রিক্স পদ্ধতি

8. বায়োইনফরমেটিক্স (Bio-Informatics) :

জৈব তথ্যবিজ্ঞান বা বায়োইনফরমেটিক্স (Bioinformatics) এমন একটি কৌশল যেখানে ফলিত গণিত, তথ্যবিজ্ঞান, পরিসংখ্যান, কম্পিউটার বিজ্ঞান, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রসায়ন এবং জৈব রসায়ন ব্যবহার করে জীববিজ্ঞানের সমস্যাসমূহ সমাধান করা হয়। জীব সংক্রান্ত তথ্য ব্যবস্থাপনার কাজে কম্পিউটার প্রযুক্তির প্রয়োগই হল বায়োইনফরমেটিক্স (Bio-informatics is the application of computer technology to the management of biological information)। মূলত জীববিজ্ঞানের আণবিক পর্যায়ে গবেষণাই এখানে অন্তর্ভুক্ত হয়।

জীববিজ্ঞানের অনেক ক্ষেত্রেই বায়োইনফরমেটিক্স এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। জীববিজ্ঞানের আনবিক পরীক্ষায় বায়োইনফরমেটিক্স পদ্ধতি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। জৈব তথ্যকে সাজিয়ে

গুছিয়ে সংরক্ষণ করার জন্য শক্তশালী ডেটাবেজ এবং ইনফরমেশন সিস্টেম ব্যবহৃত হয়। বায়োইনফরমেটিক্স ব্যবহারের মূল কারণ হচ্ছে এটা আমাদের কাজ অনেকাংশে কমিয়ে দিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, আমরা কোন ভাইরাসের বিরুদ্ধে পেপটাইড ভ্যাক্সিন তৈরি করতে চাই। এখন, এই ভাইরাসের জন্য হয়ত একশটি পেপটাইড সম্ভব। পেপটাইড হল এমিনো অ্যাসিডের সরলরৈখিক সিকোয়েন্স। কিন্তু এদের মধ্যে হয়তো দুইটি থেকে পাঁচটি পেপটাইড ভ্যাক্সিন হিসেবে কাজ করবে, বাকিরা করে না। এখন এই একশটি এক্সপেরিমেন্ট করতে গেলে বিশাল খরচ, পরিশ্রম এবং সময় লাগবে। বায়োইনফরমেটিক্স এখানে আমাদের সহায়তা করে। বায়োইনফরমেটিক্স এর সাহায্যে এর ত্রিমাত্রিক মডেলিং, সিমুলেশন বিশ্লেষণ করে হয়তো দশটা সাম্ভাব্য পেপটাইড বের করে আনা সম্ভব যারা কাজ করতে পারে। বায়োইনফরমেটিক্স পদ্ধতিতে সফটওয়্যার টুলস হিসেবে Java, XML, Perl, C, C++, Python, R, SQL, CUDA, MATHLAB, Spread Sheet Analysis ইত্যাদি অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

9. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং (Genetic Engineering) :

যে বিশেষ ইঞ্জিনিয়ারিং এবং টেকনোলজি ব্যবহার করে জীবের বৈশিষ্ট্যকে পরিবর্তন করা হয় তাকে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বা জেনেটিক মডিফিকেশন বলে। বিজ্ঞান চর্চার প্রাথমিক যুগের সূচনা ঘটেছিল গণিত চর্চার মধ্য দিয়ে। মধ্যযুগে তা পদার্থবিদ্যার বিকাশে যুগান্তকারী ভূমিকা রাখে। ধীরে ধীরে নিউটন, গ্যালিলিও, আইনস্টাইন, বোরের তত্ত্ব একে আধুনিক যুগে নিয়ে আসে। কিন্তু, 1920 এর আবিষ্কারের ধারা কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়ে। তখন, বিজ্ঞানীরা ঝুকতে থাকে পরিবেশ, পৃথিবী, মানুষ, জীবজগৎ নিয়ে গবেষণার দিকে। বর্তমানে একবিংশ শতাব্দীকে নিঃসন্দেহে 'The Century of Biological Science' বলা হয়ে থাকে কারণ 1972 সালে পল বার্গ রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনোলজি বা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর আবিষ্কার করেন।

10. ন্যানো টেকনোলজি (Nano Technology) :

পদার্থকে আণবিক পর্যায়ে পরিবর্তন ও নিয়ন্ত্রণ করার একটি প্রক্রিয়া হল ন্যানো টেকনোলজি। ন্যানো টেকনোলজি হল পারমাণবিক বা আণবিকমাত্রার অতি ক্ষুদ্র ডিভাইস তৈরি করার জন্য ধাতব ও অন্যান্য বস্তুকে সনিপুণভাবে কাজে লাগানোর বিজ্ঞান (Nano Technlogy is the science of manipulating materials on an atomic or molecular scale especially to build microscopic devices)।

ন্যানো একটি পরিমাপের একক। সাধারণত কোন বস্তুর সবচেয়ে সূক্ষ্ম কণাটির 100 ন্যানো

মিটারের চেয়ে ছোট কাঠামো নিয়ে এটি কাজ করে। ন্যানো মিটার হল মেট্রিক পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্যের একটি একক, যা এক মিটারের 100 কোটির এক ভাগের সমান। অথবা এক মিলিমিটারের এক মিলিয়ন ভাগের এক ভাগ। এটি ন্যানোপ্রযুক্তি-কে আলো ও তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের একক হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

ন্যানো টেকনোলজি দুটি পদ্ধতিতে ব্যবহৃত হয়। একটি হল 'টপ-ডাউন (Top to Bottom) ও অপরটি হল 'বটম-আপ (Bottom to top)। টপ-ডাউন পদ্ধতিতে কোন জিনিসকে কেটে ছোট করে তাকে নির্দিষ্ট আকার দেওয়া হয়। আর বটম-আপ পদ্ধতিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারের ছোট জিনিস দিয়ে বড় কোন জিনিস তৈরি করা হয়। আমাদের বর্তমান ইলেক্ট্রনিক্স হল, টপ-ডাউন প্রযুক্তি। আর ন্যানো টেকনোলজির হল, বটম-আপ প্রযুক্তি।

1.4 ওয়েব (Web)

ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব (World Wide Web) কে সংক্ষেপে WWW নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। সমস্ত উন্মুক্ত ওয়েবসাইটগুলোকে সমষ্টিগতভাবে "World Wide Web" বা WWW বা বিশ্বব্যাপী জাল নাম দেওয়া হয়েছে। www হল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সার্ভারে রাখা পরস্পর সংযোগযোগ্য ওয়েব পেজ। এর মাধ্যমে হাইপারটেক্সট ভিত্তিক ডকুমেন্ট তৈরি ও সম্পাদনা করা যায়। ইন্টারনেটের মাধ্যমে পরস্পরের সাথে যুক্ত হাইপার টেক্সট ডকুমেন্টগুলো নিয়ে কাজ করার পক্রিয়ায় ওয়াল্ড ওয়াইড ওয়েব নামে পরিচিত।

1980 সালে টিম বার্নার্স-লি (Tim Berners-Lee) নামের একটি ব্রিটিশ যুবক সুইজারল্যান্ডে অবস্থিত ইউরোপিয়ান নিউক্লিয়ার রিসোর্স সেন্টারে (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) ছয় মাসের জন সফওয়্যার কনসালটেন্ট হিসাবে যোগ দেন। সেখানে থাককালীন তিনি তার ব্যক্তিগত কাজের সুবিধার জন্য 'এনকোয়ারি (Enquiry)' নামে একটি প্রোগ্রাম লেখেন। এই প্রোগ্রামটির সাহায্যে তিনি তার কাজের সাথে সম্পর্কিত প্রচুর তথ্য সংরক্ষণ করে সেগুলোর একটিকে অপরটির সাথে এমনভাবে সংযুক্ত করে রেখেছিলেন যেন প্রয়োজনে অসংখ্য তথ্যের মাঝে সেইগুলোকে তিনি সহজেই খুঁজে পান। সেই সময় তিনি তার এই প্রোগ্রামটিকে তার ব্যক্তিগত কাজের জন্যই ব্যবহার করেছিলেন। ঠিক তার নয় বছর পরে, 1989 সালের মার্চ মাসে তিনি আবার এই প্রতিষ্ঠানে ফিরে আসেন। সেই বছরই তিনি একটি প্রোগ্রাম লেখার চেষ্টা করেন যার সাহায্যে CERN-এর পদার্থ বিজ্ঞানীর তাদের গবেষনার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস মুহূর্তের মধ্যে যেন সাথে সাথেই সংগ্রহ করতে পারেন। সেই সময় তার আগে তৈরি করা 'Enquiry' প্রোগ্রামটির কথা মনে পড়ে। আর এই প্রোগ্রামটির উপর ভিত্তি করেই তিনি 1989 সালে প্রথম গ্লোবাল হাইপারটেক্সট ভিত্তিক এমন একটি প্রোগ্রাম লিখেন যার মধ্যে

দিয়েই মূলত ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের যাত্রা শুরু হয়। টিম নিজেই প্রথম ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের জন্য প্রোগ্রাম লেখেন ও একটি ব্রাউজার তৈরি করেন। 1990 সালের অক্টোবর মাসে এটি প্রাথমিক ভাবে পরীক্ষা করা হয় ও ডিসেম্বর মাস থেকে CERN তাদের কাজের জন্য ব্যবহার শুরু করেন। 1991 সাল থেকে এটি ইন্টারনেটে ব্যবহৃত হতে থাকে। টিম বার্নার্স-লি-র এই অসামান্য অবদানের জন্য তাকে 'Father of World Wide Web' বলে আখ্যায়িত করা হয়।

ইন্টারনেটের মাধ্যমে পরস্পরের সাথে যুক্ত হাইপারটেক্সট ডকুমেন্টগুলো নিয়ে কাজ করার প্রক্রিয়া ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব (WWW বা W3) নামে পরিচিত। হাইপারলিংকের সাহায্যে ওয়েব ব্রাউজারের মাধ্যমে একজন ব্যবহারকারী টেক্সট, চিত্র, ভিডিও ও অন্যান্য মাল্টিমিডিয়া সমৃদ্ধ ওয়েব পেজ দেখতে পারে। সাধারনত ব্রাউজারে ইউআরএল টাইপ করে বা কোন পাতা থেকে হাইপারলিঙ্ক অনুসরণ করে ওয়েব পেজে ঢোকার প্রক্রিয়া শুরু হয়। এরপর ওয়েব ব্রাউজার কিছু বার্তা প্রদান করা শুরু করে যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে। এরপরই ওয়েব পেজটি প্রদর্শিত হয়। প্রথমেই ইউআরএল এর সার্ভার আইপি অ্যাড্রেস ধারণ করে। এ জন্য এটি ডোমেইন নেম সিস্টেম নামে পরিচিত বিশ্বজনীন ইন্টারনেট ডাটাবেস ব্যবহার করে। এরপর ব্রাউজার নির্দিষ্ট ঠিকানাটিকে একটি এইচটিটিপির আবেদন জানায় ওয়েব সার্ভারের কাছে। সাধারণত ওয়েব পেজেটির এইচটিএমএল লেখার জন্য শুরুতে আবেদন জানানো হয়। এরপর ওয়েব ব্রাউজারটি ছবিসহ অন্যন্য প্রয়োজনীয় ফাইলের জন্য আবেদন পৌঁছে দেয়। ওয়েব সার্ভার থেকে আবেদনকৃত ফাইলসমূহ পাওয়ার পর ওয়েব ব্রাউজারটি এইচটিএমএল, সিএসএস ও অন্যান্য ওয়েব ল্যাঙ্গুয়েজ অনুযায়ী পাতাটিকে স্ক্রিনে সাজিয়ে ফেলে। অধিকাংশ ওয়েব পাতাগুলোতে নিজস্ব হাইপারলিঙ্ক থাকে যা ওয়েব নামে পরিচিত। টিম বার্নার্স-লি সর্বপ্রথম একে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব নামে নামকরণ করেন।

1.4.1 ওয়েব 1.0 (Web 1.0) :

ওয়েব 1.0 হল একটি ব্যবস্থা যার দ্বারা পরস্পর সংজুক্ত হাইপারটেক্সট নথি ইন্টারনেটের মাধ্যমে ব্যবহার করা যায়। এই প্রযুক্তিতে অল্প সংখ্যক ব্যাক্তি বিপুল পরিমাণ পাঠকগোষ্ঠীর জন্য ওয়েব পৃষ্ঠা তৈরি করতেন তাই ব্যবহারকারী সরাসরি উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করতেন। বার্না-লি-র মতে, এই প্রযুক্তিকে রিড ওনলি ওয়েব (Read Only Web) নামে ডাকা হত। অন্যভাবে বলা যেতে পারে যে, ওয়েব 1.0 শুধুমাত্র তথ্য অনুসন্ধান ও পড়ার অনুমতি প্রদান করত। ব্যবহারকারীদের মধ্যে যোগাযোগ বা লেখা পাঠানোর সুযোগ খুবই কম ছিল। এই প্রযুক্তিতে, ওয়েবসাইটের মালিকরা চাইতেন, তাদের ওয়েবসাইট অনলাইনে উপলব্ধ হোক এবং প্রত্যেকের কাছে তথ্য উপলব্ধ হোক।

1.4.2 ওয়েব 2.0 (Web 2.0) :

ওয়েব 2.0 বলতে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের একটি নতুন ধারাকে বোঝায়। এই নতুন ধারাটি বেশ

কয়েক বছর থেকে প্রসার লাভ করেছে। এই ধারার মূল লক্ষ্য ওয়েবের সৃজনশীলতা, পারস্পরিক যোগাযোগ, নিরাপদ তথ্য আদান-প্রদান, সহযোগিতা এবং কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি। এই নতুন ধারা ওয়েবে বেশ কিছু নতুন সাংস্কৃতিক ও কারিগরি সম্প্রদায়ের জন্ম দিয়েছে। এর মধ্যে বিভিন্ন হোস্টিং সেবাও রয়েছে। এই নতুন সম্প্রদায় ও সেবাগুলির মধ্যে আছে সামাজিক নেটওয়ার্কিংভিত্তিক ওয়েবসাইট, ভিডিও অংশীদারী ওয়েবসাইট, উইকি, ব্লগ এবং ফোকসোনমি

Web 2.0 is the business revolution in the computer industry caused by the move to the Internet as a platform and an attempt to understand the rules for success on that new platform.

ওয়েব 2.0 শব্দটি প্রথম 2003 সালে বিজনেস আইটি ম্যাগাজিন সিআইও আয়োজিত এক বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠানে এরিক নর ব্যবহার করলেও, ওয়েব 2.0-এর ধারণাটি প্রথম আলোচনায় আসে 2004 সালে ও'রেল্লি মিডিয়ার একটি ওয়েব কনফারেন্সের পর।

গুগলের ভাইস প্রেসিডেন্ট অ্যাডাম বসওয়ার্থ (Adam Bosworth) ওয়েব 2.0 কে ব্যাখ্যা করেন একটি সমৃদ্ধ ইন্টেলিজেন্ট ক্লায়েন্ট হিসেবে যা ওয়েবে তথ্য শেয়ার করে এবং অধিক সমৃদ্ধ মিডিয়া নিয়ে কাজ করে। যেমন : ফটো, সাউন্ড, ভিডিও ইত্যাদি। তিনি স্বীকার করেন, এগুলো নতুন কিছু নয়। তিনি ইনফরমেশন ওভারলোডিংকে নতুন ওয়েবের প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য বলে উল্লেখ করেন। তার মতে রেট, রিভিউ এবং আলোচনার জন্য ব্যবহৃত টুলগুলো হচ্ছে ওয়েব 2.0-এর প্রকৃত আবিষ্কার।

আবার ওয়েব 2.0-কে ব্যাখ্যা করতে গ্লোবালাইজেশন, ইন্টারন্যাশনালাইজেশন আর গ্লোবাল ভিলেজের মতো বিভিন্ন ধারণা ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ ওয়েব 2.0 হল কতগুলো প্রচেষ্টার সমষ্টি। আর এই প্রচেষ্টার মধ্যে রয়েছে এপিআই, আরএসএস, সোস্যাল নেটওয়ার্ক ইত্যাদি। ওয়েব 2.0 বলতে একটি সম্পূর্ণ অংশগ্রহণভিত্তিক ওয়েবকে বোঝায়। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন, ওয়েব 2.0 ক্রমপরিবর্তনশীল ওয়েব ছাড়া অন্য কিছু নয়। এটি সেই ওয়েব যা কিনা এতদিন ব্যবহার হয়ে আসছে। কিন্তু সমস্যা, পরিচিতি এবং প্রযুক্তির ব্যবহার অনেক ক্ষেত্রে ভিন্ন। তাই ওয়েব 2.0 শব্দটির ব্যবহার ওয়েবের এই ক্রমপরিবর্তনের পরিচায়ক।

বৈশিষ্ট্য (Features) :

ওয়েব 2.0 প্রযুক্তির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল তথ্য গ্রহণের বাইরেও সাইটগুলো ব্যবহারকারীকে আরো বেশি কিছু করার সুযোগ দেয়। ওয়েব 1.0-এর পরস্পর প্রতিক্রিয়াশীল সুবিধাগুলোকে ব্যবহার করে তৈরি ওয়েব 2.0 সাইটগুলো নেটওয়ার্ককে একটি প্লাটফর্ম হিসেবে ব্যবহার করে, ফলে ব্যবহারকারী তার সফটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশন চালাতে পারে শুধুমাত্র ব্রাউজার ব্যবহার করে। এ কারণে ওয়েব 2.0-কে প্রায়ই 'প্লাটফর্ম ওয়েব" হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়। ওয়েব 2.0 কে দেখা হয় উভয়মুখী মাধ্যম হিসেবে

যেখানে ব্যবহারকারী পাঠক ও লেখক উভয়ই। ওয়েব 2.0 সাইটের ডাটাগুলো ব্যবহারকারী পেতে পারে এবং ব্যবহার করতে পারে তার ইচ্ছেমতো। ওয়েব 2.0 সাইটগুলোর আর্কিটেকচার এমন হয় যা ইউজারকে উৎসাহিত করে অ্যাপ্লিকেশনে নতুন মাত্রা যোগ করতে। অধিকাংশ ওয়েব 2.0 প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্যগুলো হয় সমৃদ্ধ এবং এর ইউজার ফ্রেন্ডলি ইন্টারফেসে ব্যবহার হয় অ্যাজাক্স, ফ্লেক্স, জেকে ফ্রেমওয়ার্কের মতো সমৃদ্ধ মিডিয়ায়। সংক্ষেপে ওয়েব 2.0-এর বৈশিষ্ট্য হল ব্যবহারকারীর চাহিদা পূরণ, তার অংশগ্রহণ, ডায়নামিক কনটেন্ট, মেটাডাটা, ওয়েব স্ট্যান্ডার্ড ইত্যাদি।

ওয়েব 2.0 প্রযুক্তির সাধারণত নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো সংযোজন করে থাকে

- **সার্চ (Search) :** কী ওয়ার্ডের মাধ্যমে সাইট থেকে কোনো তথ্য সহজে খুঁজে বের করে।
- **লিঙ্ক (Link) :** গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সম্বলিত অংশে নিয়ে যায়।
- **অথরিং (Authoring) :** সর্বক্ষণিক পরিবর্তিত কনটেন্ট তৈরি করে। যেমন—উইকিতে একজন আরেকজনের কাজকে পরিবর্তন কিংবা পরিবর্ধন করতে পারে। আবার ব্লগে পোস্ট এবং কমেন্ট জমা হতে থাকে।
- **ট্যাগ (Tag) :** ট্যাগ কনটেন্টকে ক্যাটাগরিতে ভাগ করে। ট্যাগ হল একটিমাত্র শব্দ দিয়ে কনটেন্টকে বর্ণনা করা যা সার্চিংয়ে সাহায্য করে।
- **এক্সটেনশন (Extension)** : অ্যালগরিদমের মাধ্যমে কিছু কিছু কাজকে স্বয়ংক্রিয় করে এবং প্যাটার্ন ম্যাচ করে।
- **সিগন্যাল (Signal) :** আরএসএস (রিএলি সিমপ্লি সিন্ডিকেশন) প্রযুক্তি ব্যবহার করে কোনো কনটেন্টের যেকোনো পরিবর্তন ই-মেইলের মাধ্যমে জানানো যায়।

1.5 ফ্রি এবং ওপেন সোর্স সফটওয়্যার (Free and Open Source Software)

1.5.1 মুক্ত বা ফ্রি সফটওয়্যার (Free Software) :

মুক্ত সফটওয়্যার বা ফ্রি সফটওয়্যার হল এমন এক ধরনের সফটওয়্যার যা ব্যবহারকারীকে এটা ব্যবহার, অধ্যয়ণ এবং সম্পাদনা করার পূর্ণ স্বাধীনতাপ্রদান করে। এমনকি এই সফটওয়্যারগুলো কপি বা বিতরণ করার জন্যও একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে, এবং বিতরণের কপিটি হতে পারে সফটওয়্যারটির মূল সংস্করণ বা পরিবর্তীত কোন সংস্করণ। কোনো কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে এই সফটওয়্যারগুলো বিতরণের প্রেক্ষিতে কিছু বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয় যেন গ্রহীতারা সফটওয়্যার ব্যবহার বা পরিবর্তন করার

ক্ষেত্রে একই ধরনের সুবিধা পায়। মুক্ত সফটওয়্যার সমূহ সাধারণত বিনামূল্যে পাওয়া যায়, তবে ক্ষেত্র বিশেষে মূল্য পরিশোধ করতে হতে পারে। যেমন সফটওয়্যারটি সিডিতে বিতরণ করা হলে সফটওয়্যার সম্বিলিত সিডি মূল্যের বিনিময়ে গ্রহণ করতে হতে পারে। কোনো সফটওয়্যার যদি মুক্ত সফটওয়্যার হিসাবে বিতরণ করা হয়, তবে একই সাথে এর গ্রহীতার উৎস কোড পাওয়ার ব্যাপারটি নিশ্চিত করতে হবে। এই উৎসকোড এমন ভাবে লেখা থাকতে হবে যেন এটি মানুষের পড়ার উপযোগী হয়।

রিচার্ড স্টলম্যান 1983 সালে প্রথম মুক্ত সফটওয়্যার আন্দোলন শুরু করেন। কম্পিউটার ব্যবহারকারীদের 'সফটওয়্যার স্বাধীনতা' দিতেই মূলত তিনি এই কাজে উদ্যোগী হন। 1985 সালে স্টলম্যান ফ্রি সফটওয়্যার ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠান করেন, এর মাধ্যমে তিনি মুক্ত সফটওয়্যারের ধারণাটিকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেন।

1.5.2 উন্মুক্ত উৎস বা ওপেন সোর্স সফটওয়্যার (Open Source Software) :

ওপেন সোর্স সফটওয়্যার বোঝার আগে 'সোর্স কোড" কী তা বোঝা জরুরি। সোর্স কোড মূলত কোনো প্রোগ্রাম বা সফটওয়্যার তৈরির জন্য প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করে লেখা কোড। ওপেন সোর্স সফটওয়্যারের সোর্স কোড সম্পূর্ণ উন্মুক্ত থাকে। যদি কোনো সফটওয়্যারের ওপেন সোর্স লাইসেন্স থাকে তাহলে সেই সফটওয়্যারটিকে যেকোনো ব্যবহারকারী বিনামূল্যে ডাউনলোডের পাশাপাশি ইচ্ছেমতো পরিবর্তন করে ব্যবহার করতে পারেন। কিছু ওপেনসোর্স সফটওয়্যারের উদাহরণ লিনাক্স কার্নেল, ক্রোমিয়াম ব্রাউজার, মোজিলা ফায়ারফক্স ব্রাউজার, ভিএলসি মিডিয়া প্লেয়ার, লিব্রা অফিস, ওয়ার্ডপ্রেস, পাইথন, ব্লেন্ডার, ইঙ্কস্কেপ ইত্যাদি।

যেসব সফটওয়্যার ব্যবহার করতে কোনো টাকা খরচ করতে হয় না সেগুলোই মূলত ফ্রি সফটওয়্যার। যেমন—গুগল ক্রোম, কেএম প্লেয়ার, পিকাসা ইত্যাদি। তবে ফ্রি সব সফটওয়্যার ওপেনসোর্স হয় না। অর্থাৎ এসব সফটওয়্যারের সোর্স কোড যে কেউ দেখার পাশাপাশি নিজের প্রয়োজন মতো পরিবর্তনে করতে পারেন না।

সব ওপেন সোর্স সফটওয়্যারই ফ্রি নয়, আবার সব ফ্রি সফটওয়্যারও ওপেন সোর্স নয়। বেশির ভাগ ওপেন সোর্স সফটওয়্যারই ফ্রি। তবে বেশ কিছু ওপেনসোর্স সফটওয়্যার রয়েছে যারা সফটওয়্যার সার্ভিস এবং সাপোর্ট বাবদ কিছু টাকা নিয়ে থাকে। যেমন—রেড হ্যাট লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেম।

1950 ও 1960-এর দশকে বেশির ভাগ সফটওয়্যার শিক্ষাবিদ ও করপোরেট গবেষকেরা তৈরি করতেন। ফলে এই সফটওয়্যারের কোডগুলো উন্মুক্ত থাকত। তবে সত্তর ও আশির দশকে সফটওয়্যার নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলো প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। ফলস্বরূপ প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের বানানো সফটওয়্যার পরিবর্তন এবং শেয়ারের সুবিধা সীমাবদ্ধ করে দেয়।

রিচার্ড স্টলম্যান এমআইটির আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ল্যাবরেটরিতে প্রোগ্রামার হিসেবে কাজ করছিলেন। মালিকানাধীন সফটওয়্যারের উত্থান এবং প্রোগ্রামারদের মধ্যে স্বাধীনতা ও সহযোগিতা হারানোর কারণে তিনি হতাশ হয়ে পড়েন। এমআইটির চাকরি ছেড়ে 1983 সালে প্রথম ওপেন সোর্স প্রজেক্ট নিয়ে কাজ শুরু করেন। তিনি 'গু প্রোজেক্ট ও 'গু ওএস সফটওয়্যার নিয়ে কাজ শুরু করেন এবং এগুলোর লাইসেন্স সম্পূর্ণ ওপেন সোর্স রাখেন। ফলে যেকোনো ব্যবহারকারী সফটওয়্যারের সোর্স কোড দেখার পাশাপাশি পরিবর্তনেরও সুবিধা পায়।

অপারেটিং সিস্টেমের অনেক উপাদান যেমন কম্পাইলার, এডিটর, লাইব্রেরি এবং ইউটিলিটি ডেভেলপ করলেও একটি অপারেটিং সিস্টেমের মূল উপাদান কার্নেলের অভাব ছিল। কার্নেল হচ্ছে অপারেটিং সিস্টেমের মূল যা হার্ডওয়্যার রিসোর্স এবং কোনো নির্দেশনা তত্ত্বাবধান করে।

1991 সালে ফিনল্যান্ডের হেলসিংকি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র লিনাস টোরভাল্ডস শখের বশে একটি ইউনিক্স (অপারেটিং সিস্টেম) সদৃশ কার্নেল তৈরি করেন।

লিনাক্স শুরুতে ফ্রি সফটওয়্যার ছিল না। তবে 1992 সালে টোরভাল্ডস জিএনইউ জেনারেল পাবলিক লাইসেন্সের (জিপিএল) অধীনে সফটওয়্যারটি উন্মুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেন। ফলে লিনাক্স একটি ওপেনসোর্স সফটওয়্যারে পরিণত হয়। লিনাক্সকে জিএনইউর উপাদানগুলোর সঙ্গে একত্রিত করে একটি সম্পূর্ণ অপারেটিং সিস্টেম তৈরি করা হয়। যেটিকে জিএনইউলিনাক্স বা শুধু লিনাক্স বলা হয়।

নমনীয়, কর্মক্ষম ও ওপেনসোর্স হওয়ার কারণে লিনাক্স হ্যাকার ও ডেভেলপারদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। অনেক প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা উইন্ডোজ ও ম্যাকওএস-এর মতো মালিকানাভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেমের বদলে লিনাক্স ব্যবহার শুরু করে। লিনাক্সের অনেক সংস্করণ বাজারে এসেছে যা লিনাক্স কার্নেলের ওপর ভিত্তি করেই তৈরি করা হয়েছে। এগুলোর সবগুলোই সম্পূর্ণ ওপেন সোর্স। যেমন—উবুন্টু, কালি লিনাক্স, সেন্ট ওএস, ডেবিয়ান, রেড হ্যাট লিনাক্স, ফেডোরা কোর ইত্যাদি। পরবর্তীতে, 1998 সালে বিপুলসংখ্যক ব্যবহারকারীকে বিনামূল্যে সফটওয়্যার ব্যবহারের সুযোগ বৃদ্ধি এবং সফটওয়্যারে পরিবর্তনের সুযোগ বাড়াতে 'ওপেন সোর্স শব্দের প্রচলন করা হয়। মূলত এরপর থেকে ওপেন সোর্স সফটওয়্যার বানানো বৃদ্ধি পায় এবং সাধারণ ব্যবহারকারী থেকে শুরু করে অনেক প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা ওপেনসোর্স সফটওয়্যার ব্যবহার করা শুরু করে।

1.5.3 মুক্ত এবং উন্মুক্ত উৎস সফটওয়্যার (Free and Open Source Software) :

মুক্ত এবং উন্মুক্ত উৎস সফটওয়্যার বা ফ্রি এবং ওপেন সোর্স সফটওয়্যার হল মুক্ত লাইসেন্সে প্রকাশিত এমন সকল সফটওয়্যার যা ব্যবহারকারীদের এটি ব্যবহার, গবেষণা, উৎস কোড পরিবর্তন, পরিবর্ধনসহ সফটওয়ারটির যেকোন ধরনের বিকাশ করার স্বাধীনতা দেয়। যার ফলে সাধারণ এবং বাণিজ্যিক ব্যবহারকরীরা সহজেই এর উপযোগীতা উপলব্ধি করতে পারে। একই সাথে এর জনপ্রিয়তাও

বৃদ্ধি পায়। ফ্রি সফটওয়্যার ফাউন্ডেশন নামের প্রতিষ্ঠানটি মুক্ত সফটওয়্যার এর মানদন্ড নির্ধারণ এবং এর আনুষঙ্গিক বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করছে। মুক্ত সফটওয়ারের মূলনীতি বোঝাতে তারা যে বাক্যটি ব্যবহার করে সেটি হল "think of free as in free speech, not as in free beer"।

মুক্ত এবং উন্মুক্ত উৎস সফটওয়্যার কথাটির মাধ্যমে মুক্ত সফটওয়্যার এবং উন্মুক্ত উৎস সফটওয়্যার উভয়কে একই সাথে বর্ণনা করা হয়। মুক্ত সফটওয়্যার এবং উন্মুক্ত উৎস সফটওয়্যার এর মূলনীতি কাছাকাছি পর্যায়ের হলেও বেশ কিছু ক্ষেত্রে এদুটির মাঝে উন্নয়ন সংস্কৃতি এবং দর্শনে ভিন্নতা রয়েছে। মুক্ত সফটওয়্যার মূলত ব্যবহারকারীদের স্বাধীনতার দেওয়ার দর্শন অনুসরণ করে, অন্যদিকে উন্মুক্ত উৎস সফটওয়্যার মূলত পরস্পরের মাঝে সমন্বয়ের মাধ্যমে উন্নয়ন পদ্ধতি অনুসরণ করে। কোন একটি মাত্র মূলনীতিতে প্রাধান্য না দিয়ে সম্মেলিতভাবে ফস (ফ্রি এন্ড ওপেন সোর্স সফটওয়্যার) বলা হয়ে থাকে।

1.6 মুক্ত শিক্ষা সম্পদ (Open Educational Resources)

বর্তমান যুগে, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির গুরুত্ব অপরিসীম। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মানুষের জীবনকে করেছে উন্নত, জীবনযাত্রাকে করছে সহজ ও স্বাচ্ছন্দ্যময়। ইন্টারনেটের ব্যবহার আমাদের জীবনে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। প্রতিনিয়ত দৈনন্দিন জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে এর ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিক্ষা ক্ষেত্রেও ইন্টারনেটের ব্যবহার আজ অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। বর্তমানে মুদ্রিত বইয়ের পাশাপাশি ইন্টারনেটে ই-বুকও শিক্ষাক্ষেত্রে আজ বহুল প্রচলিত। যেগুলো একটি নির্দিষ্ট ওয়েবসাইট থেকে যেকোনো মুহূর্তে ডাউনলোড করে পড়া যায়। পাঠ্য বইয়ের কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয় বুঝতে না পারলে ইন্টারনেটের সাহায্য নেওয়া যায়। ইন্টারনেটের কারণে শিক্ষার্থীদের এখন শুধু ক্লাসরুম কিংবা স্কুলের শিক্ষকদের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকতে হচ্ছে না। আজকাল অসংখ্য চমকপ্রদ কোর্স ইন্টারনেটে দেওয়া হয় এবং যে কেউ কোর্সগুলো গ্রহণ করতে পারে। বিজ্ঞান শিক্ষায় আমাদের নানা ধরনের পরীক্ষা বা এক্সপেরিমেন্ট করতে হয়। নানা সীমাবদ্ধতার কারণে অনেক সময় সেগুলো করা যায় না। কিন্তু ইন্টারনেটের কল্যাণে এ ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলো আমারা দেখতে পারি। দেশি-বিদেশি বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তথ্য ইন্টারনেট থেকে এখন সহজেই পাওয়া যায়। কোনো বিষয়ে কারো কোনো তথ্য জানার ইচ্ছা হলে ইন্টারনেটে সার্চ করলে সে তথ্যগুলো খুব সহজেই পাওয়া যায়। শিক্ষার ক্ষেত্রে দিন দিন ইন্টারনেটের ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। দৈনন্দিন জীবনে ইন্টারনেটের ব্যবহারের কোনো শেষ নেই। সাধারণত আমরা দিনটা শুরু করি খবরের কাগজ পড়ে। আজ আর শুধু কাগজে ছাপা খবরের কাগজই নয়, ইচ্ছা হলে ইন্টারনেটের মাধ্যমে অনলাইন খবরের কাগজে দিনের খবরাখবর পড়া যায়। জীবনকে আনন্দময় করার জন্য বিনোদনের একটি ভূমিকা আছে। ইন্টারনেট বিনোদনের ক্ষেত্রে এক বিরাট ভূমিকা রাখছে। এখন ঘরে বসেই অনেক লেখকের বই, ই-বুক হিসেবে ইন্টারনেট থেকে পড়া যায়। শুধু বই

নয়, খেলা, গান, চলচ্চিত্রসহ অনেক বিনোদনের উপাদান এখন ইন্টারনেটের কারণে অনেক বেশি সহজলভ্য হয়েছে। দৈনন্দিন জীবনে নানা সমস্যা সমাধানের প্রথম হাতিয়ার হল তথ্য। ইন্টারনেট থেকে তথ্য সংগ্রহের পর সেটি ব্যবহার করে অনেক সমস্যার সমাধান করা যায়। বিশ্বের জনপ্রিয় তথ্য খোঁজার সাইট বা সার্চ ইঞ্জিন হল গুগল (www.google.com)। এতে বিভিন্ন ভাষায় তথ্য খুঁজে বের করা যায়। শিক্ষাসংক্রান্ত প্রায় সব ধরনের সহায়ক তথ্য ইন্টারনেটে পাওয়া যায়। শিক্ষার্থীদের নানা সমস্যা সমাধানের জন্য ইন্টারনেটে অনেক ওয়েবসাইট রয়েছে। এমন অনেক ওয়েবসাইট আছে যেখানে বিভিন্ন গাণিতিক কাজ করার ব্যবস্থা রয়েছে ও বিভিন্ন গাণিতিক সমস্যারও সমাধান পাওয়া যায়। বিভিন্ন বিষয়ের উপর তথ্য সরবরাহের জন্য নানান ধরনের ওয়েবসাইট আছে। যার মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থী বিনামূল্যে খুব সহজেই তার নিজের বিষয়ের প্রচুর তথ্য পেয়ে থাকে। ইন্টারনেটের সাহায্যে প্রাপ্ত এই ধরনের তথ্যগুলিকে ওপেন এডুকেশনাল রিসোর্স বা মুক্ত শিক্ষা সম্পদ (Open Educational Resources) বলা হয়ে থাকে।

1.6.1 প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়ক ওপেন এডুকেশনাল রিসোর্স (Open Educational Resources for Natural Sciences) :

ভৌত বিশ্বের যা কিছু পর্যবেক্ষণযোগ্য, পরীক্ষণযোগ্য ও যাচাইযোগ্য, তার সুশৃঙ্খল, নিয়মতান্ত্রিক গবেষণা ও সেই গবেষণালব্ধ জ্ঞানভাণ্ডারের নাম বিজ্ঞান। বিজ্ঞানীরা বিশেষ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে জ্ঞান অর্জন করেন এবং প্রকৃতি ও সমাজের নানা মৌলিক বিধি ও সাধারণ সত্য আবিষ্কারের চেষ্টা করেন। বর্তমান বিশ্ব এবং এর প্রগতি নিয়ন্ত্রিত হয় বিজ্ঞানের মাধ্যমে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্র মূলত দুটি— (১) প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও (২) সামাজিক বিজ্ঞান। জীববিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন সহ এ ধরনের সকল বিজ্ঞান প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। অন্যদিকে মানুষের আচার-ব্যবহার এবং সমাজ নিয়ে যে বিজ্ঞান তা সমাজ বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়ক কিছু রিসোর্স হল

নাম	বিবরণ
Learning Science	এটি একটি মুক্ত ওয়েবসাইট যেখানে বিজ্ঞান শিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় নতুন ও উদীয়মান শিক্ষণ-শিখন উপকরণগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়ে থাকে।
Science Fair Central	এটি Discovery Education দ্বারা পরিচালিত একটি অসাধারণ ইন্টারনেট রিসোর্স যা বিজ্ঞান বিষয়ক নানান ধরনের ফ্রী লিঙ্ক (Free Link), প্রেজেন্টেশন (Presentation), প্রজেক্ট (Projects) ইত্যাদি সরবরাহ করে থাকে।

নাম	বিবরণ
National Science Teacher Association (NSTA)	জাতীয় বিজ্ঞান শিক্ষক অ্যাসোশিয়েশন ১৯৪৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর সদর দপ্তর ভার্জিনিয়ায় অবস্থিত। এটি বিশ্বের বৃহত্তম সংগঠন যা বিজ্ঞান শিক্ষার সমস্ত রকম নিত্য নতুন আবিষ্কার সম্পর্কে শিক্ষকদের সচেতন করে থাকে। এছাড়াও, এই অ্যাসোশিয়েশন শিক্ষকদের বিজ্ঞান বিষয়ক বিভিন্ন ধরনের ফ্রী রিসোর্স ব্যবহার করার সুযোগ প্রদান করে থাকে।
National Science Digital Library	জাতীয় বিজ্ঞান ডিজিটাল লাইব্রেরি বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল ও গণিত বিষয়ে শিক্ষার ও গবেষণার জন্য অনলাইন পোর্টাল সার্ভিস প্রদান করে থাকে।
Science Printables	এটি একটি ওয়েব পোর্টাল যার মাধ্যমে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞান বিষয়ক বিভিন্ন রকম শিক্ষামূলক উপাদান বিনামূল্যে অ্যাক্সেস করতে পারে।
Understanding Science	এই ওয়েবসাইটটি বিজ্ঞানের প্রকৃতি ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য প্রদান করে থাকে। এই ওয়েবসাইটটিতে প্রচুর ফ্রী রিসোর্স পাওয়া যায়।
42 Explore	এই ওয়েবসাইটটি বিজ্ঞান, গণিত, স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়ে তথ্যগুলিকে সরবরাহ করে থাকে। বিভিন্ন বিষয়ের তথ্যগুলিকে বিভিন্ন বিভাগে শ্রেণীবদ্ধ করার মধ্য দিয়ে এই ওয়েবসাইটটি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সাহায্য করে থাকে।
Earth Exploration Tool book SEETV	এটি পৃথিবী সম্পর্কিত সিস্টেমগুলির বৈজ্ঞানিক কার্যক্রম সম্বলিত একটি অনলাইন পোর্টাল। বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদদের দ্বারা গঠিত একটি দল এটিকে পরিচালনা করে থাকেন। এর প্রতিটি কার্যকলাপের সাথে এক বা একাধিক বৈজ্ঞানিক তথ্যের সেট এবং বিশ্লেষণ সরঞ্জাম থাকে যেগুলিকে ব্যবহারকারীরা ব্যবহারের মাধ্যমে পৃথিবী সম্পর্কিত সিস্টেমের যে কোন দিক অন্বেষণ করতে পারে।
Edheads	Edheads হল একটি অনলাইন শিক্ষাগত রিসোর্স যেখানে বিনামূল্যে বিজ্ঞান এবং গণিতের বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষা করা যায় যা শিক্ষার্থীদের বিশ্লেষণমূলক চিন্তাধারা গঠনে সাহায্য করে থাকে।

নাম	বিবরণ
Periodic Videos	এটি একটি ওয়েবসাইট যেখানে রাসায়নিক উপাদান সম্পর্কিত বিভিন্ন সংক্ষিপ্ত ভিডিও আছে। এই ভিডিওগুলি তৈরি করেছেন ভিডিও সাংবাদিক ব্র্যাডি হারণ (Brady Haran) ও এই ভিডিওগুলি তৈরি করা হয়েছে নটিংহ্যাম বিশ্ববিদ্যালয়ে।
Sumanas	Sumanas হল একটি শিক্ষামূলক ওয়েবসাইট যেখানে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অনেক অ্যানিমেটেড ভিডিও পাওয়া যায়। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাগুলি হল General Biology, Molecular Biology, Microbiology, General Biotechnology, Biopsychology/ Neuroscience, Environmental Science, Astronomy ও Chemistry।
24/7 Science	এই ওয়েবসাইটটি বিজ্ঞান বিষয়ক বিভিন্ন রকমের প্রজেক্ট, কার্যক্রম, গেম এবং অন্যান্য অনেক ধরনের রিসোর্স প্রদান করে থাকে।
Science Daily	বিজ্ঞান বিষয়ক সাম্প্রতিক এবং সর্বশেষ গবেষণা সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করে থাকে।

1.6.2 সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ক ওপেন এডুকেশনাল রিসোর্স (Open Educational Resources for Social Sciences) :

সমাজ বিজ্ঞান বা সামাজিক বিজ্ঞান হল সামাজিক সম্পর্কের বিজ্ঞান। সমাজে বসবাসরত ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির, গোষ্ঠির সাথে গোষ্ঠির, গোষ্ঠির সাথে প্রতিষ্ঠানে মধ্য সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে সমাজ বিজ্ঞান। সমাজ বিজ্ঞান সমাজে বসবাসরত ব্যক্তিদের সামাজিক আচরণ ও সম্পর্ক নিয়ে বিজ্ঞান ভিত্তিক আলোচনা করে থাকে। সমাজ বিজ্ঞানকে সাধারণত জ্ঞানের একটি বৃহত্তর ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যার মধ্যে রয়েছে নৃবিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব, অর্থনীতি, শিক্ষা, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ভূগোল, মনোবিজ্ঞান।

সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ক কিছু রিসোর্স হল—

নাম	বিবরণ
Search Results National Council for the Social Studies	সমাজ বিজ্ঞানের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য এই ওয়েবসাইটটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই ওয়েবসাইটটিতে সমাজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়গুলি সম্পর্কে প্রচুর তথ্য পাওয়া যায়।

নাম	বিবরণ
World History	এই ওয়েবসাইটটি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য সমাজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়গুলিকে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে থাকে।
PBS Teachers Social Studies	এই ওয়েব পেজটিতে সমাজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন রিসোর্সগুলি শ্রেণী অনুযায়ী সাজানো থাকে। এখানে অডিও, ভিডিও, ইমেজ, ডকুমেন্ট ইত্যাদি বিভিন্ন রকমের রিসোর্স থাকে।
Social Studies Theme Units	এটি Edhelper.com দ্বারা পরিচালিত একটি ওয়েব পেজ যা সমাজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন ধরনের প্রজেক্ট সরবরাহ করে থাকে। এই ধরনের প্রজেক্টগুলি সমাজ বিজ্ঞানের বিষয়গুলিকে বুঝতে শিক্ষার্থীদের বিশেষ ভাবে সাহায্য করে থাকে।
Smithsonian Education	এই ওয়েবসাইটটি শিল্প এবং সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ভ্রমণ সম্পর্কিত তথ্য প্রদান করে থাকে। শিক্ষার্থীদের homeworke-এর সুযোগও প্রদান করে থাকে এই ওয়েবসাইটটি।
EDSITEment	এই ওয়েবসাইটটি বিষয়, থিম, এবং গ্রেড অনুযায়ী সমাজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিকগুলিকে আলোচনা করে থাকে।
Lesson Plans for Social Studies	এই ওয়েবসাইটটি ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির এমেরিটাস অধ্যাপক ডঃ মার্টি লেভাইন (Dr. Marty Levine)-এর দ্বারা পরিচালিত হয়। এই সাইটে সমাজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন ধরনের পাঠ পরিকল্পনা (Lesson Plan) ও রিসোর্স পাওয়া যায় যা শিক্ষকদের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। এখানে, রিসোর্সগুলিকে কয়েকটি ক্ষেত্রে বিভক্ত করা থাকে।
Teachinghistory.org	Teachinghistory.org হল একটি ওয়েবসাইট যা ইতিহাস সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের Teachinghistory.org রিসোর্স সরবরাহ করে থাকে। এই সাইটটিতে শ্রেণীকক্ষে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের শিক্ষামূলক ভিডিও পাওয়া যায়।
Smithsonian's History Explorer	এটি একটি ওয়েবসাইট যা আমেরিকার ইতিহাসকে জানার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করে থাকে। এই ওয়েবসাইটটি National Museum of American History-এর দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে।

নাম	বিবরণ
History Net	এই ওয়েবসাইটটি National Historical Society-এর দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। এখানে আমেরিকা ও বিশ্ব ইতিহাসের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে আলোচনা করা হয়েছে।
Euratlas	এই ওয়েবসাইটটিতে ইউরোপ ও বিশ্বের ইতিহাস ও ভূগোল বিষয় সম্পর্কিত বিভিন্ন ম্যাপ (Map) পাওয়া যায়।
National Geography	এই ওয়েবসাইটটি পৃথিবীর ভৌগলিক দিক, পুরাতত্ত্ব, ইতিহাস এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়ক বিভিন্ন রকমের তথ্য প্রদান করে থাকে।

1.6.3 মানবিক বিদ্যা বিষয়ক ওপেন এডুকেশনাল রিসোর্স (Open Educational Resources for Humanities) :

মানবিক বিদ্যা ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শের সহাবস্থানের মাধ্যমে প্রগতিশীল চিন্তার একটি পরিবেশ সৃষ্টি করে। একই সঙ্গে সে নানামাত্রিক জ্ঞানচর্চার একটি সংস্কৃতিও নির্মাণ করে। মানবিক বিদ্যা মানুষের চিন্তা প্রক্রিয়ায় প্রধানত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। প্রথমত, মানবিক বিদ্যা বিভিন্ন তথ্যের সম্ভাব্য সব রকম ব্যাখ্যা নির্মাণের প্রয়াস চালায় এবং যার মাধ্যমে সে মানুষের ধারণা বা মতাদর্শ গঠনে কাজ করে। দ্বিতীয়ত, মানবিক বিদ্যা স্থান এবং কালের সঙ্গে সম্পর্কিত রেখে নৈতিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ করে। এ রকম বিশ্লেষণের মাধ্যমে সে দেখাতে চায় ব্যক্তির মূল্যবোধ কীভাবে তার জীবন, তার স্বপ্ন বা তার কল্পনাকে নিরন্তর রূপান্তরিত করে। তৃতীয়ত, সে সামাজিক বিজ্ঞান, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও মানবিক বিজ্ঞানের মধ্যকার আন্তঃসম্পর্ক নির্মাণ করে। সভ্যতার বিবর্তন, সত্যের বহুরূপিতা, ন্যায্যতা, দর্শন, মতাদর্শ, রাজনীতি, সমাজ ও প্রতিবেশ সম্পর্কিত অসংখ্য বিমূর্ত বিষয়, যা মানুষের জীবন ও ইতিহাসের প্রতিটি স্তরকে প্রভাবিত করে সেগুলোই মূলত মানবিক বিদ্যা চর্চার বিষয়।

মানবিক বিদ্যা বিষয়ক কিছু রিসোর্স হল

নাম	বিবরণ
Bartleby	Bartleby.com হল একটি ইলেকট্রনিক টেক্সট সংরক্ষণাগার (Archive)। এর সদর দপ্তর নিউ ইয়র্ক-এ অবস্থিত। ১৯৯৩ সালে জানুয়ারী মাসে Steven H. van Leeuwen এটির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৯৯৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে, তিনি 'Whitman's

নাম	বিবরণ
	Leaves of Grass' নামে একটি বই প্রথম HTML আকারে প্রকাশ করেন। ১৯৯৭ সাল থেকে এই ওয়েবসাইটটির নাম পরিবর্তন করে 'The New Bartleby Library' করা হয়। এই ওয়েবসাইটটিতে সাহিত্যের বিভিন্ন ছোট গল্প ও উপন্যাস পাওয়া যায়।
Luminarium	এটি ইংরাজী সাহিত্যের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ওয়েবসাইট। এই ওয়েবসাইটটিতে মধ্যযুগ, রেনেসাঁ, সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতকের ইংরেজি সাহিত্যের প্রচুর তথ্য পাওয়া যায়। এখানে সাহিত্যগুলি সাহিত্যিকের নাম অনুযায়ী ক্রমানুসারে সাজানো আছে।
English Literature Links	এই ওয়েবপেজটি ইংরেজি সাহিত্যে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইংরাজী সাহিত্যের প্রচুর e-book, ম্যাগাজিন, মুভি এখানে পাওয়া যায়। ইংরাজী সাহিত্যের বিশিষ্ট ব্যাক্তিগণের পূর্ণাঙ্গ জীবনী এখানে পাওয়া যায়।
Internet Sacred Text Archive	এই সাইটটিতে ধর্ম, পুরাণ এবং লোকাচারবিদ্যা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।
International Crisis Group	এটি একটি স্বাধীন, অলাভজনক ও বেসরকারি সংস্থা যারা সারা বিশ্বের রাজনীতি বিষয়ক সাম্প্রতিক ঘটনাগুলিকে সরবরাহ করে থাকে।
Oxford Literary Review	এটি সাহিত্য তত্ত্বের একটি অ্যাকাডেমিক জার্নাল। এটি 1970 সালে ইয়ান ম্যাকলিয়ড, অ্যান ওয়ার্ডসওয়ার্থ এবং রবার্ট জে সি ইয়াং-এর দ্বারা প্রকাশ লাভ করেছিল। এই জার্নালে বিশেষত ইতিহাস, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনে গঠনমূলক চিন্তার প্রভাব সম্পর্কে বেশি আলোচনা করা হয়।
Culture machines	এটি একটি ই-জার্নাল যা 1999 সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই জার্নালে সাংস্কৃতিক শিক্ষা (Cultural Studies) সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য প্রকাশিত হয়।
Other Voice	এটি সাংস্কৃতিক সমালোচনার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা একটি ই-জার্নাল যেটি পেন্সিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় (University of Pennsylvania) থেকে প্রকাশিত হয়।

নাম	বিবরণ
Anthro. Net Research Engine	বিবরণ এটি একটি সার্চ টুল যা নৃতত্ত্ববিদ্যা বিষয়ক ওয়েবসাইট ও গ্রন্থপঞ্জীর রেফারেন্সের গেটওয়ে হিসেবে কাজ করে। এটি ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ববিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক এরিক জে হোয়াইট (Eric J. White)-এর দ্বারা পরিচালিত হয়।
British Library	এই ওয়েবসাইটটিতে ইংরাজী সাহিত্যের প্রচুর উপকরণ পাওয়া যায়। বিশেষ করে প্রাচীনযুগের ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া যায়।

1.6.4 গণিত বিষয়ক ওপেন এডুকেশনাল রিসোর্স (Open Educational Resources for Mathematics)

গণিত হল পরিমাপ, পরিমাণ এবং মাত্রার বিজ্ঞান। গণিতে সংখ্যা ও অন্যান্য পরিমাপযোগ্য রাশিসমূহের মধ্যে যে সম্পর্ক আছে সিগুলিকে সঠিক ভাবে বর্ণনা করা হয়। গণিতের মাধ্যমে আমরা অসমাধানযুক্ত সমস্যাকে শৃঙ্খলভাবে উপস্থাপন করতে ও তা সমাধানে নতুন ধারনার জন্ম দিয়ে থাকি। গাণিতিক প্রমাণের মাধ্যমে উক্ত ধারনাগুলো সত্যতা যাচাইকরন করা হয়ে থাকে। গাণিতিক সমস্যা সমাধান সম্পর্কিত গবেষণা বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ বা শত শত বছর ধরে হয়ে আসছে। গণিত হল সব ধরনের বিজ্ঞানের প্রবেশদ্বার। যেহেতু গণিত যুক্তি ও সৃজনশীলতা উপর নির্ভরশীল একটি বিষয় তাই এই বিষয়টি সর্বদাই অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী স্থানে অবস্থান করে।

গণিত বিষয়ক কিছু রিসোর্স হল -

নাম	বিবরণ
Aplus Math	Aplus Math গণিত বিষয়ক বিভিন্ন ওয়ার্কশীট, গেম, flash card ইত্যাদি বিনামূল্যে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের প্রদান করে থাকে।
Math TV	Math TV একটি প্ল্যাটফর্ম যেখানে গাণিতিক ধারণা সম্পর্কিত একাধিক ভিডিও সরবরাহ করা হয়।
AAA Math	এই ওয়েবসাইটটিতে কিন্ডারগার্টেন থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বিভিন্ন গাণিতিক বিষয়কে আলোচনা করা হয়। এখানে শিক্ষার্থীরা তাদের অধিকৃত জ্ঞানের মূল্যায়নও করে থাকে।

নাম	বিবরণ
Math's Fun	এই ওয়েবসাইটটির উদ্দেশ্য হল গণিত শিখনকে মজার মাধ্যমে উপভোগ্য করে তোলা। এই ওয়েবসাইটটিতে গণিতের বিভিন্ন দিকগুলি (পাটিগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি, ক্যালকুলাস)কে আলাদা আলাদা করে আলোচনা করা হয়েছে।
Math Central	Math Central হল গণিতের শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকদের জন্য একটি ইন্টারনেট রিসোর্স। এই ওয়েবসাইটটি কানাডার রেজিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত ও পরিসংখ্যান বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের দ্বারা পরিচালিত হয়।
Ten Marks	এই ওয়েবসাইটটি শিক্ষার্থীদের গণিত বিষয়ক বিভিন্ন সমস্যাকে সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় hints দিয়ে থাকে। এছাড়াও, গণিতের বিভিন্ন সমস্যাকে সমাধানের ভিডিও এই ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়।
Maths Frame	এই ওয়েবসাইটিতে প্রায় 200টি ফ্রী ইন্টারেক্টিভ গণিতের গেম আছে। এই প্রতিটি গেমই অভিজ্ঞ শিক্ষক দ্বারা ডিজাইন করা হয়েছে। এই গেমগুলি শিক্ষার্থীদের সংখ্যা, প্যাটার্ন, সংখ্যাসূচক সম্পর্ক এবং গাণিতিক চিন্তাকে বিকশিত করতে সাহায্য করে।
The Math Forum	এটি শিক্ষক, গণিতবিদ, গবেষক, শিক্ষার্থীদের দ্বারা গঠিত একটি সংস্থা যা গণিত শিখতে ও গণিত শিক্ষার উন্নতির জন্য সাহায্য করে থাকে। এই ফোরামটি বিভিন্ন রকমের গাণিতিক পাজল সরবরাহ করে থাকে।
Simpsons math	এই ওয়েবসাইটটি গণিতের বিভিন্ন দিক যথা—পাটিগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি, ক্যালকুলাস ইত্যাদি সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা প্রদান করে থাকে।
Math Words	এই ওয়েবসাইটটিতে বিভিন্ন গাণিতিক পদ, গাণিতিক সূত্র, ছবি, ডায়াগ্রাম, সারণী ও বিভিন্ন ধরনের গাণিতিক উদাহরণ দেওয়া আছে।
MATH guide	MATH guide গণিতের বিভিন্ন শাখাগুলি যথা বীজগণিত, জ্যামিতি, এবং ক্যালকুলাস সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য প্রদান করে থাকে। গণিতের বিভিন্ন পাজল এখানে সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

নাম	বিবরণ
Math League	এই ওয়েবসাইটটি বিভিন্ন ধরনের পরিসেবা প্রদান করে থাকে। যার দ্বারা শিক্ষার্থীরা গণিত বিষয়ের বিভিন্ন বিমূর্ত ধারণাগুলিকে সহজে আয়ত্ত করতে পারে।
Math Drills	এই ওয়েবসাইটটি শিক্ষকদের গণিত বিষয়ে হাজার হাজার গাণিতিক ওয়ার্কশীট প্রদান করে থাকে।
Math Goodies	এটি গণিত বিষয়ক ইন্টারেক্টিভ পাঠ, ওয়ার্কশীট, গেম এবং পাজল সমন্বিত একটি ওয়েবসাইট।
Math Aids	এটি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য গণিত বিষয়ক একটি ফ্রী ইন্টারনেট রিসোর্স। এই ওয়েবসাইটিতেও গণিতের বিভিন্ন ধরনের ওয়ার্কশীট পাওয়া যায়।
Math Basics	Math Basics গণিতের মৌলিক গাণিতিক প্রক্রিয়াগুলি সম্পর্কে আলোচনা করে থাকে। এই ওয়েবসাইটটি গণিত টিউটোরিয়ালের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের গণিতের বিভিন্ন ধারণাগুলিকে আলোচনা করে থাকে।

1.7 সারসংক্ষেপ (Summary)

বর্তমান যুগ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যুগ। আধুনিক সভ্যতার ক্রমবিকাশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রভাব অপরিসীম। বর্তমান সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। তথ্য প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, যোগাযোগ, শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্প, অফিস-আদালত সর্বোপরি মানুষের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষণীয়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়ন মানব সমাজের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রকে পরিবর্তিত করেছে এবং বিভিন্নভাবে আমাদের জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বা আইসিটি হল তথ্য প্রযুক্তি বা ইনফর্মেশন টেকনোলজির সাথে অন্যান্য প্রযুক্তি প্রধানত যোগাযোগ প্রযুক্তি বা কমিউনিকেশন টেকনোলজির সমন্বয় সাধন (Information and Communication Technology (ICT) is defined as the combination of Information technology with other– related technologies, specifically Communication technology)।

যে কোন প্রকারের তথ্যের উৎপত্তি, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, সঞ্চালন এবং বিচ্ছুরণে ব্যবহৃত সকল ইলেক্ট্রনিক্স প্রযুক্তিকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বা ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি বলা হয়।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি একপ্রকার একীভূত যোগাযোগ ব্যবস্থা। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এমন এক ধরনের ব্যবস্থা যার মাধ্যমে একজন ব্যবহারকারী খুব সহজে তথ্য গ্রহন, সংরক্ষণ, সঞ্চালন ও বিশ্লেষণ করতে পারেন।

অতীতে তথ্য প্রযুক্তি, যোগাযোগ প্রযুক্তি, টেলিকমিউনিকেশন, কনজ্যুমার ইলেক্ট্রনিক্স ইত্যাদি সব পৃথক পৃথক বিষয় ছিল। কিন্তু বর্তমানে, এই পৃথক পৃথক বিষয়গুলিকে একসাথে নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে। এর ফলে একাধিক প্রযুক্তিকে একীভূত করা সম্ভবপর হয়েছে। আর এই একীভূতকরণের প্রক্রিয়াটিকে একত্রে ডিজিটাল কনভারজেন্স বলা হয়। অর্থাৎ ডিজিটাল কনভারজেন্স হল বিভিন্ন মাধ্যমের একাধিক প্রযুক্তিকে মিলিত করে একটি মাধ্যমে একীভূত করা ও কার্যকরীভাবে পরিচালনা করা।

ইন্টারনেটের মাধ্যমে পরস্পরের সাথে যুক্ত হাইপারটেক্সট ডকুমেন্টগুলো নিয়ে কাজ করার প্রক্রিয়া ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব (WWW বা W3) নামে পরিচিত। হাইপারলিংকের সাহায্যে ওয়েব ব্রাউজারের মাধ্যমে একজন ব্যবহারকারী টেক্সট, চিত্র, ভিডিও ও অন্যান্য মাল্টিমিডিয়া সমৃদ্ধ ওয়েব পেজ দেখতে পারে। সাধারনত ব্রাউজারে ইউআরএল টাইপ করে বা কোন পাতা থেকে হাইপারলিঙ্ক অনুসরণ করে ওয়েব পেজে ঢোকার প্রক্রিয়া শুরু হয়। এরপর ওয়েব ব্রাউজার কিছু বার্তা প্রদান করা শুরু করে যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে। এরপরই ওয়েব পেজটি প্রদর্শিত হয়। প্রথমেই ইউআরএল এর সার্ভার আইপি অ্যাড্রেস ধারণ করে। এ জন্য এটি ডোমেইন নেম সিস্টেম নামে পরিচিত বিশ্বজনীন ইন্টারনেট ডাটাবেস ব্যবহার করে। এরপর ব্রাউজার নির্দিষ্ট ঠিকানাটিকে একটি এইচটিটিপির আবেদন জানায় ওয়েব সার্ভারের কাছে। সাধারণত ওয়েব পেজেটির এইচটিএমএল লেখার জন্য শুরুতে আবেদন জানানো হয়। এরপর ওয়েব ব্রাউজারটি ছবিসহ অন্যন্য প্রয়োজনীয় ফাইলের জন্য আবেদন পৌছে দেয়।

মুক্ত সফটওয়্যার বা ফ্রি সফটওয়্যার হল এমন এক ধরনের সফটওয়্যার যা ব্যবহারকারীকে এটা ব্যবহার, অধ্যয়ণ এবং সম্পাদনা করার পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করে। এমনকি এই সফটওয়্যারগুলো কপি বা বিতরণ করার জন্যও একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে, এবং বিতরণের কপিটি হতে পারে সফটওয়্যারটির মূল সংস্করণ বা পরিবর্তীত কোন সংস্করণ।

ওপেন সোর্স সফটওয়্যারের সোর্স কোড সম্পূর্ণ উন্মুক্ত থাকে। যদি কোনো সফটওয়্যারের ওপেন সোর্স লাইসেন্স থাকে তাহলে সেই সফটওয়্যারটিকে যেকোনো ব্যবহারকারী বিনামূল্যে ডাউনলোডের পাশাপাশি ইচ্ছেমতো পরিবর্তন করে ব্যবহার করতে পারেন। সব ওপেন সোর্স সফটওয়্যারই ফ্রি নয়, আবার সব ফ্রি সফটওয়্যারও ওপেন সোর্স নয়। বেশির ভাগ ওপেন সোর্স সফটওয়্যারই ফ্রি। তবে

বেশ কিছু ওপেনসোর্স সফটওয়্যার রয়েছে যারা সফটওয়্যার সার্ভিস এবং সাপোর্ট বাবদ কিছু টাকা নিয়ে থাকে। যেমন—রেড হ্যাট লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেম।

বিশ্বের জনপ্রিয় তথ্য খোঁজার সাইট বা সার্চ ইঞ্জিন হল গুগল (www.google.com)। এতে বিভিন্ন ভাষায় তথ্য খুঁজে বের করা যায়। শিক্ষাসংক্রান্ত প্রায় সব ধরনের সহায়ক তথ্য ইন্টারনেটে পাওয়া যায়। শিক্ষার্থীদের নানা সমস্যা সমাধানের জন্য ইন্টারনেটে অনেক ওয়েবসাইট রয়েছে। এমন অনেক ওয়েবসাইট আছে যেখানে বিভিন্ন গাণিতিক কাজ করার ব্যবস্থা রয়েছে ও বিভিন্ন গাণিতিক সমস্যারও সমাধান পাওয়া যায়। বিভিন্ন বিষয়ের উপর তথ্য সরবরাহের জন্য নানান ধরনের ওয়েবসাইট আছে। যার মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থী বিনামূল্যে খুব সহজেই তার নিজের বিষয়ের প্রচুর তথ্য পেয়ে থাকে। ইন্টারনেটের সাহায্যে প্রাপ্ত এই ধরনের তথ্যগুলিকে ওপেন এডুকেশনাল রিসোর্স বা মুক্ত শিক্ষা সম্পদ (Open Educational Resources) বলা হয়ে থাকে।

1.8 প্রশ্নাবলি (Questions)

1. তথ্য প্রযুক্তি বলতে কী বোঝ?
2. যোগাযোগ প্রযুক্তি কাকে বলে?
3. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সংজ্ঞা দাও।
4. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রকৃতি ব্যাখ্যা করো।
5. ই-লার্নিং কী? এর বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করো।
6. ই-লার্নিং-এর সুবিধা ও অসুবিধাগুলি লেখ।
7. মোবাইল লার্নিং কাকে বলে?
8. মোবাইল লার্নিং-এর বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করো।
9. মোবাইল লার্নিং-এর সুবিধা ও অসুবিধাগুলি লেখ।
10. অনলাইন লার্নিং-এর সংজ্ঞা দাও।
11. অনলাইন লার্নিং-এর সুবিধা ও অসুবিধাগুলি লেখ।
12. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির পরিধিকে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করো।
13. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিগত সিস্টেমের উপাদানগুলি সম্পর্কে লেখ।

14. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রকারভেদ সম্পর্কেআলোচনা করো।
15. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের সুবিধা ও অসুবিধা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করো।
16. সমাজে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রভাব বিস্তারিতভাবে আলোচনা করো।
17. টেলিকনফারেন্সিং কাকে বলে?
18. ভিডিও কনফারেন্সিং কি?
19. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির নেতিবাচক প্রভাবগুলিকে আলোচনা করো।
20. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে নৈতিকতাগুলি কি কি?
21. আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স বলতে কি বোঝ?
22. বায়োমেট্রিক্স সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ।
23. বায়োইনফরমেটিক্স কাকে বলে?
24. ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব কি?
25. ওয়েব 1.0 ও ওয়েব 2.0-এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।
26. ফ্রি এবং ওপেন সোর্স সফটওয়্যার কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
27. মুক্ত শিক্ষা সম্পদের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করো।

1.9 তথ্যসূত্র (References)

- Arora, D. & Lihitkar, (2013). *From Traditional Learning to Virtual Learning : A Paradigm Shift.*
- Attri, A. (2012). Distance Education : Problems and Solutions. *International Journal of Behavioral Social And Movement Science,* 1(4), 42-58.
- Babateen. H. R. (2011). he role of Virtual Laboratories in Science Education. *5th International Conference on Distance Learning and Education.*
- Badrul, H. Khan (2005). *E-Learning QUICK Checklist*. Hershey, PA : Information Science Publishing.
- Behara, S.K. (2013). E and M-learning : A Comparative Study. *International Journal on New Trends in Education and Their Implications*, 4(3), 65-78.

- Das Rumpa (2012). *Integrating ICT in Teaching Learning Framework in India : Initiatives and Challenges*. Journal of Multidisciplinary Studies.
- Payal, & Kanvaria, V. K. (2018). Learning with ICT : use & barriers from teachers' perceptions. *International Journal of Recent Scientific Research*, 9(1), 23545-23548. doi : 10.24327/IJRSR
- Rodrigues, S. (2002). Opportunistic challenges. Teaching and learning with ICT. New York : Nova Science Publishers, Inc
- Sahin, S. (2018). A critical survey on the involvement of ICT in the teacher's training institutes of West Bengal (W.B.). *International Journal of Advance Research, Ideas and Innovations in Technology*, 4(4), 569-575.
- Sareen, S. (2019). Attitude of school teachers towards ICT in relation to their perceived self efficacy in ICT. Research and *Reflections on Education*, 17(4), 1-7.

একক - 2 ❑ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি, পর্যায় এবং সামর্থ্য (Approaches, Stages and Competencies related to ICT)

গঠন (Structure)

2.1 উদ্দেশ্য **(Objectives)**

2.2 ভূমিকা **(Introduction)**

2.3 শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং ব্যবহারের দৃষ্টিভঙ্গি **(Approaches in Adoption and Use of ICT in Education)**

2.3.1 ইউনেস্কো ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি-কমপিটেন্সি ফ্রেমওয়ার্ক ফর টিচার্স **(UNESCO Information and Communication Technology-Competency Framework for Teachers)**

2.3.2 শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং ব্যবহার সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গিসমূহ **(Approaches in Adoption and Use of ICT in Education)**

2.4 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহারের পর্যায় **(Stages of ICT Usage)**

2.5 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির শিক্ষাবৈজ্ঞানিকগত ব্যবহার **(Pedagogical Usages of ICT)**

2.6 শিক্ষকের সামর্থ্য : বিষয়বস্তু, শিক্ষণবিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির একীভূতকরণ **(Teacher Competencies, Integration of Content, Pedagogy and Technology)**

2.6.1 প্রযুক্তিগত সমন্বয় **(Technological Integration)**

2.6.2 প্রযুক্তিগত সমন্বয়ের রূপরেখা **(Frameworks for Technological Integration)**

2.7 সারসংক্ষেপ **(Summary)**

2.8 প্রশ্নাবলি **(Questions)**

2.9 তথ্যসূত্র **(References)**

2.1 উদ্দেশ্য (Objectives)

এই অধ্যায়টি সমাপ্ত হওয়ার পরে, শিক্ষার্থীরা—

- শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রয়োগের পদ্ধতি সম্পর্কে জানবে।
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের বিভিন্ন পর্যায়গুলিকে সঠিকভাবে অনুধাবন করবে।
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির শিক্ষাবৈজ্ঞানিকগত ব্যবহারগুলিকে বর্ণনা করতে পারবে।
- শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পর্কিত শিক্ষকের বিভিন্ন ধরনের সামর্থ্যগুলি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবে।

2.2 ভূমিকা (Introduction)

প্রযুক্তি সহায়ক শিক্ষণবিজ্ঞান (Techno pedagogy) আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আক্ষরিক অর্থে, ”পেডাগজি” বলতে ‘শিক্ষণের কলা ও বিজ্ঞানকে (Art and Science of teaching)’ বোঝানো হয়ে থাকে এবং ‘টেকনো” বলতে ‘দক্ষতা” বা নৈপুণ্য” কে বোঝানো হয়ে থাকে। ল্যাটিন শব্দ ‘Texere’ থেকে ‘Techno’ কথাটির সৃষ্টি হয়েছে যার অর্থ হল ‘নির্মাণ” বা তৈরি করা”। বর্তমান বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে, ‘টেকনো’ হল একটি ‘qualifier’ যা ‘শিক্ষণবিজ্ঞান’ ও এর সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে থাকে।

প্রযুক্তি সহায়ক শিক্ষণবিজ্ঞান হল শিখন পরিবেশকে উন্নত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন শিক্ষণ প্রদানকারী কৌশলের সাথে প্রযুক্তির সমন্বয় সাধন। তথ্য ব্যাপ্তিকরণ বা তথ্যবিস্তারের উদ্দেশ্যে তথ্যের স্বাচ্ছন্দতা ও সুস্পষ্টতাকে সর্বাধিক কার্যকরী করে তোলার জন্য শিখন পরিবেশ তৈরি করতে বিভিন্ন বাধা সৃষ্টিকারী বিষয়গুলির সম্পূর্ণ অর্থবহ স্বীকৃতি প্রয়োজন। প্রযুক্তি সহায়ক শিক্ষণবিজ্ঞান এই বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করে থাকে। এটি শিখন পরিস্থিতি সংক্রান্ত একটি নকশা তৈরি করতে এবং শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্যকে বিশেষভাবে তুলে ধরতে সাহায্য করে থাকে। এটি শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ কার্যকরী পদ্ধতি যা শিখনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে থাকে। আর প্রযুক্তি সহায়ক শিক্ষণবিজ্ঞান গত দক্ষতা বলতে বোঝায় বৈদ্যুতিন যন্ত্রসহকারী পারদর্শিতা যা শিখন ও শিক্ষণের উন্নত শিক্ষণবিজ্ঞান নীতির সাথে প্রযুক্তির ব্যবহারের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে থাকে। আর এই প্রসঙ্গে, প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষণবিজ্ঞানগত জ্ঞান হল একটি সহযোগিতামূলক ধারণা যা শিক্ষণবিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত জ্ঞানের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে থাকে। প্রযুক্তি সহায়ক শিক্ষণবিজ্ঞানগত দক্ষতা শিক্ষণ ও শিখনের অনুশীলনকে সরল ও সহজবোধ্য করে তোলে কারণ এই দক্ষতা শিক্ষকদের উপর বর্ধিত চাপকে কমিয়ে দেয় এবং শিক্ষার্থীদের সঠিকভাবে জ্ঞান অর্জন করার জন্য সক্ষম করে তোলে।

প্রযুক্তি সহায়ক শিক্ষণবিজ্ঞানগত দক্ষতা শিক্ষার গুণগত মানকে বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে থাকে। আমরা সবাই জানি যে, শিক্ষক শিক্ষা (Teacher Education) বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অর্জন করে আছে। আর এই শিক্ষক শিক্ষায় প্রযুক্তি সহায়ক শিক্ষণবিজ্ঞানগত দক্ষতা বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। এই দক্ষতা শিক্ষকদের প্রযুক্তিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে ও এই সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জনে সাহায্য করে থাকে।

উচ্চশিক্ষার প্রযুক্তি সহায়ক শিক্ষণবিজ্ঞানের (Techno-pedagogy) প্রধান প্রায়োগিক দিকটি হল শিক্ষণ ও শিখন (Teaching and Learning)। আর এই প্রযুক্তি সহায়ক শিক্ষণবিজ্ঞান, শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়াকে যে সব ক্ষেত্রে সাহায্য করে থাকে সেইগুলিকে নিম্নে বর্ণনা করা হল —

- ভাষাগত দক্ষতার উন্নতি সাধন
- শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ার বিকাশ সাধন
- স্টাডি মেটিরিয়ালের উন্নতিসাধন
- বহুমাত্রিক শিক্ষণ নির্দেশনা প্রদান
- সুনির্দিষ্ট শিক্ষণ পদ্ধতির উন্নতি সাধন
- ই-লার্নিংএর মাধ্যমে পরিচালিত দূরশিক্ষণ প্রক্রিয়াকে সহায়তা প্রদান
- সঠিক পেশা নির্বাচনের ক্ষেত্রে সঠিক নির্দেশ প্রদান
- স্ব-শিখন প্রক্রিয়াকে পরিচালিত করতে সহায়তা প্রদান
- পরীক্ষা পদ্ধতির উন্নতি সাধন
- গবেষণা কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান
- জ্ঞানীয় শিখনে সহায়তা প্রদান
- জীবনশৈলী সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির উন্নতিসাধন
- নান্দনিক চেতনার বিকাশ সাধন

2.3 শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং ব্যবহারের দৃষ্টিভঙ্গি (Approaches in Adoption and Use of ICT in Education)

ইউনেস্কো (UNESCO) শিক্ষার অভিমুখকে ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে প্রযুক্তি সহায়ক শিক্ষণবিজ্ঞানগত দক্ষতার মাধ্যমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সমন্বয়সাধনের দ্বারা একটি সার্বজনীনগ্রাহ্য রূপরেখা তৈরি করেছিলেন।

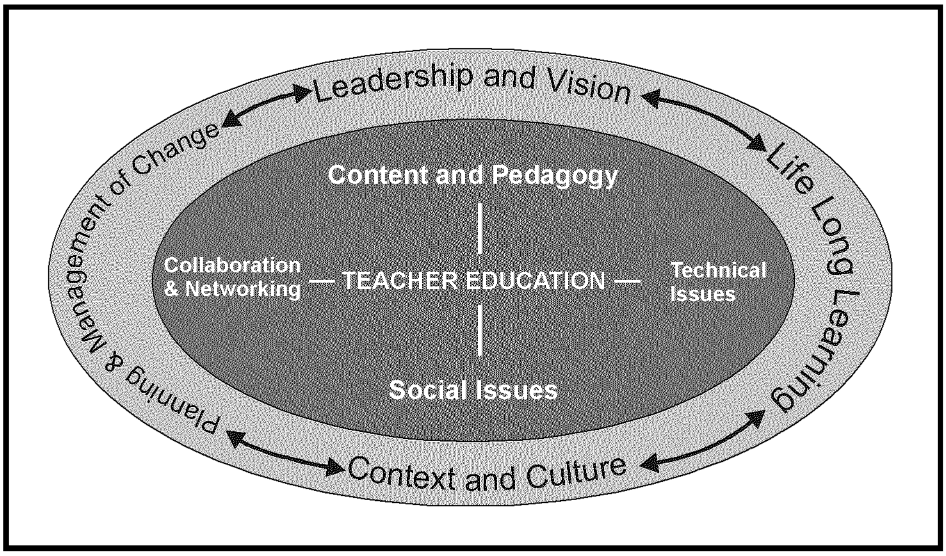

Figure-2

এই রূপরেখাটি চারটি সহযোগী বিষয় দ্বারা পরিবৃত চারটি পারদর্শিতার ক্লাস্টার নিয়ে গঠিত। এই রূপরেখাটি প্রতিটি শিক্ষককে তার নিজস্ব প্রেক্ষাপট এবং শিক্ষণবিজ্ঞান সম্পর্কিত ব্যক্তিগত ধারণার উপর ভিত্তি করে যে কোন বিষয়কে ব্যাখ্যা করার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন প্রদান করেছিল।

এই রূপরেখার অন্তর্গত চারটি মূল বিষয় হল নিম্নরূপ—

প্রসঙ্গ ও সংস্কৃতি (Context and Culture)	এই বিষয়টি প্রযুক্তিকে শিক্ষক শিক্ষার পাঠ্যক্রমে অনুপ্রবেশ করানোর জন্য সংস্কৃতি এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলিকে চিহ্নিত করে থাকে। এই বিষয়টি সঠিকভাবে প্রযুক্তির ব্যবহারকে ত্বরান্বিত করে এবং শিক্ষকদের সঠিকভাবে শিক্ষাপ্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় একাধিক সংস্কৃতির মধ্যে সমন্বয় সাধন করে থাকে।
নেতৃত্ব ও ভিশন (Leadership and Vision)	শিক্ষক শিক্ষায় একটি সফল পরিকল্পনা এবং প্রযুক্তির বাস্তবায়নের জন্য এই বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে, শিক্ষক শিক্ষার প্রতিষ্ঠান গুলির নেতৃত্ব ও সমর্থন উভয়ই প্রয়োজন হয়ে থাকে।
জীবনব্যাপী শিখন (Lifelong Learning)	শিক্ষক শিক্ষার অভিমুখকে ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে প্রযুক্তি সহায়ক শিক্ষাবিজ্ঞানগত দক্ষতার মাধ্যমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সমন্বয়সাধনের দ্বারা একটি সার্বজনীনগ্রাহ্য রূপরেখা তৈরির ক্ষেত্রে এই জীবনব্যাপী শিখন সংক্রান্ত এই বিষয়টি খুবই প্রয়োজনীয়।

পরিবর্তনের জন্য পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা গ্রহণ (Planning and Management of Change)	এটি এই রূপরেখার সর্বশেষ বিষয়। বর্তমান প্রেক্ষাপটের নিরিখে ও ক্রমপরিবর্তনশীল সমাজের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে নির্দিষ্ট সময় অন্তর আমাদের শিক্ষক শিক্ষায় প্রযুক্তিগত ধ্যান-ধারণার পরিবর্তন করতে হবে। আর এই পরিবর্তনকে সঠিকভাবে পরিচালিত করতে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

উপরিউক্ত চারটি বিষয়থিম ছাড়াও, এই রূপরেখায় আরো চারটি পারদর্শিতার ক্লাস্টার রয়েছে। সেগুলিকে নিম্নে আলোচনা করা হল —

বিষয় ও শিক্ষাবিজ্ঞান (Content and Pedagogy)	আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞান সাধারণভাবে প্রযুক্তিগত দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষকদের বিষয়ভিত্তিক নির্দেশনাদান করে থাকে এবং পাঠ্যক্রমভিত্তিক জ্ঞানের বিস্তার লাভে সাহায্য করে থাকে। এছাড়াও, সমগ্র শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়াটিকেও সঠিকভাবে পরিচালিত করতে প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে থাকে।
প্রযুক্তিগত বিষয় (Technical Issues)	এটি জীবনব্যাপী শিখন বিষয়ক একটি দৃষ্টিভঙ্গি। এর মাধ্যমে শিক্ষকরা হার্ডওয়্যার এবং সফওয়্যারের ব্যবহারের দ্বারা প্রযুক্তিগত দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে নিত্য নতুন প্রযুক্তির ধারাকে সহজেই গ্রহণ করতে পারবে।
সামাজিক বিষয় (Social Issues)	এই রূপরেখার মাধ্যমে সামাজিক বিষয়কেও গুরুত্বপ্রদান করা হয়ে থাকে। প্রযুক্তির ব্যবহার শিক্ষকদের মধ্যে অধিকার ও দায়িত্বকে সঠিকভাবে পালনের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিগত পারদর্শিতার নিরিখে এই রূপরেখায় সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিকেও অন্তর্ভুক্ত করেছে।
সহযোগিতা এবং নেটওয়ার্কিং (Collaboration and Networking)	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সহায়তায় শ্রেণীকক্ষে শিখন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে এবং শ্রেণীকক্ষের বাইরে নতুন জ্ঞান ও দক্ষতার উন্নয়নের শিক্ষকদের মধ্যে সহযোগিতামূলক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরির উদ্দেশ্যে একটি সঠিক নেটওয়ার্ক তৈরির কথা এই রূপরেখায় বলা হয়েছে।

2.3.1 ইউনেস্কো ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি-কমপিটেন্সি ফ্রেমওয়ার্ক ফর টিচার্স (UNESCO Information and Communication Technology-Competency Framework for Teachers)

ইউনেস্কো তার "UNESCO ICT-Competency Framework for Teachers" প্রতিবেদনে শ্রেণীকক্ষে আইসিটি ব্যবহারে শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় দক্ষতা বিষয়ক একটি ম্যাট্রিক্স (Matirx) বা কাঠামো

প্রবর্তন করেছে। এটি বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। এই ম্যাট্রিক্স ছয়টি বিষয় বা থিম (Theme) এবং তিনটি এ্যাপ্রোচ (Approach) নিয়ে গঠিত। সংক্ষেপে এই ম্যাটিক্সকে ICT – CFT বলা হয়। এই ম্যাটিক্সের ছয়টি থিম বিষয় ও তিনটি এ্যাপ্রোচ (Approach) কে নিম্নে আলোচনা করা হল

থিম বিষয় (Themes)
শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অনুধাবন (Understanding ICT in Education)
শিক্ষাক্রম এবং মূল্যায়ন (Curriculum and assessment)
শিক্ষাবিজ্ঞান (Pedagogy)
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (Information and Communication Technology)
সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা (Organisation and Administration)
শিক্ষকদের পেশাগত শিখন (Teachers Professional Learning)

এ্যাপ্রোচ (Approach)	
প্রযুক্তি সাক্ষরতা (Technology Literacy)	এই এ্যাপ্রোচটির প্রধান লক্ষ্য হল শিক্ষার্থী, নাগরিক ও কর্মীদের সামাজিক উন্নয়নে এবং অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতাকে উন্নত করতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে ব্যবহার করতে সাহায্য করা।
জ্ঞানীয় গভীরতা (Knowledge Deepening)	এই এ্যাপ্রোচটির প্রধান লক্ষ্য হল বাস্তব পরিস্থিতির সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের সমস্যাগুলিকে সমাধানের জন্য বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানকে ব্যবহার করার মাধ্যমে শিক্ষার্থী, নাগরিক ও কর্মীদের জ্ঞানীয় দক্ষতাকে বৃদ্ধি করা।
জ্ঞান উদ্ভাবন (Knowledge Creation)	এই এ্যাপ্রোচটির প্রধান লক্ষ্য হল শিক্ষার্থী, নাগরিক ও কর্মীদের জীবনব্যাপী শিখনের মাধ্যমে তাদের মধ্যে নতুন জ্ঞানের উন্মেষ ঘটানো যার দ্বারা বাস্তব পরিস্থিতিতে তারা নিজেদের সঠিকভাবে পরিচালিত করতে পারে।

2.3.2 শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং ব্যবহার সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গিসমূহ (Approaches in Adoption and Use of ICT in Education)

শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং ব্যবহার সংক্রান্ত চার ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি বর্তমান। সেইগুলিকে নিম্নে বর্ণনা করা হল—

A. উদীয়মান দৃষ্টিভঙ্গি (Emerging Approach) :

শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে উচ্চপ্রতিষ্ঠানগুলিতে উদীয়মান দৃষ্টিভঙ্গির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এই প্রাথমিক পর্যায়ে, প্রশাসক এবং শিক্ষকরা উচ্চতর প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করার এবং পাঠক্রমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে সংযুক্ত করার সম্ভাবনা অন্বেষণ করে থাকেন। যদিও, এই উদীয়মান দৃষ্টিভঙ্গিতে, উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এখনও প্রথাগত ও শিক্ষক-কেন্দ্রিক অনুশীলনকেই দৃঢ়ভাবে ভিত্তি করে থাকে। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে, পাঠক্রমের মৌলিক দক্ষতাকে আরো বৃদ্ধি করতে শিক্ষকরা প্রাথমিক পর্যায়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার করে থাকে।

B. প্রয়োগমূলক দৃষ্টিভঙ্গি (Applying Approach) :

যে সমস্ত উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অবদান সম্পর্কে একটি নতুন উপলব্ধি তৈরি হয়েছে তারাই এই দৃষ্টিভঙ্গিকে ব্যবহার করে থাকে। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে, প্রশাসক এবং শিক্ষকরা উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা এবং পাঠক্রমের বিকাশের জন্য ইতিমধ্যেই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার করে থাকেন। প্রয়োগমূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে, বিদ্যালয়গুলি নির্দিষ্ট সরঞ্জাম এবং সফওয়্যারসহ বিভিন্ন বিষয়ের ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানোর জন্য পাঠ্যক্রমের পরিবর্তন করে থাকে।

C. প্রবিষ্টকারী দৃষ্টিভঙ্গি (Infusing Approach) :

এই দৃষ্টিভঙ্গিতে, উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি পাঠক্রমের বিকাশের পাশাপাশি ল্যাবরেটরি, শ্রেণীকক্ষ এবং প্রশাসনিক অফিসগুলিতে কম্পিউটার-ভিত্তিক প্রযুক্তির একটি পরিবেশ তৈরি করে থাকে। শিক্ষকরা এই দৃষ্টিভঙ্গিতে, নতুন উপায় অন্বেষণ করে থাকে যার দ্বারা তারা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে তাদের ব্যক্তিগত উৎপাদনশীলতা এবং পেশাদার অনুশীলনকে আরো ত্বরান্বিত করে থাকে।

D. রূপান্তরকারী দৃষ্টিভঙ্গি (Transforming Approach) :

এই দৃষ্টিভঙ্গিতে, উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে সৃজনশীল উপায়ে প্রতিষ্ঠানকে পুনর্বিবেচনা ও পুনর্নবীকরণ করে থাকে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে পাঠক্রমকে আরো শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক এবং বাস্তব পরিবেশের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলিকে পাঠক্রমে স্থান দেওয়া হয়ে থাকে।

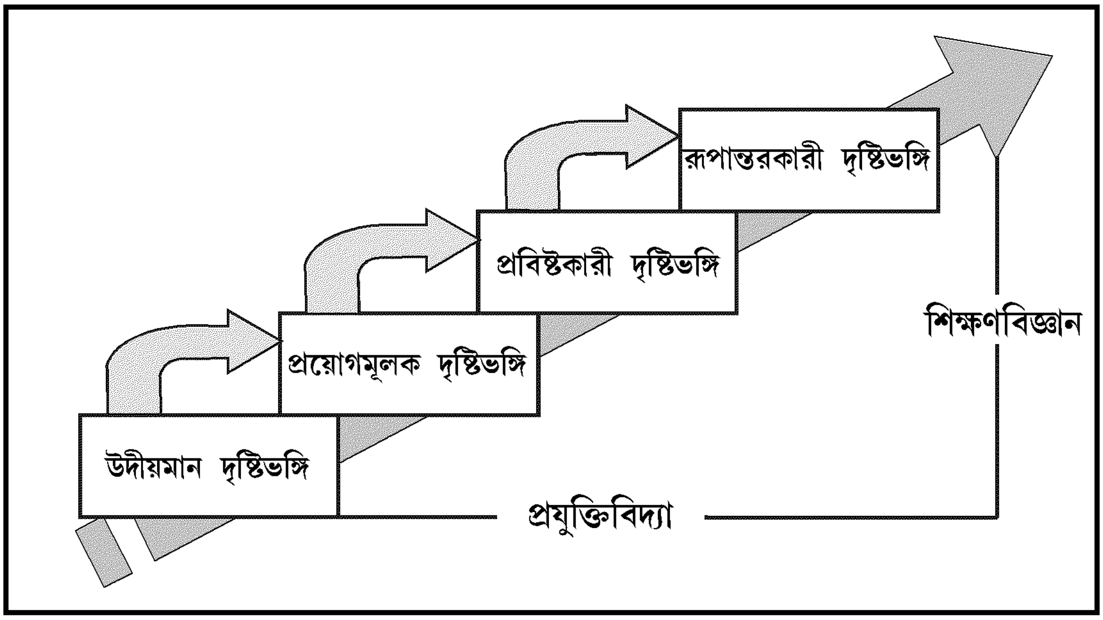

Figure-3

দৃষ্টিভঙ্গি	বৈশিষ্ট্যসমূহ
উদীয়মান দৃষ্টিভঙ্গি	● প্রাথমিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিগত দক্ষতার শিখনে এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিগত উপাদানগুলির চিহ্নিতকরণের ওপর বেশি জোর দিয়ে থাকে। ● তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিগত বিভিন্ন সরঞ্জাম এবং অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করতে শেখার ওপর এবং তাদের ভবিষ্যত শিক্ষাদানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিগত সম্ভাব্যতা সম্পর্কে সচেতনতা প্রদান করে থাকে। ● এই দৃষ্টিভঙ্গিতে, শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিগত টুলস সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে থাকে এবং সেইগুলি কীভাবে কাজ করে এবং কীভাবে ব্যবহার করা হয় সেই সম্পর্কে জ্ঞান প্রদান করে থাকে।
প্রয়োগমূলক দৃষ্টিভঙ্গি	● পাঠক্রমের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানোর জন্য ও শিক্ষাদানে নির্দিষ্ট সফওয়্যার সরঞ্জামগুলি প্রয়োগ করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান প্রদান করে থাকে।
প্রবিষ্টকারী দৃষ্টিভঙ্গি	● এই দৃষ্টিভঙ্গিতে, উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে আরো ভালোভাবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করা হয়ে থাকে।

দৃষ্টিভঙ্গি	বৈশিষ্ট্যসমূহ
	● শিক্ষকেরা তাদের পেশাগত জীবনের সকল ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে অন্তর্ভুক্তিকরণের দ্বারা তাদের শিক্ষার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের শিখনের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করা হয়ে থাকে।
রূপান্তরকারী দৃষ্টিভঙ্গি	● তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে শ্রেণীকক্ষের শিক্ষা কার্যক্রমকে পরিচালিত করা। ● তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে সৃজনশীল উপায়ে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্থার পুনর্বিবেচনা এবং পুনর্নবীকরণের জন্য ব্যবহৃত করা। ● তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে গড়ে তোলা।

2.4 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহারের পর্যায় (Stages of ICT Usage)

শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়াতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে আমরা চারটি স্তরের কথা উল্লেখ করে থাকি (মজুমদার, 2013)। সেইগুলি হল—

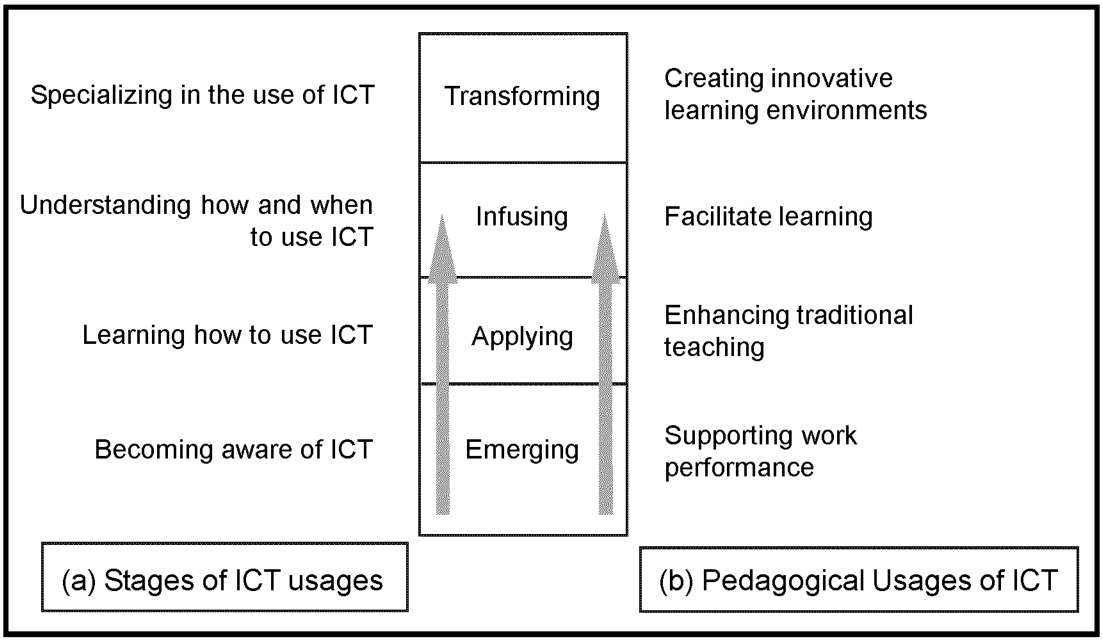

Figure-4

পর্যায় 1 : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পর্কে সচেতনতা (Stage 1 : Becoming aware of ICT) :

প্রাথমিক পর্যায়ে, শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিগত সরঞ্জাম এবং তাদের সাধারণ কাজ এবং ব্যবহার সম্পর্কে সচেতনতা লাভ করে থাকে। এই পর্যায়ে, সাধারণত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিগত সাক্ষরতা এবং সেই সম্পর্কিত মৌলিক দক্ষতার ওপরেই জোর দেওয়া হয়। এই পর্যায়টি উদীয়মান দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সম্পর্কিত।

পর্যায় 2 : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি কিভাবে ব্যবহার করতে হয় তা শেখা (Stage 2 : Learning how to use ICT) :

এই পর্যায়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিগত সরঞ্জামগুলি কিভাবে ব্যবহার করতে হয় সেই সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করা হয়ে থাকে। এছাড়াও, শিক্ষাক্ষেত্রের, বিভিন্ন শাখায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিগত সরঞ্জামগুলিকে কিভাবে ব্যবহার করা হবে সেই সম্পর্কেও জ্ঞান লাভ করা হয়। এই পর্যায়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সাধারণ বা বিশেষ অ্যাপ্লিকেশনের ব্যবহার এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিগত মডেলের সাথে সম্পর্কিত। এই পর্যায়টি প্রয়োগমূলক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সম্পর্কিত।

পর্যায় 3 : কীভাবে এবং কখন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে ব্যবহার করতে হবে তা অনুধাবন করা (Stage 3 : Understanding how and when to use ICT) :

এই পর্যায়ে, একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য, যেমন একটি প্রদত্ত প্রকল্প সম্পূর্ণ করার জন্য কীভাবে এবং কখন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে ব্যবহার করতে হবে সেই সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা হয়। এই পর্যায়ে, শিক্ষণ-শিখন সম্পর্কিত নির্দিষ্ট বিষয়গুলিকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করার জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে সঠিকভাবে নির্বাচন ও বাস্তব সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে সঠিকভাবে ব্যবহার করার জন্য তথ্য প্রদান করা হয়ে থাকে। এই পর্যায়টি প্রবিষ্টকারী দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সম্পর্কিত।

পর্যায় 4 : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উচ্চ-পর্যায়ে ব্যবহার (Stage 4 : Specializing in the use of ICT) :

এটি শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়াতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে ব্যবহারের শেষ পর্যায়। এই পর্যায়ে, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিগত সরঞ্জামগুলিকে সঠিকভাবে ব্যবহারের দ্বারা আরো বিশেষ ধরনের পরিস্থিতি তৈরি করে শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া পরিচালিত করা হয়। এই পর্যায়টি রূপান্তরকারী দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সম্পর্কিত।

2.5 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির শিক্ষাবৈজ্ঞানিকগত ব্যবহার (Pedagogical Usages of ICT)

মজুমদার (2013)-এর মতে, শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়াতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির শিক্ষাবৈজ্ঞানিকগত ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে আমরা চারটি স্তরের কথা উল্লেখ করে থাকি। সেইগুলি হল—

পর্যায় 1 : কর্মদক্ষতামূলক সহায়তা (Stage 1 : Supporting Work Performance) :

প্রাথমিক পর্যায়ে, শিক্ষকরা তাদের দৈনন্দিন কাজের কর্মদক্ষতাকে বৃদ্ধি করার জন্য ওয়ার্ড প্রসেসর, ভিজ্যুয়াল প্রেজেন্টেশন সফওয়্যার, স্প্রেডশিট, ডাটাবেস, ইমেল ইত্যাদির মতো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিগত সরঞ্জামগুলি ব্যবহার করেন থাকেন। এই পর্যায়ে, সাধারণত অফিস সফওয়্যারগুলির মৌলিক ক্রিয়াকলাপের উপর বেশি জোর দেওয়া হয়। এই পর্যায়টি উদীয়মান দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সম্পর্কিত।

পর্যায় 2 : শিক্ষণের মানোন্নয়ন (Stage 2 : Enhancing Teaching) :

এই পর্যায়ে, বিভিন্ন ধরনের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিগত সফটওয়্যারগুলিকে ব্যবহার করে এবং কম্পিউটার সহায়ক নির্দেশনা পদ্ধতি অবলম্বন করে শিক্ষণের মনোন্নয়ন করা হয়ে থাকে। এই পর্যায়টি নির্দেশনামূলক প্রক্রিয়ার অন্তর্গত কম্পিউটার-ভিত্তিক শিক্ষণ কৌশলকে শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যবহারের সাথে সম্পর্কিত। এই পর্যায়টি তথ্য ও যোগাযোগ প্রক্রিয়ার প্রয়োগমূলক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সম্পর্কিত।

পর্যায় 3 : শিখনকে ত্বরান্বিত করা (Stage 3 : Facilitating Learning) :

এই পর্যায়ে, শিক্ষার্থীদের শিখন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে বিভিন্ন ধরনের নির্দেশমূলক সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই পর্যায়ের মূল বিষয়টি হল, শিক্ষকদের শিখতে হবে কিভাবে একটি নির্দিষ্ট কাজের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিগত টুল নির্বাচন করতে হয় এবং বাস্তব জীবনের সমস্যা সমাধানের জন্য এই টুলগুলিকে একত্রিত করে কিভাবে ব্যবহার করতে হয়। এই পর্যায়টি প্রবিষ্টকারী দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সম্পর্কিত।

পর্যায় 4 : উদ্ভাবনী শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করা (Stage 4 : Creating Innovative Learning Environments) :

এটি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির শিক্ষাবৈজ্ঞানিকগত ব্যবহারের শেষ পর্যায়। এই পর্যায়ে, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিগত ধারণার সমন্বয়ে একটি শিখন পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা করা হয়। এই পর্যায়ে, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিগত টুলগুলিকে সঠিক ভাবে ব্যবহারের দ্বারা শিক্ষার্থীদের শিখন প্রক্রিয়াকে আরো ত্বরান্বিত করা হয়ে থাকে। শিক্ষকরাও তাদের পেশাগত সামর্থ্যকে এই সমস্ত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিগত টুলগুলিকে ব্যবহারের দ্বারা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়। এই পর্যায়টি রূপান্তরকারী দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সম্পর্কিত।

2.6 শিক্ষকের সামর্থ্য : বিষয়বস্তু, শিক্ষণবিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির একীভূতকরণ (Teacher Competencies : Integration of Content, Pedagogy and Technology)

শিক্ষকদের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিগত সামর্থ্যগুলিকে আমরা দুটি ভাগে ভাগ করতে পারি।

ক. শিক্ষণবিজ্ঞানমূলক সামর্থ্য (Pedagogical Competency) :

এই ধরনের সামর্থ্যগুলি হল —

- সুষ্ঠুভাবে পাঠ পরিকল্পনা প্রস্তুত করা
- নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পাদনযোগ্য শ্রেণিকক্ষ নির্বাচন করা
- শিক্ষার্থীকেন্দ্রিকতা বজায় রাখা
- বিভিন্ন শিক্ষণনীতির জন্য বিভিন্ন পন্থায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে ব্যবহার করা
- অধি-শিখন ও অধি-বোধন সম্পর্কে জ্ঞান

খ. প্রযুক্তিমূলক সামর্থ্য (Technological Competency) :

এই ধরনের সামর্থ্যগুলি হল -

- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিষয়ভিত্তিক নানামুখী কৌশল আয়ত্ত করা
- ওয়েব নির্ভর কনটেন্ট তৈরি করা
- প্রজেক্টরে ভিডিও প্রদর্শনের সক্ষমতা
- পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার
- সঠিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিগত সাধনী নির্বাচন

2.6.1 প্রযুক্তিগত সমন্বয় (Technological Integration)

উইকিপিডিয়ার মতে, প্রযুক্তিগত সমন্বয় বলতে শিক্ষাক্ষেত্রের বিভিন্ন স্তরে প্রযুক্তি সম্বলিত টুলের ব্যবহার করাকে বোঝানো হয়। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা কম্পিউটার ও প্রযুক্তিগত দক্ষতাগুলিকে কাজে লাগিয়ে তাদের শিখন প্রক্রিয়াকে পরিচালিত করতে ও বিষয়ভিত্তিক সমস্যার সমাধান করতে পারবে। এই প্রযুক্তিগত সমন্বয়ের দ্বারা শিক্ষার্থীরা খুব সহজ, সরল ও অর্থবহ উপায়ে কম্পিউটার ব্যবহারের দক্ষতাগুলি সম্পর্কে শিখতে পারে ও কোন পরিস্থিতিতে সেইগুলিকে প্রয়োগ করবে তাও জানতে পারে। সাধারণ অর্থে, প্রযুক্তিগত রিসোর্সগুলির মধ্যে সংযোগ স্থাপনই হল প্রযুক্তিগত সমন্বয়।

অন্যভাবে বলে বলা যায় যে, প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যবহারের দ্বারা সাহায্য শিক্ষা সংক্রান্ত পরিমণ্ডলকে ত্বরান্বিত ও বর্ধিত করার প্রক্রিয়াকে প্রযুক্তিগত সমন্বয় বলা হয়ে থাকে। শিক্ষার পরিমণ্ডলকে বর্ধিতকরণের জন্য শিক্ষার্থীদের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও প্রযুক্তিগত প্রাসঙ্গিকতা অর্জন করার সুযোগ প্রদান করতে হবে অন্যথায় তারা এই প্রযুক্তিগত দক্ষতাকে সঠিক ভাবে কাজে লাগাতে পারবে না। আর এটা শুধুমাত্র ইন্টারনেটের মাধ্যমেই করা যেতে পারে। ইন্টারনেটের ব্যবহার সম্পর্কে একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে যে শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবিষয় সম্পর্কিত কোনো নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার তথ্য পেতে ও তাদের প্রকৃত উৎস সম্পর্কে সন্ধান পেতে ইন্টারনেট সাহায্য করে থাকে। গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থায় লক্ষ্য করা গেছে যে, আমাদের পাঠ্যবিষয়ের বিষয়বস্তু অনেকসময় পুরানো তথ্য প্রদান করে থাকে। কিন্তু ইন্টারনেটের মাধ্যমে যে কোন বিষয়ের যে কোন টপিক সংক্রান্ত সাম্প্রতিক তথ্য আমরা নিমেষের মধ্যেই পেয়ে থাকি।

প্রযুক্তিগত সমন্বয় শ্রেণীকক্ষের মধ্যেও শ্রেণী নির্দেশাবলী সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যে বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে থাকে। এর ফলে শিক্ষার্থীরা পেপার-পেন্সিলের পরিবর্তে কম্পিউটারের উপর ভিত্তি করে তাদের নিয়মিত শিখন সম্পর্কিত কাজগুলি করে থাকে। কম্পিউটার গ্রাফিক্স এবং অন্যান্য কার্যাবলী শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতাকে উন্মোচিত করতে সাহায্য করে থাকে। প্রযুক্তিগত সমন্বয় শুধুমাত্র কম্পিউটারের সাহায্যেই করা যায় না। এক্ষেত্রে, অন্যান্য প্রযুক্তিগত ডিভাইসেরও সহায়তা নেওয়া হয়ে থাকে।

International Society for Technology in Education (ISTE)-এর মতে, কার্যকরী প্রযুক্তিগত সমন্বয় তখনই অর্জন করা সম্ভব যখন শিক্ষার্থীরা প্রযুক্তিগত টুলগুলিকে সঠিকভাবে নির্বাচন করে তাদের প্রয়োজন অনুসারে বিষয়ভিত্তিক তথ্যকে অনুসন্ধান করে সেগুলিকে সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ করতে পারবে এবং সুন্দরভাবে সেইগুলিকে উপস্থাপন করতে পারবে।

2.6.2 প্রযুক্তিগত সমন্বয়ের রূপরেখা (Frameworks for Technological Integration)

প্রযুক্তিগত সমন্বয়ের ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত দুটি মডেল ব্যবহার করে থাকি। সেইগুলি হল—

- সাবসটিটিউশন — অগমেনটেশন — মডিফিকেশন — রিডেফিনিশন মডেল (Substitution Augmentation Modification Redefinition Model)
- প্রযুক্তিগত শিক্ষাবিজ্ঞানভিত্তিক বিষয়গত জ্ঞান সম্পর্কিত মডেল (Technological Pedagogical Content Knowledge Model)

ক. সাবসটিটিউশন — অগমেনটেশন — মডিফিকেশন — রিডেফিনিশন মডেল (Substitution Augmentation Modification Redefinition Model) :

2006 সালে ডঃ রুবেন পুয়েন্তেদুরা (Dr. Ruben Puentedura) এই মডেলটি তৈরি করেন। কি ভাবে প্রযুক্তি শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে সেই বিষয়টিকে

এই মডেলে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এই মডেলটিতে প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া কতখানি উপকৃত হয়েছে সেই বিষয়টিকেও দেখানো হয়েছে। এই মডেলের দ্বারা শিক্ষক মহাশয় শ্রেণীকক্ষে ব্যবহৃত প্রযুক্তির পরিমাপ ও মূল্যায়ন করতে পারেন। SAMR-এর সম্পূর্ণ অর্থ হল Substitution, Augmentation, Modification ও Redefinition। এইগুলি শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ায় প্রযুক্তি সমন্বয়ের ক্ষেত্রে চারটি ভিন্ন মাত্রায় প্রতিনিধিত্ব করে থাকে।

পরিবর্ধন (Enhancement)	**অনুকল্পন (Substitution)**	কম্পিউটার ব্যবহারের পূর্বে যে ভাবে কার্যগুলিকে সম্পাদন করা হত ঠিক একই ভাবে প্রযুক্তির ব্যবহারের দ্বারা ওই ধরনের কার্যগুলিকে সম্পাদন করা হয়ে থাকে।
	প্রসারণ (Augmentation)	প্রযুক্তি সাধারণ কার্যগুলিকে সম্পাদন করার জন্য একটি কার্যকর ও সক্রিয় টুল প্রদান করে থাকে যার দ্বারা ওই কার্যগুলিকে সঠিক অভিমুখে প্রসারিত করানো যায়।
পরিবর্তন (Transformation)	**পরিমার্জন (Modification)**	প্রযুক্তি শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যগুলিকে বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তিগত টুলের সহায়তায় আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে পরিমার্জন করতে একটি সুনির্দিষ্ট প্লাটফর্ম প্রদান করে থাকে।
	পুনঃসংজ্ঞায়িতকরণ (Redefinition)	পুনঃসংজ্ঞায়িতকরণ প্রযুক্তি অতীতের বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক বিষয়বস্তুগুলির সঠিকভাবে পুনঃসংজ্ঞায়িতকরণের জন্য সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রদান করে থাকে।

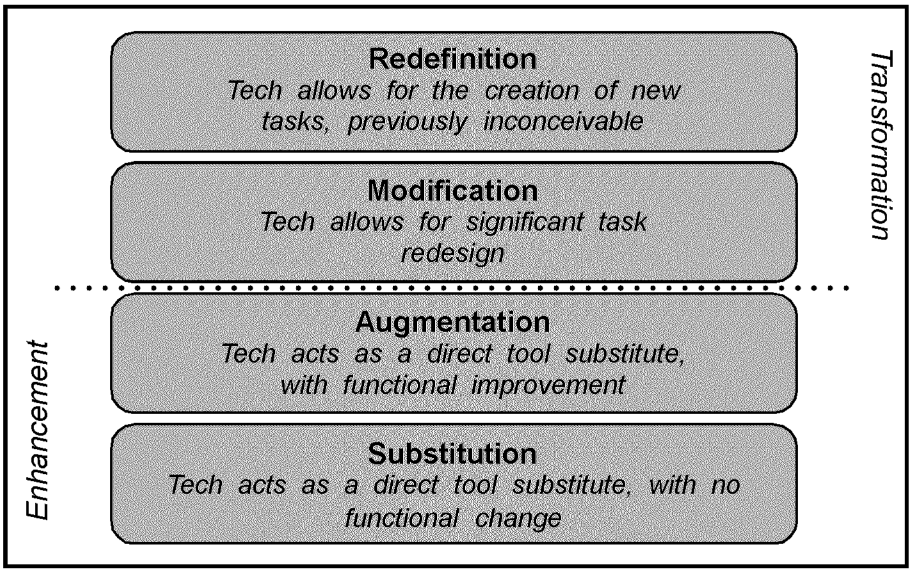

Figure-5

খ. প্রযুক্তিগত শিক্ষণবিজ্ঞানভিত্তিক বিষয়গত জ্ঞান সম্পর্কিত মডেল (Technological Pedagogical Content Knowledge Model) :

প্রযুক্তি নির্ভর শিখন পরিবেশে শিক্ষকদের কার্যকর উপায়ে শিক্ষণবিজ্ঞানের চর্চা করার জন্য যেসব জ্ঞান বা দক্ষতার প্রয়োজন তা নিয়েই গঠিত হয়েছে প্রযুক্তি শিক্ষাবিজ্ঞানভিত্তিক বিষয়গত জ্ঞান (Technology Pedagogical Content Knowledge) সম্পর্কিত মডেল। যাকে সংক্ষেপে টিপ্যাক ফ্রেমওয়ার্ক (TPACK Framework) বলা হয়। ১৯৮৬ সালে লী সুলমনের (Lee Shulman) সর্বপ্রথম শিক্ষণবিজ্ঞানভিত্তিক বিষয়গত জ্ঞান (Pedagogical Content Knowledge)-এর ধারণা বর্ণনা করেন। এরপর এই মূল ধারণার ওপর নির্ভর করে Technology বা প্রযুক্তির সংযুক্তির মাধ্যমে TPACK-এর ধারণা গঠিত হয়। মূলত মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পূণ্য মিশ্র (Punya Mishra) ও ম্যাথু জেঙ কোহেলার (Matthew J. Koehler) এই ধারণার ওপর অনেক কাজ করেন।

TPACK মডেল অনুসারে কোন সুনির্দিষ্ট বিষয়বস্তু বা বিষয়ের সাথে কার্যকর প্রযুক্তির সমন্বয়ের জন্য প্রয়োজন প্রযুক্তি (Technology), শিক্ষণবিজ্ঞান (Pedagogy) এবং বিষয়বস্তু (Content) এই তিনটি বিষয়ের ধারণা এবং এই উপাদানগুলোর মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্কের বোধগম্যতা। একজন শিক্ষককে এই উপাদানগুলোর সাথে এমনভাবে সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে যেন তিনি একইসাথে বিষয়বস্তুর বিশেষজ্ঞ, প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ এবং শিক্ষা বিশেষজ্ঞ হিসেবে সবগুলো উপাদানের সমন্বয় সাধন করতে পারেন। এই মডেলটি বিষয়বস্তু, শিক্ষাবিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি জ্ঞানের মধ্যেকার জটিল সম্পর্কটিকেই প্রাধান্য দেয় এবং মূলত এটি একটি ব্যবহার উপযোগী মডেল যা ব্যাখ্যা করে একজন শিক্ষককে শ্রেণিকক্ষে কার্যকর প্রযুক্তি সমন্বয়ের জন্য কি জানতে হবে।

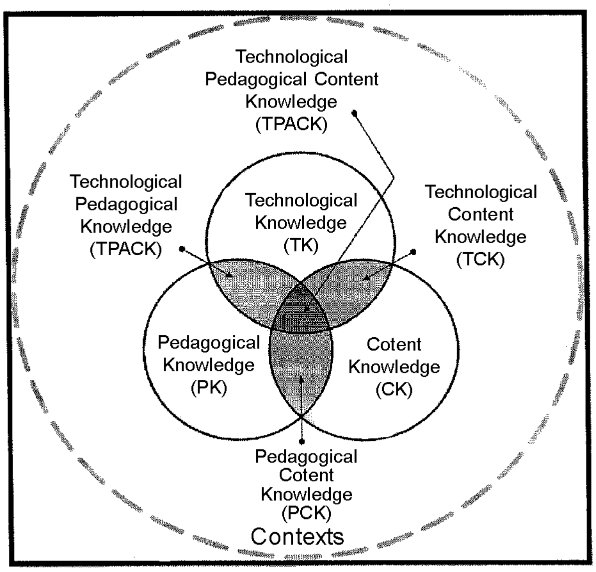

Figure-6

TPACK মডেলের সাতটি উপাদানকে নিম্নে আলোচনা করা হল—

বিষয়গত জ্ঞান (Content Knowledge)	কোন বিষয় সম্পর্কে লব্ধ জ্ঞানকেই ওই বিষয়ের সাপেক্ষে বিষয়গত জ্ঞান বলা হয়ে থাকে। এই জ্ঞান শিক্ষকদের সঠিকভাবে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষণে সাহায্য করে থাকে।
শিক্ষাবিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞান (Pedagogical Knowledge)	শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদান প্রক্রিয়াকে সহজ ও সরলভাবে পরিচালিত করার জন্য শিক্ষকের যে জ্ঞানের প্রয়োজন হয় তাকে শিক্ষাবিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞান বলা হয়ে থাকে। এই জ্ঞান শিক্ষককে শ্রেণীকক্ষের যাবতীয় কর্মগুলিকে সঠিকভাবে সম্পাদনের জন্য সাহায্য করে থাকে।
প্রযুক্তিগত জ্ঞান (Technology Knowledge)	প্রযুক্তি সহায়ক বিভিন্ন কৌশল, প্রক্রিয়া ও উপকরণের সঠিক ব্যবহার সংক্রান্ত জ্ঞানই হল প্রযুক্তিগত জ্ঞান। এর সাহায্যেই আমরা প্রযুক্তিগত ধারণাকে আমাদের শিক্ষণ শিখন প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করে থাকি।
শিক্ষাবিজ্ঞানভিত্তিক বিষয়গত জ্ঞান (Pedagogical Content Knowledge)	সুলমনের শিক্ষাবিজ্ঞানভিত্তিক বিষয়গত ধারণাটিকেই এখানে তুলে ধরা হয়েছে। সুলমনের মতানুসারে, এই ধরনের জ্ঞান শিক্ষকদের বিষয়বস্তু সংক্রান্ত ব্যাখ্যা প্রদানে ও উপস্থাপনে সাহায্য করে থাকে। এছাড়া, এই জ্ঞান নির্দেশমূলক উপাদানগুলিকে সংযোজন ও বিয়োজনের দ্বারা শিক্ষার্থীদের শিখন সংক্রান্ত অভিজ্ঞতাকে বৃদ্ধি করতে থাকে। শিক্ষণ, শিখন, পাঠ্যক্রম ও মূল্যায়নের বিষয়গুলি এই জ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত।
প্রযুক্তিভিত্তিক বিষয়গত জ্ঞান (Technological Content Knowledge)	প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও বিষয়বস্তুগত জ্ঞানের মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে এই ধরনের জ্ঞানের উন্মেষ ঘটে। এক্ষেত্রে, শিক্ষকদের বিষয়বস্তুগত জ্ঞানকে প্রযুক্তিগত সহায়তার দ্বারা সঠিকভাবে কাজে লাগানোর জন্য নির্দিষ্ট দক্ষতার প্রয়োজন হয়ে থাকে। তাছাড়া, বিষয়ভিত্তিক কার্যপদ্ধতিকে পরিচালনা করার জন্যও বিশেষ প্রযুক্তিগত দক্ষতার দরকার। কি ধরনের প্রযুক্তি কি ধরনের বিষয় শিক্ষণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সেই সম্পর্কেও এই জ্ঞান আমাদের সাহায্য করে থাকে।

প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষাবিজ্ঞানগত জ্ঞান (Technological Pedagogical Knowledge)	শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদান প্রক্রিয়াকে সঠিকভাবে পরিচালিত করতে আমাদের শিক্ষা শিক্ষাবিজ্ঞানগত জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। কিন্তু আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায়, প্রযুক্তিগত সহায়তার দ্বারা শিক্ষাবিজ্ঞানগত জ্ঞানকে খুব সহজেই শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রযুক্তিগত দক্ষতা শিক্ষাপদ্ধতিগত সামর্থ্যকে বোধগম্য করতে সাহায্য করে থাকে। এছাড়া, এই জ্ঞান যথাযথভাবে শিক্ষাপদ্ধতির সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন কৌশলগুলির মধ্যেও সম্পর্ক স্থাপন করে থাকে।
প্রযুক্তিগত শিক্ষাবিজ্ঞানভিত্তিক বিষয়গত জ্ঞান (Technological Pedagogical Content Knowledge)	প্রযুক্তিবিদ্যার সহায়তায় অর্থবহ ও দক্ষতাপূর্ণ শিক্ষণের ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত শিক্ষাবিজ্ঞানভিত্তিক বিষয়গত জ্ঞান হল তিনটি ভিন্ন প্রকার ধারণার যথা বিষয়গত জ্ঞান (Content Knowledge), শিক্ষাবিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞান (Pedagogical Knowledge) ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান (Technology Knowledge) একত্রিত রূপ। যদিও প্রযুক্তিগত শিক্ষাবিজ্ঞানভিত্তিক বিষয়গত জ্ঞান প্রযুক্তিগত শিক্ষণ পদ্ধতির মূলভিত্তি তবুও এই ধরনের জ্ঞানকে শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ায় ব্যবহারের জন্য প্রযুক্তিগত দক্ষতার প্রয়োজন হয়। এই জ্ঞান শিক্ষাবিজ্ঞান সংক্রান্ত কৌশলগুলির সহায়তায় প্রযুক্তিবিদ্যার গঠনমূলক পদ্ধতিকে কাজে লাগিয়ে বিষয়বস্তুকে পরিবেশন করে থাকে।

2.7 সারসংক্ষেপ (Summary)

প্রযুক্তি সহায়ক শিক্ষণবিজ্ঞান হল শিখন পরিবেশকে উন্নত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন শিক্ষণ প্রদানকারী কৌশলের সাথে প্রযুক্তির সমন্বয় সাধন। তথ্য ব্যাপ্তিকরণ বা তথ্যবিস্তারের উদ্দেশ্যে তথ্যের স্বাচ্ছন্দতা ও সুস্পষ্টতাকে সর্বাধিক কার্যকরী করে তোলার জন্য শিখন পরিবেশ তৈরি করতে বিভিন্ন বাধা সৃষ্টিকারী বিষয়গুলির সম্পূর্ণ অর্থবহ স্বীকৃতি প্রয়োজন। প্রযুক্তি সহায়ক শিক্ষণবিজ্ঞান এই বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করে থাকে। এটি শিখন পরিস্থিতি সংক্রান্ত একটি নকশা তৈরি করতে এবং শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্যকে বিশেষভাবে তুলে ধরতে সাহায্য করে থাকে। এটি শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ কার্যকরী পদ্ধতি যা শিখনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে থাকে।

ইউনেস্কো তার “UNESCO ICT-Competency Framework for Teachers” প্রতিবেদনে শ্রেণীকক্ষে আইসিটি ব্যবহারে শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় দক্ষতা বিষয়ক একটি ম্যাট্রিক্স (Matirx) বা কাঠামো

প্রবর্তন করেছে। এটি বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। এই ম্যাট্রিক্স ছয়টি বিষয় বা থিম (Theme) এবং তিনটি এ্যাপ্রোচ (Approach) নিয়ে গঠিত।

শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং ব্যবহার সংক্রান্ত চার ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি বর্তমান। সেইগুলি হল উদীয়মান দৃষ্টিভঙ্গি (Emerging Approach), প্রয়োগমূলক দৃষ্টিভঙ্গি (Applying Approach), প্রবিষ্টকারী দৃষ্টিভঙ্গি (Infusing Approach) এবং রূপান্তরকারী দৃষ্টিভঙ্গি (Transforming Approach)।

শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়াতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে আমরা চারটি স্তরের কথা উল্লেখ করে থাকি (মজুমদার, 2013)। সেইগুলি হল - তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পর্কে সচেতনতা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি কিভাবে ব্যবহার করতে হয় তা শেখা, কীভাবে এবং কখন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে ব্যবহার করতে হবে তা অনুধাবন করা এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উচ্চ পর্যায়ে-ব্যবহার। এছাড়াও, মজুমদার (2013)-এর মতে, শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়াতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির শিক্ষাবৈজ্ঞানিকগত ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে আমরা চারটি স্তরের কথা উল্লেখ করে থাকি। সেইগুলি হল - পর্যায় 1 : কর্মদক্ষতামূলক সহায়তা, শিক্ষণের মানোন্নয়ন, শিখনকে ত্বরান্বিত করা এবং উদ্ভাবনী শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করা।

প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যবহারের দ্বারা সাহায্য শিক্ষা সংক্রান্ত পরিমণ্ডলকে ত্বরান্বিত ও বর্ধিত করার প্রক্রিয়াকে প্রযুক্তিগত সমন্বয় বলা হয়ে থাকে। শিক্ষার পরিমণ্ডলকে বর্ধিতকরণের জন্য শিক্ষার্থীদের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও প্রযুক্তিগত প্রাসঙ্গিকতা অর্জন করার সুযোগ প্রদান করতে হবে অন্যথায় তারা এই প্রযুক্তিগত দক্ষতাকে সঠিক ভাবে কাজে লাগতে পারবে না। আর এটা শুধুমাত্র ইন্টারনেটের মাধ্যমেই করা যেতে পারে। ইন্টারনেটের ব্যবহার সম্পর্কে একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে যে শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবিষয় সম্পর্কিত কোনো নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার তথ্য পেতে ও তাদের প্রকৃত উৎস সম্পর্কে সন্ধান পেতে ইন্টারনেট সাহায্য করে থাকে। গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থায় লক্ষ্য করা গেছে যে, আমাদের পাঠ্যবিষয়ের বিষয়বস্তু অনেকসময় পুরানো তথ্য প্রদান করে থাকে। কিন্তু ইন্টারনেটের মাধ্যমে যে কোন বিষয়ের যে কোন টপিক সংক্রান্ত সাম্প্রতিক তথ্য আমরা নিমেষের মধ্যেই পেয়ে থাকি। International Society for Technology in Education (ISTE)-এর মতে, কার্যকরী প্রযুক্তিগত সমন্বয় তখনই অর্জন করা সম্ভব যখন শিক্ষার্থীরা প্রযুক্তিগত টুলগুলিকে সঠিকভাবে নির্বাচন করে তাদের প্রয়োজন অনুসারে বিষয়ভিত্তিক তথ্যকে অনুসন্ধান করে সেগুলিকে সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ করতে পারবে এবং সুন্দরভাবে সেইগুলিকে উপস্থাপন করতে পারবে। প্রযুক্তিগত সমন্বয়ের ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত দুটি মডেল ব্যবহার করে থাকি। সেইগুলি হল — সাবসটিটিউশন — অগমেনটেশন — মডিফিকেশন — রিডেফিনিশন মডেল এবং প্রযুক্তিগত শিক্ষাবিজ্ঞানভিত্তিক বিষয়গত জ্ঞান সম্পর্কিত মডেল।

2.8 প্রশ্নাবলি (Questions)

1. প্রযুক্তি সহায়ক শিক্ষণবিজ্ঞান বলতে কি বোঝ?
2. শিক্ষাক্ষেত্রের যেসব ক্ষেত্রে প্রযুক্তি সহায়ক শিক্ষণবিজ্ঞান সাহায্য করে থাকে সেগুলি আলোচনা করো।
3. শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং ব্যবহার সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির বর্ণনা দাও।
4. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উদীয়মান দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্যগুলি লেখ।
5. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহারের পর্যায়গুলিকে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করো।
6. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির শিক্ষাবৈজ্ঞানিকগত ব্যবহার সম্পর্কে যা জান লেখ।
7. শিক্ষকদের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিগত সামর্থ্যগুলি কি কি?
8. প্রযুক্তিগত সমন্বয় সম্পর্কে একটি টীকা লেখ।
9. প্রযুক্তিগত শিক্ষাবিজ্ঞানভিত্তিক বিষয়গত জ্ঞান সম্পর্কিত মডেল সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করো।

2.9 তথ্যসূত্র (References)

- Mishra P, Koehler MJ. (2006) Technological pedagogical content knowledge : A framework for teacher knowledge. *Teachers College Record*, 108(6), 1017–1054.
- Koehler, Matthew J.; Mishra, Punya (2005-03-01). "What Happens When Teachers Design Educational Technology? The Development of Technological Pedagogical Content Knowledge" *Journal of Educational Computing Research*. 32(2) : 131–152.
- Schmidt DA, Baran E, Thompson AD, Mishra P, Koehler MJ, Shin TS. (2009) Technological pedagogical content knowledge (TPACK) : The development and validation of an assessment instrument for preservice teachers. *Journal of Research on Technology in Education*, 42(2), 123-149.

- Koehler, Matthew J.; Mishra, Punya; Bouck, Emily C.; DeSchryver, Michael; Kereluik, Kristen; Shin, Tae Seob; Wolf, Leigh Graves (2011). "Deep-play : developing TPACK for 21st century teachers". *International Journal of Learning Technology.* 6(2) : 146.
- Papanikolaou, Kyparisia, Makri, Katerina; Roussos, Petros (2017-09-18). "Learning design as a vehicle for developing TPACK in blended teacher training on technology enhanced learning". *International Journal of Educational Technology in Higher Education.* 14(1). doi : 10.1186/s41239-017-0072-z. ISSN 2365-9440.
- Angeli, Charoula; Valanides, Nicos; Mavroudi, Anna; Christodoulou, Andri; Georgiou, Kyriakoula (2014-10-24), "Introducing e-TPCK : An Adaptive E-Learning Technology for the Development of Teachers' Technological Pedagogical Content Knowledge", Technological Pedagogical Content Knowledge, Boston, MA : Springer US, pp. 305-317, ISBN 978-1-4899-8079-3, retrieved 2021-06-25.
- Cox, S. M. (2008). A conceptual analysis of technological pedagogical content knowledge. Graham, C. R. (2011). Theoretical considerations for understanding technological pedagogical content knowledge (TPACK). *Computers & Education*, 57(3), 1953-1960.

একক - 3 ❑ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির নতুন ধারা (New Trends in ICT)

গঠন (Structure)

3.1 উদ্দেশ্য (Objectives)

3.2 ভূমিকা (Introduction)

3.3 ভার্চুয়াল শ্রেণীকক্ষ (Virtual Classroom)

3.4 স্মার্ট শ্রেণীকক্ষ (Smart Classroom)

3.5 ব্লেন্ডেড লার্নিং বা মিশ্র শিখন (Blended Learning)

3.6 ওয়েব 2.0 সাধনী (Web 2.0 Tools)

3.7 সারসংক্ষেপ (Summary)

3.8 প্রশ্নাবলি (Questions)

3.9 তথ্যসূত্র (References)

3.1 উদ্দেশ্য (Objectives)

এই অধ্যায়টি সমাপ্ত হওয়ার পরে, শিক্ষার্থীরা —

- শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির নতুন ধারাকে ব্যবহার করতে পারবে।
- ভার্চুয়াল শ্রেণীকক্ষ ও স্মার্ট শ্রেণীকক্ষের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করবে।
- ব্লেন্ডেড লার্নিং বা মিশ্র শিখনের ধারণাটিকে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারবে।
- ই-মেইল কি এবং কিভাবে করতে হয় সেই সম্পর্কে জানবে।
- ব্লগের ধারণা ও প্রকারভেদ সম্পর্কে জানবে।
- শিক্ষাক্ষেত্রে কিভাবে উইকিমিডিয়াকে ব্যবহার করা যায় সেই সম্পর্কে অবগত হবে।
- বাংলা উইকিপিডিয়ার ব্যবহার সম্পর্কে জানবে

- উল্লেখযোগ্য সামাজিক যোগসূত্র (সোসাল নেটওয়ার্কিং)গুলি সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে।
- অনলাইন কনফারেন্সিং এবং ইন্টারনেট ফোরামের ব্যবহার সম্পর্কে জানবে।
- ই-লাইব্রেরি এবং কিছু উল্লেখযোগ্য ই-লাইব্রেরি সম্পর্কে জানবে।

3.2 ভূমিকা (Introduction)

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বলতে সাধারণভাবে তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, বিশ্লেষণ, প্রক্রিয়াকরণ, উৎপাদন ও বিস্তরণ তথা যোগাযোগের কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরণের আধুনিক প্রযুক্তিগত উপকরণকে বোঝায়। তথ্য আদান-প্রদান ও যোগাযোগের জন্য প্রতিনিয়ত নতুন নতুন প্রযুক্তি আবিস্কৃত হচ্ছে, তবে বর্তমানে বহুল ব্যবহৃত উপকরণগুলোর মধ্যে কম্পিউটার, ইন্টারনেট, মাল্টিমিডিয়া সিস্টেম, মোবাইল ফোন, রেডিও, টেলিভিশন উল্লেখযোগ্য। তথ্যপ্রযুক্তিকে শুধুমাত্র কম্পিউটারের মধ্যে সীমিত না রেখে মোবাইল ফোন, রেডিও, টেলিভিশন, নেটওয়ার্কিং কিংবা সকল তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণের ব্যপক অর্থে ব্যবহার করার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ করতে হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অন্তর্ভূক্ত করার নানাবিধ প্রয়াস দেখা যায়। বিভিন্ন দেশের সরকার তাদের নাগরিকদেরকে তথ্যপ্রযুক্তিতে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে শিক্ষাক্রমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে অন্তর্ভূক্ত করেছে। আবার তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে আকর্ষণীয় ডিজিটাল শিক্ষা উপকরণ প্রস্তুত করা যায় যার সাহায্যে শিক্ষার্থীরা সহজে ও আনন্দের সাথে শিখতে পারে।

3.3 ভার্চুয়াল শ্রেণীকক্ষ (Virtual Classroom)

ভার্চুয়াল শ্রেণীকক্ষের ধারণা (Concept of Virtual Classroom)

‘ভার্চুয়াল শ্রেণীকক্ষ’ শব্দটি তুলনামূলকভাবে নতুন একটি ধারণা এবং এই ধারণাটি শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির দ্রুত ব্যবহারকে নির্দেশ করার উদ্দেশ্যে দূরবর্তী শিক্ষা থেকে আবির্ভূত হয়েছে। যদিও এই ধারণাটি শিক্ষাক্ষেত্রে খুবই নতুন একটি ধারণা তবুও সাংগঠনিক দিক দিয়ে এটি একটি প্রচলিত বা গতানুগতিক শ্রেণীকক্ষের মৌলিক কাজগুলিকে সঠিক ভাবে পালন করতে সক্ষম হয়েছে। প্রচলিত শ্রেণীকক্ষগুলি থেকে এর পার্থক্য হল যে এই ধরনের শ্রেণীকক্ষগুলি ইন্টারনেট ও সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তির সাহায্যে পরিচালিত হয়ে থাকে। ‘ভার্চুয়াল শ্রেণীকক্ষ” শব্দটিকে বিভিন্ন ভাবে ও বিভিন্ন উপায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। ভার্চুয়াল শ্রেণীকক্ষ হল একটি শিক্ষণ-শিখন পরিবেশ যেখানে অংশগ্রহণকারীরা একক ভাবে বা দলের অন্তর্গত হয়ে শিখন সম্পদকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের মধ্যে মিথক্রিয়া করতে পারে, যোগাযোগ করতে, দেখতে এবং কোনো বিষয়কে উপস্থাপনা করে সেই সম্পর্কে আলোচনা করতে পারে। এই ধরনের

শ্রেণীকক্ষ সাধারণত ভিডিও কনফারেন্সিং অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে পরিচালিত হয় যা একাধিক ব্যবহারকারীকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে একই সময়ে সংযুক্ত করতে দেয়, যা ব্যবহারকারীদের যেকোনো স্থান থেকে অংশগ্রহণ করার সুযোগ প্রদান করে থাকে।

Aoki (1998) এর মতে, 'ভার্চুয়াল শ্রেণীকক্ষ' হল এমন একটি শ্রেণীকক্ষ যা শিক্ষার্থীদের শিখন অভিজ্ঞতা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো ও সংশ্লিষ্ট সমর্থন পরিষেবার প্রদান করে থাকে যার দ্বারা শিক্ষার্থীরা আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে অনলাইনের মাধ্যমে শিখন প্রক্রিয়াটিকে পরিচালিত করে থাকে। (Virtual Classroom is defined as the infrastructure for providing students with learning experience and related support services to complete a learning program partially or totally online.)

Mohanty (2009)-এর মতে, ভার্চুয়াল শ্রেণীকক্ষ শব্দটি একটি শ্রেণীব্যবস্থাকে নির্দেশ করে যা ইন্টারনেটের সাহায্যে একটি ভাল ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে শিক্ষা ও শেখার সুযোগ প্রদান করে থাকে এবং কম্পিউটার প্রোগ্রামিং এবং মাল্টিমিডিয়া প্রযুক্তির ব্যবহার করে কোর্স মডিউল, ইন্টারেক্টিভ টিউটোরিয়াল, অনলাইন সিমুলেশন পরিচালিত করে থাকে।

(The term 'virtual classroom' characterizes an class organization that provides education and learning opportunity through a well architected web-portal on the Internet, using computer programming and multimedia technologies to deliver course modules, interactive tutorials and online simulation).

ভার্চুয়াল শ্রেণীকক্ষের বৈশিষ্ট্যসমূহ (Characteristics of Virtual Classroom)

ভার্চুয়াল শ্রেণীকক্ষের বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

- অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের ওপর ভিত্তি করে ভার্চুয়াল শ্রেণীকক্ষের ধারণাটি নির্মিত হয়েছে।
- ভার্চুয়াল শ্রেণীকক্ষ একটি ম্যানেজমেন্ট অফিস দ্বারা পরিচালিত হয়।
- শিক্ষাগত সুযোগ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য ভার্চুয়াল শ্রেণীকক্ষকে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।
- খুব সহজে জ্ঞান ও দক্ষতাকে সকলের মধ্যে প্রসারিত করতে ভার্চুয়াল শ্রেণীকক্ষের জন্ম হয়েছে।
- সহযোগিতা, সাহায্য ও যোগাযোগ ভার্চুয়াল শ্রেণীকক্ষের উল্লেখযোগ্য উপাদান।
- ভার্চুয়াল শ্রেণীকক্ষের শিক্ষাগত কার্যপদ্ধতি দূরবর্তী শিক্ষার বিভিন্ন প্রক্রিয়া যেমন—ই-লার্নিং, অনলাইন কোর্স, ভিডিও, স্ব লার্নিং ইত্যাদির মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

ভার্চুয়াল শ্রেণীকক্ষের উপাদানসমূহ (Elements of Virtual Classroom)

- **আদান-প্রদানে নমনীয়তা (Flexibility in Delivery) :** ভার্চুয়াল শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের asynchronous and synchronous–এই দুই ধরনের আদান-প্রদান পদ্ধতির সাহায্যে তথ্যের আদান-প্রদানের অনুমতি প্রদান করা হয়ে থাকে।
- **শিক্ষার্থীদের বন্ধুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি (Learner's Friendly Technology) :** ভার্চুয়াল শ্রেণীকক্ষে যেহেতু আদান-প্রদান পদ্ধতি নমনীয় হয়, তাই যে প্রযুক্তি ব্যাবহারের মাধ্যমে তথ্যের আদান-প্রদান করা হয় সেটিও যতটা সম্ভব বন্ধুত্বপূর্ণ করার চেষ্টা করা হয়।
- **পুনঃসংজ্ঞায়িত শিক্ষাবিজ্ঞান (Redefining Pedagogy) :** আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানের সাহায্য ছাড়া কোনমতেই সঠিকভাবে শিক্ষার্থীদের কোন বিষয় সম্পর্কিত ধারণা দেওয়া সম্ভবপর নয়। শিক্ষকদের তাই শিক্ষাবিজ্ঞানকে সঠিকভাবে পুনঃসংজ্ঞায়িত করা প্রয়োজন।
- **কর্মীদের কম্পিউটার ও আইটি প্রশিক্ষণ (Computer & IT Training for Staff) :** ভার্চুয়াল পরিবেশে অভিযোজিত হওয়ার জন্য কর্মচারীদের বিশেষ ট্রেনিং প্রদান করা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করার জন্য প্রতিটি ভার্চুয়াল শ্রেণীকক্ষে দক্ষতা নিরুপনের জন্য একটি মডেল সেট তৈরি করা হয়েছে।
- **লার্নার্স সাপোর্ট সিস্টেম (Learners Support System) :** শক্তিশালী সাপোর্ট সিস্টেম ভার্চুয়াল শ্রেণীকক্ষের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। শিক্ষার্থীদের বিকাশের ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত সহায়তা শ্রেণীকক্ষের বিভিন্ন কার্যকলাপের জন্য অপরিহার্য।
- **উপযুক্ত সফওয়্যার পরিকাঠামো (Appropriate Software Infrastructure) :** ভার্চুয়াল শ্রেণীকক্ষকে সঠিকভাবে পরিচালিত করার জন্য উপযুক্ত সফটওয়্যারের প্রয়োজন হয়।
- **অ্যাসেসমেন্ট প্রক্রিয়া (Assessment Methodologies) :** দূরাগত শিক্ষার্থীদের জন্য দ্রুত শিক্ষার্থী মূল্যায়ন প্রক্রিয়া ভার্চুয়াল শ্রেণীকক্ষের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।
- **স্ব-মূল্যায়ন এবং অন্তিমকালীন মূল্যায়ন (Self-assessment and summative assessment) :** ভার্চুয়াল শ্রেণীকক্ষের প্রতিটি বিষয়েই স্ব-মূল্যায়ন এবং অন্তিমকালীন মূল্যায়নের ব্যবস্থা থাকে।

ভার্চুয়াল শ্রেণীকক্ষের শিক্ষাবৈজ্ঞানিক প্রেক্ষিত (Pedagogical Perspective for Virtual Classroom) : ভার্চুয়াল শ্রেণীকক্ষকে চারটি শিক্ষাবৈজ্ঞানিক প্রেক্ষিত থেকে বিবেচনা করা যেতে পারে—

1. **প্রজ্ঞামূলক দৃষ্টিকোণ (Cognitive perspective) :** প্রজ্ঞামূলক দৃষ্টিকোণ মস্তিষ্কের কাজের পাশাপাশি শিক্ষার প্রজ্ঞামূলক প্রক্রিয়ার ওপর গুরুত্ব প্রদান করে থাকে।

2. **আবেগপ্রবন দৃষ্টিকোণ (Emotional perspective) :** আবেগপ্রবন দৃষ্টিকোণ শিখনের আবেগপ্রবন দিকটির ওপর গুরুত্ব প্রদান করে থাকে।

3. **আচরণমূলক দৃষ্টিকোণ (Behavioural perspective) :** আচরণমূলক দৃষ্টিকোণ শিখনের দক্ষতা এবং আচরণগত ফলাফলের ওপর গুরুত্ব প্রদান করে থাকে।

4. **সামাজিক দৃষ্টিকোণ (Social perspective) :** সামাজিক দৃষ্টিকোণ শিখনের সামাজিকও দিকটির ওপর গুরুত্ব আরোপ করে যা শিখনকে পরিচালিত করতে সাহায্য করে থাকে।

ভার্চুয়াল শ্রেণীকক্ষ তৈরি করার কারণসমূহ (Reasons for creating a Virtual Classrooms)

ভার্চুয়াল শ্রেণীকক্ষ তৈরি করার কারণগুলি হল —

- প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সাথে তাল মিলিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।
- বৈচিত্র্যময় শিক্ষার চাহিদা পূরণ করার জন্য।
- শিক্ষার্থীর বৈচিত্রময় শিখন শৈলীকে সাহায্য করার জন্য।
- অত্যধিক জ্ঞানের বিস্ফোরণকে সঠিক দিকে পরিচালনা করতে।
- জ্ঞানভিত্তিক সমাজ ও অর্থনীতিকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে।
- দূরাগত শিক্ষাব্যবস্থাকে আরো সঠিক উপায়ে ত্বরান্বিত করতে। শিক্ষাক্ষেত্রে খরচের হার কমানোর উদ্দেশ্যে।

ভার্চুয়াল শ্রেণীকক্ষের সুবিধা (Advantages of Virtual Classroom) :

ভার্চুয়াল শ্রেণীকক্ষের সুবিধাগুলিকে নিম্নে বর্ণনা করা হল —

- শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের শারীরিক উপস্থিতির প্রয়োজন হয় না।
- কোন নির্দিষ্ট সময় নির্ভর শ্রেণী পরিচালিত হয় না।
- মাল্টিমিডিয়ার ব্যাবহারের দ্বারা খুব উন্নতমানের কোর্স প্রদান করা হয়।
- খুব বেশি সংখ্যক শিক্ষার্থীদের একসাথে শিক্ষাদান করা যায়।
- শিক্ষাক্ষেত্রে খরচের হার অনেক কম হয়।
- শিক্ষাগত সম্পদকে খুব সহজেই ব্যবহার করতে পারে।
- শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনলাইনের মাধ্যমে ধারাবাহিক যোগাযোগ রক্ষা করা যায়।

ভার্চুয়াল শ্রেণীকক্ষের সীমাবদ্ধতা (Limitations of Virtual Classroom) :

- ভার্চুয়াল শ্রেণীকক্ষের সীমাবদ্ধতাগুলিকে নিম্নে বর্ণনা করা হল —
- ব্যবহারিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ভার্চুয়াল শ্রেণীকক্ষের সাফল্য নেই বললেই চলে।
- শিক্ষার্থীদের অনেকসময় প্রযুক্তিগত প্রক্রিয়াটিকে বুঝতে সমস্যা হয়।
- দ্রুত প্রতিক্রিয়ার অভাব পরিলক্ষিত হয়।
- শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের শারীরিক উপস্থিতির অভাবে অনেকসময় শিক্ষার্থীদের বিষয়গত জ্ঞানটি পরিষ্কার হয় না।
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে মনোযোগের অভাব লক্ষ্য করা যায়।
- শিক্ষার্থীদের সঠিকভাবে নজরে রাখা যায় না।

3.4 স্মার্ট শ্রেণীকক্ষ (Smart Classroom)

স্মার্ট শ্রেণীকক্ষের ধারণা (Concept of Smart Classroom)

শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিতকরণে শিক্ষায় তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার অপরিহার্য। বিশ্বায়নের যুগে উন্নত দেশের সাথে তাল মিলিয়ে ভারতও শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্য-প্রযুক্তির সমন্বয় ঘটিয়েছে। শিক্ষার প্রচলিত ধারার শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতির পরিবর্তে শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতিতে তথ্য-প্রযুক্তির সংযোগ ঘটানো হয়েছে। শ্রেণি কার্যক্রমে অন্যান্য শিক্ষা উপকরণের মতো প্রযুক্তিকেও একটি শিক্ষা উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা শুরু হয়েছে, যা শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন মেটাতে সহায়তা করছে। কম্পিউটার শিক্ষা বা ল্যাবভিত্তিক বদ্ধমূল ধারণা থেকে বেরিয়ে এসে তথ্য-প্রযুক্তিকে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রমে কাজে লাগানো হচ্ছে। এক্ষেত্রে কম্পিউটার বা অন্যান্য তথ্য-প্রযুক্তি ব্ল্যাকবোর্ডের পাশাপাশি শ্রেণিকক্ষে ব্যবহৃত একটি আধুনিক শিক্ষা উপকরণ হিসেবে কাজ করছে। বর্তমানে শ্রেণীকক্ষে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপকরণের পাশাপাশি শ্রেণিকক্ষে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ল্যাপটপ, ইন্টারনেট মডেম ও স্পীকারের সমন্বয় ঘটানো হয়েছে। আর এই ধরনের শ্রেণিকক্ষকেই বলা হচ্ছে 'স্মার্ট শ্রেণীকক্ষ'।

Smart Classrooms are technology enhanced classrooms that foster opportunities for teaching and learning by integrating learning technology, such as computers, specialized software, audience response technology, assistive listening devices, networking, and audio/visual capabilities.

স্মার্ট শ্রেণীকক্ষের উদ্দেশ্যসমূহ (Objectives of Smart Classroom)

স্মার্ট শ্রেণীকক্ষের উদ্দেশ্যগুলি হল —

- শিক্ষার্থীদের দক্ষতা এবং কর্মক্ষমতা উন্নয়নে শিক্ষকদের সহায়তা করা।
- শিক্ষার্থীদের সঠিকভাবে শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে শিক্ষকদের মাল্টিমিডিয়া সমন্বিত বিষয়বস্তুর এবং তথ্যগুলি অ্যাক্সেস করতে সক্ষম করে তোলা।
- বিষয় সম্পর্কিত ধারণাগুলিকে সঠিকভাবে উপস্থাপনের জন্য প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করা।
- শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়াকে চিত্তাকর্ষক করে তুলতে ভিজ্যুয়ালাইজেশন এবং অ্যানিমেশনকে ব্যবহার করা।
- শিক্ষার্থীদের সর্বদা বিষয়ের প্রতি আকর্ষিত করে রাখা।
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিমূর্ত ও চিন্তাশীল ধারণাকে উন্নত করা।
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিভিন্ন উপকরণকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সৃজনশীল চিন্তাভাবনার সৃষ্টি করা ।
- ই-রিসোর্স, ই-বুক, ই-জার্নাল, প্রোটোকল, বক্তৃতা নোট, ডকুমেন্টারি ইত্যাদি ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষাদান করা।

স্মার্ট শ্রেণীকক্ষের প্রকারভেদ (Types of Smart Classroom)

স্মার্ট শ্রেণীকক্ষে প্রযুক্তি নির্ভর শিখন সম্পদের আধিক্যের ওপর ভিত্তি করে স্মার্ট শ্রেণীকক্ষকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। সেইগুলি হল

সাধারণ স্মার্ট শ্রেণীকক্ষ (Basic Smart Classroom)	এই ধরনের স্মার্ট ক্লাসরুমে ল্যাপটপ বা কম্পিউটার, প্রজেক্টর, ডিভিডি বা ভিসিডি প্লেয়ার এবং ডিসপ্লে স্ক্রীন ইত্যাদির মতো প্রযুক্তি নির্ভর গ্যাজেট রয়েছে।
ইন্টারমিডিয়েট স্মার্ট শ্রেণীকক্ষ (Intermediate Smart Classroom)	ইন্টারমিডিয়েট স্মার্ট শ্রেণীকক্ষ সাধারণ স্মার্ট ক্লাসরুম থেকে এক ধাপ এগিয়ে। এই ধরনের স্মার্ট ক্লাসরুমে ল্যাপটপ, প্রজেক্টর, ডিসপ্লে স্ক্রিন এবং ডিভিডি বা ভিসিড প্লেয়ার ছাড়াও কন্টোল প্যানেলে স্মার্ট পডিয়ামের মত গ্যাজেটগুলি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।
উন্নত স্মার্ট শ্রেণীকক্ষ (Advanced Smart Classroom)	উন্নত স্মার্ট শ্রেণীকক্ষে সাধারণ ও ইন্টারমিডিয়েট স্মার্ট শ্রেণীকক্ষের সমস্ত গ্যাজেট থাকে কিন্তু তাদের বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত উন্নত, অর্থাৎ, এই ধরনের শ্রেণীকক্ষ নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করে থাকে।

স্মার্ট শ্রেণীকক্ষের বৈশিষ্ট্যসমূহ (Characteristics of Smart Classroom)

স্মার্ট শ্রেণীকক্ষের বৈশিষ্ট্যগুলিকে নিম্নে বর্ণনা করা হল —

- অত্যাধুনিক প্রযুক্তিবিজ্ঞান স্মার্ট শ্রেণীকক্ষের ভিত্তি হিসাবে কাজ করে থাকে।
- এই ধরণের শ্রেণীকক্ষে যৌথ শিখন পদ্ধতির ওপর বেশি গুরুত্ব প্রদান করা হয়ে থাকে।
- বিভিন্ন ধরণের প্রযুক্তি নির্ভর ডিভাইসের ব্যাবহারের দ্বারা এই ধরণের শ্রেণীকক্ষ পরিচালিত হয়ে থাকে।
- এই ধরণের শ্রেণীকক্ষে পারদর্শিতা ভিত্তিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা পরিচালিত হয়।
- শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ার ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে থাকে।
- এই ধরণের শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীরা নিজেরাই শিখন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের দ্বারা কোন বিষয় প্রাসঙ্গিক ধারণা লাভ করে থাকে।

স্মার্ট শ্রেণীকক্ষের উপাদানসমূহ (Elements of Smart Classroom)

স্মার্ট শ্রেণীকক্ষের উপাদানগুলিকে নিম্নে আলোচনা করা হল —

- **কম্পিউটার (Computer) :** স্মার্ট শ্রেণীকক্ষের একটি অন্যতম উপাদান হল কম্পিউটার। কম্পিউটার হল এমন একটি যন্ত্র যা সুনির্দিষ্ট নির্দেশ অনুসরণ করে গাণিতিক গণনা সংক্রান্ত কাজ খুব দ্রুত করতে পারে। কম্পিউটার (computer) শব্দটি গ্রিক 'কম্পিউট (compute)' শব্দ থেকে এসেছে। compute শব্দের অর্থ হিসাব বা গণনা করা। আর কম্পিউট (computer) শব্দের অর্থ গণনাকারী যন্ত্র। কিন্তু এখন আর কম্পিউটারকে শুধু গণনাকারী যন্ত্র বলা যায় না। কম্পিউটার এমন এক যন্ত্র যা তথ্য গ্রহণ করে এবং বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তা বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন করে।
- **প্রোজেক্টার (Projector) :** প্রোজেক্টার মূলত একটি আলোক প্রযুক্তিগত যন্ত্র যা কোন স্থিরচিত্র বা চলমান চিত্রকে কোন কিছুর উপরে প্রক্ষেপ করে, সাধারণত প্রক্ষেপণ পর্দার উপর। বেশিরভাগ প্রোজেক্টার ছোট স্বচ্ছ লেন্সের ভেতর দিয়ে উজ্জ্বল আলো বের করে চিত্র তৈরি করে থাকে, কিন্তু কিছু নতুন ধরনের প্রোজেক্টার লেজারের সাহায্যে সরাসরি চিত্রকে প্রক্ষেপ করতে পারে। ভার্চুয়েল রেটিনাল ডিসপ্লে বা রেটিনা প্রোজেক্টার হল এক বিশেষ ধরনের প্রোজেক্টার যা চিত্রকে বাহ্যিক কোন প্রক্ষেপণ পর্দার পরিবর্তে সরাসরি মানুষের চোখের রেটিনাতে প্রক্ষেপ করে থাকে।

- **মাইক্রোফোন (Microphone) :** মাইক্রোফোন এক ধরণের যন্ত্র, যাকে কথ্য ভাষায় 'মাইক' বলা হয়ে থাকে। এটি এক ধরনের সেন্সর হিসেবে কাজ করে, যা শব্দ শক্তিকে তড়িৎশক্তিতে রূপান্তর করে। কম্পিউটার, মোবাইল ফোন, অডিও রেকর্ডার, শ্রবণ সহায়ক যন্ত্র, মেগাফোন, রেডিও বা টেলিভিশন সম্প্রচার কেন্দ্র ইত্যাদি ক্ষেত্রে এর বহুল ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। আধুনিক কালের বেশির ভাগ মাইক্রোফোনই তড়িৎ-চুম্বকীয় আবেশ, ক্যাপাসিট্যান্সের পরিবর্তন, পিজোইলেক্ট্রিক ইফেক্ট অথবা বাতাসের চাপের পার্থক্য ব্যবহার করে ইলেকট্রিক সিগনাল তৈরী করে।

- **অ্যাম্পলিফায়ার (Amplifier) :** অ্যাম্পলিফায়ার বা সংক্ষেপে অ্যাম্প মূলতঃ একটি ইলেকট্রনিক যন্ত্র যা এর অন্তর্গামীতে (ইনপুট) প্রদত্ত কোন সংকেত বা সিগনালকে বিবর্ধিত করে বহির্গামীতে (আউটপুট) প্রেরণ করে। ইলেক্ট্রনিক অ্যাম্পলিফায়ার একই কাজ করে, তবে এ ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র অন্তর্গামী সংকেত বৃহৎ বহির্গামী সংকেতে পরিবর্তিত হয়। অ্যাম্পলিফায়ার অন্তর্গামীতে প্রদত্ত সংকেতের আকার বা আকৃতির কোনরূপ পরিবর্তন ঘটায় না, শুধু এর ক্ষমতা বাড়ায়।

- **ডিজিটাল ক্যামেরা (Digital Camera) :** ডিজিটাল ক্যামেরা বলতে এমন ক্যামেরা বোঝায়, যেগুলোতে ফিল্ম ব্যবহৃত হয় না, বরং তার বদলে মেমরী চিপের মধ্যে ছবি ধারণ করে রাখার ব্যবস্থা থাকে। ডিজিটাল ক্যামেরার মান হিসাব করা হয় মেগা পিক্সেল দিয়ে, যত বেশি মেগা পিক্সেল তত বেশি বড় ছবি ধারণ করার ক্ষমতা। প্রথমে দাম বেশি থাকলেও ফিল্ম ক্যামেরা থেকে অনেক দ্রুত দাম কমছে, এবং ক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে ফিল্ম লাগেনা এবং সাথে সাথে স্ক্রিনে ছবি দেখা যায় বলে এর চাহিদা ব্যাপক হারে বাড়ছে।

- **ওয়েবক্যাম (WebCam) :** ওয়েবক্যাম হল বিশেষ ধরণের ভিডিও ক্যামেরা যা একটি কম্পিউটারের সাথে ইউএসবির মাধ্যমে যুক্ত হয়ে ইন্টারনেটে ভিডিও আদান-প্রদান করতে পারে। ১৯৯১ সালে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালযয়ে ওয়েবক্যাম আবিষ্কার হয়। একুশ শতক থেকে ল্যাপটপ নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলো ল্যাপটপেই ওয়েবক্যাম যুক্ত করা শুরু করেছে। ওয়েবক্যামে লেন্স, ইমেজ সেন্সর ও মাইক্রোফোন থাকে। ওয়েবক্যামে সাধারণত চার্জ কাপল্ড ডিভাইস বা কপ্লিমেন্টারি মেটাল-অক্সাইড-সেমিকন্ডাক্টর সেন্সর ব্যবহার করা হয়, তবে সস্তা হওয়ার কারণে কপ্লিমেন্টারি মেটাল-অক্সাইড-সেমিকন্ডাক্টর অধিক ব্যবহার করা হয়। ওয়েবক্যাম বা ওয়েব ক্যামেরা হচ্ছে এক ধরণের ভিডিও ক্যামেরা, যা বাস্তব সময়ের ভিডিও ধারণ করে এবং একটি কম্পিউটার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে তা কোনো মনিটরে প্রদর্শন করে। বাস্তব সময়ের ভিডিও চিত্র ধারণের পর তা ব্যবহারকারী নিজে দেখতে পারে অথবা ইমেইল ইত্যাদির মাধ্যমে

অন্য কোথাও প্রেরণ করতে পারে। আই পি ক্যামেরা (যা সাধারণত ইথারনেট বা ওয়াই-ফাই এর মাধ্যমে সংযুক্ত হয়), যেভাবে মূল সিস্টেমের সাথে সংযুক্ত হয়ে থাকে, ওয়েবক্যাম সেভাবে যুক্ত না হয়ে সাধারণত ইউএসবি ক্যাবলের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে থাকে।

- **ইউএসবি ফ্লাশ ড্রাইভ (USB flash drive) :** ইউএসবি ফ্লাশ ড্রাইভ ফ্লাশ ডাটা স্টোরেজ ডিভাইস এবং ইউএসবি (ইউনিভারসাল সিরিয়াল বাস) ইন্টারফেসের সমন্বয়ে গঠিত। ইউএসবি ফ্লাশ ড্রাইভ সাধারণত সিস্টেম থেকে বিচ্ছিন্নকরণযোগ্য এবং এতে পুনরায় ডাটা লেখা যায়। এটি বাহ্যিকভাবে ফ্লপি ডিস্ক বা অপটিক্যাল ডিস্ক থেকে অনেক ছোট।
- **জয়স্টিক (Joystick) :** একটি জয়স্টিক হল একটি ইনপুট ডিভাইস যাতে একটি স্টিক বা লাঠি সদৃশ বস্তু যন্ত্রের উপরিভাগে বসানো থাকে যা দিয়ে বিভিন্ন কোন বা অভিমুখে এর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কোন যন্ত্রকে পরিচালনা করা যায়।
- **লাইট পেন (Light Pen) :** লাইট পেন হল একটি কম্পিউটার ইনপুট যন্ত্র যা দেখতে লম্বা সরু লাঠির মতন। এটির আলোক সংবেদনশীল বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা কম্পিউটারের সিআরটি প্রদর্শনীর সহযোগে ব্য বহার করা হয়। এটি ব্যবহারকারীকে প্রদর্শনীতে দেখতে পাওয়া বস্তু নির্দেশ বা আঁকতে সাহায্য করে যেমনটা টাচস্ক্রীনে করা হয় কিন্তু এটির মাধ্যমে এই কাজটি সুক্ষতার সাথে করা যায়।

স্মার্ট শ্রেণীকক্ষের সুবিধা (Advantages of Smart Classroom) :

স্মার্ট শ্রেণীকক্ষের সুবিধাগুলি হল -

- শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ায় নমনীয়তা প্রদান করে থাকে।
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে সঠিকভাবে বিষয় সম্পর্কিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ে সাহায্য করে থাকে।
- মাল্টিমিডিয়ার ব্যাবহারের দ্বারা খুব উন্নতমানের শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া পরিচালিত করে থাকে।
- শিক্ষাগত সম্পদকে খুব সহজেই ব্যবহার করতে পারে।
- খুব সহজেই এর দ্বারা শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগ্রহণের প্রতি আগ্রহ ও ইচ্ছা বৃদ্ধি করা যায় এবং অনুপ্রাণিত করা যায়। শিক্ষার্থীর বৈজ্ঞানিক মনোভাবের বিকাশ ঘটায়।
- পুর্বাজিত জ্ঞান ও নতুন জ্ঞানের মধ্যে যথাযথ সম্পর্ক স্থাপনে সাহায্য করে থাকে।
- এই ধরনের শ্রেণীকক্ষের মাধ্যমে শিক্ষক মহাশয় বিষয়ভিত্তিক বিমূর্ত ধারণাগুলিকে মূর্ত করে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপিত করতে পারেন।

- শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া সহজ ও দীর্ঘস্থায়ী হয়।
- শিক্ষার্থীর সব ধরনের জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিকে সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে জ্ঞান আহরণে সাহায্য করে থাকে।
- শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে সচল ও সতেজ রাখতে সাহায্য করে।
- অনলাইন লার্নিং রিসোর্সগুলিকে খুব সহজেই ব্যবহার করা যায়।

স্মার্ট শ্রেণীকক্ষের সীমাবদ্ধতা (Limitations of Smart Classroom) :

স্মার্ট শ্রেণীকক্ষের সীমাবদ্ধতাগুলি হল -

- স্মার্ট শ্রেণীকক্ষ তৈরিতে অনেক অর্থ লাগে।
- শিক্ষার্থীদের অনেকসময় প্রযুক্তিগত প্রক্রিয়াটিকে বুঝতে সমস্যা হয়।
- প্রযুক্তিগত ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়।
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে মনোযোগের অভাব লক্ষ্য করা যায়।
- এই ধরনের শ্রেণীকক্ষ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একজন ব্যক্তির প্রয়োজন হয়ে থাকে।
- সব শিক্ষকদের প্রযুক্তিগত দক্ষতা সঠিক ভাবে না থাকার ফলে তারা সঠিকভাবে শ্রেণীকক্ষটিকে পরিচালিত করতে পারেন না।

3.5 ব্লেন্ডেড লার্নিং বা মিশ্র শিখন (Blended Learning)

ব্লেন্ডেড লার্নিং বা মিশ্র শিখনের ধারণা (Concept of Blended Learning)

ব্লেন্ডেড লার্নিং মূলত ট্র্যাডিশনাল টিচিং মেথডের সাথে ই-লার্নিং-এর সমন্বয়ে একটি হাইব্রিড টিচিং মেথড তৈরি করে। কিন্তু আমরা ডিজিটাল শ্রেণীকক্ষ বলতে যা বুঝি তার সাথে ব্লেন্ডেড লার্নিং-এর পার্থক্য আছে। এই সিস্টেম গতানুগতিক শেখার পদ্ধতির বেসিক টেকনিককে পরিবর্তন করেছে। সশরীরে উপস্থিতি ও ভার্চুয়াল পদ্ধতির সংমিশ্রণে শিক্ষা কার্যক্রম চালানোকে সহজ ভাষায় ব্লেন্ডেড শিক্ষা বলা হয়ে থাকে। এ ধরনের শিক্ষায় শ্রেণিকক্ষের একঘেঁয়েমি কাটানোর জন্য কিছু সময় মুখের বক্তৃতা ও কিছু সময় আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে পাঠদান করা হয়। পাঠদানে বৈচিত্র্য আনতে ও তা আনন্দময় করতে ব্লেন্ডেড শিক্ষণ পদ্ধতির উদ্ভব হয়েছে। ব্লেন্ডেড শিক্ষাপদ্ধতি নতুন কিছু নয়। প্রথমদিকে শিশু ও বয়স্ক শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্লেন্ডেড শিক্ষার কথা ভাবা হলেও পরবর্তী সময়ে প্রযুক্তির সাহায্যে লেখাপড়াকে সহজ করে তোলাই এর মূল উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। মূল্যবান সময়কে জয় করে সব মানুষের জন্য দ্রুত

আধুনিক শিক্ষা ও প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহারের নিরিখে এটাকে আধুনিক শিক্ষার নীতি ও রূপরেখার মধ্যে বিবেচনা করা শুরু হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয় 1960 সালে এই পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের চিন্তা শুরু করে। এরপর প্লাটো বা 'প্রোগ্রামড লজিক ফর অটোমেটিক টিচিং" অর্থাৎ স্বয়ংক্রিয়ভাবে শেখাতে পারে এমন একটি উদ্যোগ হাতে নেওয়া হয়। এজন্য 1970 সালে স্যাটেলাইট বেজডলাইভ ভিডিও শুরু করা হয়। এটা ব্যয়বহুল প্রমাণিত হওয়ায় পাশাপাশি ছোট প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে গবেষণা অব্যাহত থাকে। এরপর 1990 সালে আটলান্টার একটি এডুকেশনাল কোম্পানি তাদের ইন্টারঅ্যাকটিভ লার্নিং সেন্টারের প্রেস রিলিজে প্রথমবারের মতো আইপিএসসি লার্নিং নামে এর ঘোষণা করে।

কিন্তু ব্লেন্ডেড শিক্ষা নামটি দুর্বোধ্য ও অস্পষ্ট ছিল। এরপর 'হ্যান্ডবুক অব ব্লেন্ডেড লার্নিং" নামক পাবলিকেশনে বলা হয়, 'ব্লেন্ডেড লার্নিং এমন একটি সমন্বিত প্রক্রিয়া, যা ফেস-টু-ফেস ইন্সট্রাকশন ও কম্পিউটার ব্যবহার করে ইন্সট্রাকশনের একটি ব্লেন্ডেড মডেল।" ব্লেন্ডেড লার্নিংয়ের জন্য বিশ্বব্যাপী নানা কৌশলের অবতারণা করা হয়। দেশজ প্রযুক্তির সক্ষমতা, আর্থিক বরাদ্দ, মানুষের শিক্ষা ও সচেতনতার হার, গ্রাম ও শহরের মধ্যে আয় ও জীবনমানের সমতা ইত্যাদি নানা বিষয়ের ওপর নির্ভর করে খুব সহজেই 'ব্লেন্ডেড লার্নিং" প্রক্রিয়ায় সমাজ ও দেশকে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব। ব্লেন্ডেড লার্নিং এক প্রকারের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রোগ্রাম (Formal Educational Programme)। যখন কোর্সগুলোর এক অংশ ফেস-টু-ফেস (Face-to-Face) এবং অন্য অংশ ওয়েবের সাহায্যে যা কম্পিউটার বা Digital Media-র মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে তখন এ ধরনের লার্নিং মোডকে ব্লেন্ডেড লার্নিং বলা হয়।

বিভিন্ন গবেষণায় ব্লেন্ডেড লার্নিংকে বিভিন্ন নামে ব্যবহার করা হয়েছে। এদের মধ্যে কিছু নাম নিম্নে উল্লেখ করা হল—

- হাইব্রিড লার্নিং (Hybrid Learning)
- মিক্সড মোড লার্নিং (Mixed Mode Learning)
- টেকনোলজি মেডিয়েটেড ইন্সট্রাকশন (Technology Mediated Instruction)
- ওয়েব এনহেন্সড ইন্সট্রাকশন (Web Enhanced Instruction)

ব্লেন্ডেড লার্নিং বা মিশ্র শিখন মডেল (Models of Blended Learning)

ব্লেন্ডেড লার্নিংকে মোটামুটিভাবে ছয়টি মডেলে বিভক্ত করা যায়। সেইগুলি হল -

- **ফেস-টু-ফেস মডেল (Face to Face Model) :** এই প্রকার লার্নিং মডেলে ইন্সট্রাক্টর এডুকেটর, ইন্সট্রাকশন ও ডিজিটাল টুলের দ্বারা শিখন পরিবেশ পরিচালনা করে থাকেন।
- **রোটেশন মডেল (Rotation Model) :** এই মডেলে শিক্ষার্থীর শিখনের ধরণ চক্রাকারে

ঘটে থাকে। সুতরাং, স্বাধীন অনলাইন স্টাডির একটি সিডিউল এবং ফেস-টু-ফেস শ্রেণীকক্ষ সময়ের সিডিউল চক্রের দ্বারা সম্পাদিত হয়ে থাকে।

- **ফ্লেক্স মডেল (Flex Model) :** পাঠক্রমের বেশিরভাগই ডিজিটাল প্লাটফর্মে পরিবেশিত হয়ে থাকে। এই প্রকার মিক্সড মোড ইন্সট্রাকশনে এডুকেটর সর্বক্ষণই F2F প্রক্রিয়ায় সাহায্য করে থাকে।
- **ল্যাবস মডেল (Labs Model) :** পাঠক্রমের সমস্ত অংশটুকুই প্রকৃত অবস্থার অনুরূপে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের উপর পরিবেশিত হয়ে থাকে। এই প্রকার শিখন মডেলে গতানুগতিক শ্রেণীকক্ষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।
- **সেলফ ব্লেন্ড মডেল (Self-Blend Model) :** এই মডেলে শিক্ষার্থী তার গতানুগতিক শিখনের সাথে অনলাইন শিখনের একটি মেলবন্ধনের দ্বারা শিখন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে থাকে।
- **অনলাইন ড্রাইভার মডেল (Online Driver Model) :** এই মডেলে এডুকেটরের নির্দেশনার মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থী একটি সম্পূর্ণ কোর্স সম্পন্ন করে থাকে। প্রয়োজনে এটাও সম্ভব হতে পারে যে, সমস্ত পাঠক্রম এবং শিক্ষাদান ডিজিটাল প্লাটফর্মের মধ্যে দিয়ে পরিবেশন করা হয় ও সেই সঙ্গে ফেস-টু-ফেস মিটিংগুলো করা হয়।

ব্লেন্ডেড লার্নিং বা মিশ্র শিখনের উপাদানসমূহ (Components of Blended Learning)

ব্লেন্ডেড লার্নিং মডেল বিভিন্ন উপাদানের দ্বারা গঠিত হতে পারে যা নিম্নে উল্লেখ করা হল—

- ইন্সট্রাক্টর ডেলিভারড কনটেন্ট (Instructor Delivered Content)
- ই-লার্নিং (E-Learning)
- ওয়েবইনারস (Webinars)
- কনফারেন্স কলস (Conference Calls)
- ইন্সট্রাক্টরের সাথে শিক্ষার্থীর লাইভ অথবা অনলাইন সেশন (Live or Online Sessions with Instructors)
- অন্যান্য মিডিয়া (Others Media)
- অন্যান্য ইভেন্টস (Other Events) : Facebook, E-Mail, Chat Rooms, Blogs, Podcastings, Twitter, Youtube, Skype, Webborads ইত্যাদি

ব্লেন্ডেড লার্নিং বা মিশ্র শিখনের বৈশিষ্ট্যসমূহ (Characteristics of Blended Learning)

নিম্নে ব্লেন্ডেড লার্নিং-এর গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলিকে নিম্নে আলোচনা করা হল —

- ফেস-টু-ফেস এবং অনলাইন লার্নিং-এর মিশ্রিত রূপ।
- এই শিখনে VLE-এর মাধ্যমে শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের সাথে সংযোগ স্থাপন করে থাকে।
- শিক্ষক ব্যতীত ডিজিটাল ইন্সট্রাকশন এবং ফেস-টু-ফেস মাধ্যমে একক শিক্ষার্থীরা নিজেদের নতুন ধারণার ও সক্ষমতার সাহায্যে শিখন কার্যাবলী চালিয়ে নিতে পারে।
- কম্পিউটার সহায়ক গুণগত ও পরিমাণগত অ্যাসেসমেন্ট মডিউলের মাধ্যমে কোর্স সামগ্রী সম্পর্কে বোঝার বা ধারণা বিশ্লেষণ করতে পারা।
- এই প্রকার মিক্সড মডেলে শিক্ষার্থী তার নিজস্ব পথে কাজ করে থাকে। এই শিক্ষার্থীকে নতুন ধারণা সম্পূর্ণরূপে বোঝার ক্ষমতা নিশ্চিত করে।
- এই প্রকার শিখন পদ্ধতি বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে প্রযুক্তি সমন্বয় সাধন করার চেষ্টা করে থাকে।
- এই প্রকার শিখনে LMS একটি পরিবেশকে এমনভাবে উন্নত করে যেখানে আলোচনা শিক্ষার্থীদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাহায্য যোগায়।

ব্লেন্ডেড লার্নিং বা মিশ্র শিখনের সুবিধা (Advantages of Blended Learning)

বর্তমানে সকল শিখন প্রোগ্রামের মধ্যে ব্লেন্ডেড লার্নিং একটি জনপ্রিয় শিখন পদ্ধতি। নিম্নে বিভিন্ন গবেষক বিশেষজ্ঞদের গবেষণায় উল্লেখ করা কিছু সুবিধা নিম্নে উল্লেখ করা হল —

- সম্পূর্ণ Face-to-Face অথবা সম্পূর্ণ অনলাইন শিখনের চেয়ে এই প্রকারের নির্দেশদান পদ্ধতি অনেক কার্যকরী বলে মনে করা হয়। এই প্রকারের শিখন মডেলে উচ্চস্তরীয় শিখন পারদর্শিতা লক্ষ্য করা গেছে।
- এই শিখনে Asynchronous Internet Communication Technology এমনভাবে অন্তর্ভূক্ত করানো হয়েছে যাতে এটি একই সাথে স্বাধীন ও সহযোগিতামূলক শিখন অভিজ্ঞতার কাজ করতে পারে।
- এছাড়াও এই প্রকার শিখনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার শিক্ষার্থীদের মনোভাবকে আরো ত্বরান্বিত করেছে।
- এই শিখনে তাৎক্ষনিক ফলাবর্ত দেওয়া সম্ভবপর হয় ।
- এই শিখনে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত শিক্ষা এবং শ্রেণীকক্ষ শিক্ষকের শিক্ষাদানকে একসাথে করা সম্ভব।

3.6 ওয়েব 2.0 সাধনী (Web 2.0 Tools)

ই-মেইল (Email)

প্রযুক্তির ব্যবহার মানুষের জীবনকে সহজ করে দিয়েছে। বর্তমানে মানুষের জীবন প্রণালী, আধুনিক জীবন পুরোপুরিভাবে প্রযুক্তি নির্ভর হয়ে পড়েছে। তাই প্রযুক্তিকে বাদ দিয়ে আধুনিক জীবন কল্পনা করা যায় না। প্রযুক্তির কল্যাণে মানুষের জীবন আরও গতিশীল আরও উন্নয়নমুখী হচ্ছে। এই কারণে সমগ্র বিশ্ব পরিণত হচ্ছে প্রযুক্তি নির্ভর একটি বিশ্বে। এ যেন আধুনিক জীবনের অবিচ্ছদ্য অনুষঙ্গ। এই প্রযুক্তির উন্নয়নে যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজ থেকে সহজতর হয়েছে। মুহূর্তের মধ্যে বার্তা প্রেরিত হচ্ছে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে। ইলেকট্রনিক মেইলের সংক্ষিপ্ত রূপ হল ই-মেইল যা এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে মানুষ পরস্পর পরস্পরের সাথে যোগাযোগ করে থাকে। যদিও মূলত এটি একটি টেক্সট বেসড কমিউনিকেশান সিস্টেম কিন্তু প্রযুক্তির আধুনিকায়নের ফলে আজ এর মাধ্যমে এটাচমেন্ট হিসেবে বিভিন্ন ফরমেটের ফাইল, ছবি কিংবা চলমান ভিডিও পাঠানো সম্ভবপর হয়েছে। অন্য কথায় বলতে গেলে এটি এমন একটি দ্রুত ও নিরাপদ যোগাযোগ ব্যবস্থা যার মাধ্যমে একজন ইউজার অন্যজন ইউজারের কাছে নিমিষেই যে কোন ধরনের ইনফরমেশান পাঠাতে পারে।

ই-মেইলের ইতিহাস (History of e-mail)

1957 সালে তৎকালিন সোভিয়েত রাশিয়া স্ফুটনিক উৎক্ষেপণ করার পর মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তরে নিরাপত্তাহীনতা আতঙ্ক আরও তীব্র হয়ে ওঠে। এই সুত্রে তারা প্রতিরক্ষা দপ্তরের অভ্যন্তরে গড়ে তোলে একটি প্রজেক্ট। এই প্রজেক্টের নাম রাখা হয় Advanced Research Project Agency (ARPA)। তারপর 1962 সালে মার্কিন সামরীক বাহিনীর নিয়ন্ত্রনের উদ্দেশ্যে বিশেষ করে পারমানবিক আক্রমনের পর তাৎক্ষনিক ভাবে সেনাবাহিনীকে নিয়ন্ত্রনের জন্য পল বারান (Paul Baran) মার্কিন যুক্তরাস্ট্রের বিমান বাহিনীর জন্য একটি পদ্ধতির উন্নয়ন ঘটান। এটি শেষ পর্যন্ত প্যাকেট-সুইচিং নেটওয়ার্ক হিসেবে চূড়ান্ত প্রয়োগ ঘটে। ১৯৬৮ সালে বোল্ট (Bolt) বেরানাক (Baranak) এবং নিউম্যান (Newman) সংক্ষেপে BBN Avicv এর সাথে এই প্যাকেট-সুইচিং নেটওয়ার্ক উদ্ভাবন করেন তখন থেকে এর নাম হয় আরপানেট (ARPAnet)। 1968 সালে 25 ও 26 শে অক্টোবর তারিখে আরপানেট-এর কার্যকারী কমিটি সিদ্ধান্ত নেয় যে এই ব্যবস্থায় তথ্য সঞ্চালিত করা হবে। 1969 সালে 1লা সেপ্টেম্বর তারিখে আরপানেটব্যাবস্থা চূড়ান্ত করা হয়। একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে ই-মেইল পাঠানো হয়েছিল দুটি কম্পিউটারের মধ্যে। আর দু'টি কম্পিউটারের মধ্যে ই-মেইল পাঠানোর সময় অরপানেট নেটওয়ার্ক ব্যবহার করা হয়েছিল।

প্রথমদিকে অনেক গবেষণা প্রতিষ্ঠান এতে প্রোগ্রাম লিখেছিল বার্তা আদান-প্রদান করার জন্য। সে

সময় এতে বিভিন্ন টার্মিনালের সাহায্যে তাৎক্ষণিক চ্যাটও করা যেত। ১৯৬০ সালের শুরুর দিকে অনেক গবেষণা প্রতিষ্ঠান টেক্সট মেসেজ প্রেরণের জন্য প্রোগ্রাম তৈরি করেন। ১৯৭১ সালে ইন্টারনেটের সূচনাকারী আরপানেটে রে টমলিনসন প্রথম ই-মেইল পাঠান। রেমন্ড স্যামুয়েল টমলিনসন ছিলেন বিখ্যাত মার্কিন কম্পিউটার বিজ্ঞানী ও বিশ্বের প্রথম ই-মেইল প্রবর্তনকারী। এর আগে একই কম্পিউটারের বিভিন্ন ব্যবহারকারীদের মধ্যে মেইল আদান-প্রদান করা যেত। কিন্তু টমলিনসনের পদ্ধতিতে প্রথমবারের মতো আরপানেটে যুক্ত বিভিন্ন হোস্টের মধ্যে বার্তা আদান-প্রদান সম্ভব হয়। তিনিই প্রথম কম্পিউটার এবং এর ব্যবহারকারীদের মধ্যে পার্থক্য বোঝানোর জন্য ব্যবহারকারীর নামের সামনে @ চিহ্নটি ব্যবহার শুরু করেন। তারপর থেকে ই-মেইলে এই চিহ্নটি ব্যবহার হয়ে আসছে।

1972 সালে গবেষক বেরি ওয়েসলার সফলভাবে ই-মেইল প্রেরণে সক্ষম হন। 1980 সালে ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটির গবেষকরা ই-মেইল প্রযুক্তিতে আরও অগ্রগতি আনেন। 1988 সালে বাণিজ্যিক ই-মেইলের প্রবর্তন হয়। 1993 সালে অনলাইনে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে ই-মেইল। প্রথমে ই-মেইলের ব্যবহার বার্তা পাঠানো ও বার্তা পড়ার মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু আধুনিককালে প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে বার্তার সাথে সাথে ছবি ও ভিডিও চিত্রও পাঠানো সম্ভব হচ্ছে। 1976 সালে গবেষক ল্যারি রবার্টের হাত ধরে যাত্রা শুরু করে বেশ কিছু ই-মেইল সেবা দান প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে গ্রাহকেরা অনলাইন ছাড়াও অফলাইনে নির্দিষ্ট নেটওয়ার্কের ভেতর ই-মেইল আদান-প্রদান করতে পারে মাইক্রোসফট আউটলুকের মাধ্যমে। বর্তমানে অসংখ্য প্রতিষ্ঠান ই-মেইল পরিসেবা প্রদান করে থাকে।এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠান হল - জি-মেইল (gmail), জোহো মেইল (zoho mail), এআইএম মেইল (AIM mail), জিএমএক্স মেইল (GMX mail), ইয়াহু মেইল (Yahoo mail), ইয়াহু মেইল ক্ল্যাসিক (Yahoo mail classic), ইনবক্স ডট কম (inbox.com), ফাস্ট মেইল ডট কম (firstmai.com), মাইস্পেস মেইল (Myspace mail), কেয়ার টু মেইল (Care 2 mail), মেইল ডট কম (mail.com)।

বর্তমানে সারা পৃথিবীতে 2.4 বিলিয়ন ই-মেইল ব্যবহারকারী রয়েছে এবং প্রতিদিন প্রায় 144 বিলিয়ন ই-মেইল আদান-প্রদান হয়। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ই-মেইল সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান Gmail-এর ব্যবহারকারীর সংখ্যা 430 মিলিয়ন। 2015 সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী সারা পৃথিবীর ই-মেইল ব্যবহারকারীর সংখ্যা রয়েছে 2.45 বিলিয়ন। এর মধ্যে 1.3 বিলিয়ন ব্যবহারকারীই হল এশিয়ার। 520 মিলিয়ন ইউরোপ, 275 মিলিয়ন উত্তর আমেরিকা, 170 মিলিয়ন আফ্রিকা, 90 মিলিয়ন মধ্যপ্রাচ্য, 25 মিলিয়ন অস্ট্রেলিয়া এবং 565 মিলিয়ন চীনের।

ই-মেইলের অংশসমূহ (Parts of e-mail)

একটি ই-মেইল বার্তা তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত। সেইগুলি হল- প্রাপকের ই-মেইল ঠিকানা, বার্তার বিষয় এবং বার্তা। আর একটি ই-মেইল ঠিকানা দুইটি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশটি হল ব্যবহারকারীর

নাম। এর ঠিক পরপরই @ চিহ্নটি থাকে। তার পরে থাকে সংশ্লিষ্ট ব্যবহারকারীর প্রতিষ্ঠানের নাম বা ডোমেইনের নাম। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, nsou@gmail.com—এই ঠিকানাটিতে nsou হল ব্যবহারকারীর নাম এবং gmail.com হল ব্যবহারকারীর মেইল সার্ভিস প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের নাম। ই-মেইল ঠিকানার প্রত্যেকটি অক্ষর ইংরাজী ছোট হাতের হয়।

ই-মেইলের সাথে সম্পর্কিত কিছু ধারণা (Some of the concepts related to e-mail)

অনেকেই অনেক দিন ধরে ই-মেইল আদান-প্রদান করেন কিন্তু To, Cc, Bcc, Send, Reply, Reply to All, Forward ইত্যাদি শব্দগুলোর ব্যবহার হয়ত ভালো করে জানেন না। সেইগুলিকে নিম্নে বর্ণনা করা হল

- **To :** এক সঙ্গে অনেককে মেইল পাঠাতে To ফিল্ডে কমা দিয়ে মেইল অ্যাড্রেসগুলো লিখতে হয়। To ফিল্ডের সবাই সবাইকে দেখতে পারবে এবং রিপ্লাই দিতে পারবে।
- **Ce (Carbon copy) :** To-এর মতো সবাই সবাইকে দেখতে পারবে এবং রিপ্লাই দিতে পারবে। To-তে একজনের মেইল আইডি লিখে বাকিগুলো Cc-তে লেখা হয়।
- **Bce (Blind Carbon copy) :** Bcc আইডিগুলো To এবং Cc আইডিগুলোকে দেখতে পারবে এবং রিপ্লাই দিতে পারবে। কিন্তু To ও Cc আইডিগুলো Bcc আইডিগুলোকে দেখতে পারবে না এবং রিপ্লাইও দিতে পারবে না। একাধিক Bcc আইডি একে অপরকে দেখতে পারবে না, রিপ্লাইও দিতে পারবে না।
- **Send :** Send-এ ক্লিক করলে To, Cc ও Bcc-তে যতগুলো আইডি আছে সবগুলো আইডিতে একসঙ্গে একই মেইল যাবে।
- **Reply :** যে আইডি থেকে মেইলটি এসেছে অর্থাৎ From-এ যে আইডিটি আছে, সেই আইডিকে রিপ্লাই দিতে Reply-এ ক্লিক করতে হয়।
- **Reply to All :** From To ও Cc-তে যতগুলো আইডি আছে, সবগুলো আইডিকে একসঙ্গে রিপ্লাই দিতে Reply to All-এ ক্লিক করতে হয়।
- **Forward :** যে আইডি থেকে মেইলটি এসেছে অর্থাৎ From-এ যে আইডিটি আছে বা To ও Cc তে যে আইডিগুলো আছে, তাদের কাউকে রিপ্লাই না দিয়ে অন্য কাউকে Inbox-এর মেইলটি পাঠাতে Forward-এ ক্লিক করতে হয়। অথবা Sent Mail থেকে কোনো মেইল অন্য কাউকে পাঠাতে Forward-এ ক্লিক করতে হয়।
- **Inbox :** কোনো ইউজারের নিকট থেকে আসা সমস্ত মেইলগুলি যেখানে জমা থাকে তাকে inbox বলা হয়।

- **Outbox :** একটি মেইল পাঠানোর পর কোনো কারণে সেটি না সেন্ড হলে যেখানে গিয়ে সাময়িকভাবে জমা হয় তাকে Outbox বলা হয়।
- **Sent Mail :** যে সকল মেইল পাঠানো হয়েছে, সেই সকল মেইলগুলির একটি করে কপি একটি নির্দিষ্ট বক্স-এ জমা হয় তাকে sent item box বলা হয় ।
- **Trash :** Inbox, Draft ও sent item থেকে মুছে ফেলা যাবতীয় মেইল যেখানে এসে জমা হয় তাকে Trash বলা হয়।

ইন্টারনেটে সংযোগ স্থাপন পদ্ধতি (Process of Connecting through internet)

ইন্টারনেট থেকে তথ্য আহরণ ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে যোগাযোগের জন্য ব্যবহারকারী কম্পিউটারের সাথে সার্ভার কম্পিউটারের সংযোগ স্থাপন করাকে ইন্টারনেট সংযোগ বলা হয়। ইন্টারনেট সংযোগ পদ্ধতি দুই ধরনের হয়ে থাকে। সেইগুলি হল—

- **অনলাইন সংযোগ (Online Connection) :** ইন্টারনেটের সাথে সার্বক্ষণিক সংযুক্ত থাকার বিষয়কে অনলাইন সংযোগ বলা হয়ে থাকে। সাধারণত আইএসপিসহ বড় বড় কোম্পানী এইরূপ সংযোগ ব্যবহার করে থাকে। এই প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত ব্যয়বহুল।
- **অফলাইন সংযোগ (Offline Connection) :** নিকটবর্তী কোন আইএসপি-র সদস্য হয়ে তাদের সার্ভার কম্পিউটার শেয়ার করে ইন্টারনেট ব্যবহার করার পদ্ধতিকে অফলাইন সংযোগ বলা হয়। এতে ব্যবহারকারী তার সকল তথ্যাবলী আইএসপি-র সার্ভারে সংযোগ স্থাপন করে প্রেরণ ও গ্রহণ করে থাকে। অফলাইন সংযোগ প্রক্রিয়ায় ইন্টারনেট সংযোগের জন্য মডেমসহ একটি কম্পিউটার, টেলিফোন সংযোগ, প্রয়োজনীয় সফওয়্যার ও আইএসপি সার্ভার কর্তৃক প্রদত্ত একটি Username ও Password দরকার হয়। অফলাইন সংযোগ প্রক্রিয়ায় ইন্টারনেট সংযোগের জন্য কম্পিউটারকে আইএসপি-র সার্ভার কম্পিউটারের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে হয়।

ই-মেইল কীভাবে কাজ করে (How e-mail works)

একটি ই-মেইল কীভাবে কাজ করে সেটি জানার আগে, ই-মেইল প্রেরণ ও গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু মৌলিক ধারণা সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন। সেইগুলি হল—

ই-মেইল সার্ভার (e-mail Server) : ই-মেইল সার্ভার হল একটি এপ্লিকেশান যা প্রেরক থেকে মেইল রিসিভ, সংরক্ষন ও প্রাপকের নিকট সেই মেইল ফরোয়ার্ডের দায়িত্ব পালন করে থাকে। ই-মেইল সার্ভারকে MTA বা মেইল ট্রান্সফার এজেন্ট ও বলা হয়ে থাকে। ই-মেইল সার্ভারে সকল ইমেইল ক্লায়েন্ট সমূহের এড্রেস ও মেইল সংরক্ষিত থাকে। যখন কেউ কোন নির্দিষ্ট ই-মেইল এড্রেস এ কোন মেইল

পাঠায় তখন সেই মেইল নির্দিষ্ট কোন ই-মেইল সার্ভারে এসে জমা হয়। ই-মেইল সার্ভার সেই মেইলকে ক্লায়েন্ট এর কাছে প্রেরণ করে থাকে।

ই-মেইল ক্লায়েন্ট (e-mail Client) : ই-মেইল ক্লায়েন্ট হল একটি অ্যাপ্লিকেশান যা পার্সোনাল কম্পিউটার বা ওয়ার্কস্টেশানে থেকে মেইল সেন্ড, রিসিভ ও অর্গাইনাইজের কাজ করে থাকে। এটিকে এ কারণে ক্লায়েন্ট বলা হয়ে থাকে যে এটি ক্লায়েন্ট সার্ভার আর্কিটেকচারের উপর ভিত্তি করে ডিজাইনকৃত। খুব জনপ্রিয় কিছু ইমেইল ক্লায়েন্ট হল মাইক্রোসফট আউটলুক, ইউডোরা বা পেগাসাস। এছাড়া ইয়াহু, জি-মেইল কিংবা হট মেইলের মতো ফ্রি মেইল সার্ভিস যারা ব্যবহার করে থাকেন তাদের ইমেইল ক্লায়েন্ট এসব কোম্পানীর ওয়েব পেজেই থাকে।

সিম্পল মেইল ট্রান্সপার প্রোটোকল (SMTP) : সিম্পল মেইল ট্রান্সপার প্রোটোকল বা SMTP হল ই-মেইল ট্রান্সপারের জন্য একটি স্টান্ডার্ড। SMTP প্রথম RFC ৮২১ এর ভিত্তিতে ডিফাইন করা হয়েছিল। বর্তমানে SMTP এর লেটেস্ট ভার্সন ESMTP বা এক্সেটন্ডেড এসঙএমঙটিঙপি RFC 5321 ভিত্তিতে ডিফাইনকৃত। সকল আউটগোয়িং মেসেজসমূহ নিয়ে এই SMTP প্রোটোকল কাজ করে থাকে। SMTP এই কাজে 25 পোর্ট ব্যবহার করে থাকে।

পোস্ট অফিস প্রটোকল ভার্সন 3 (POP3) : পোস্ট অফিস প্রোটোকল ভার্সন 3 সংক্ষেপে POP3 নামে পরিচিত। এটি একটি এপ্লিকেশান লেয়ার ইন্টারনেট স্টান্ডার্ড প্রোটোকল যা মেইল রিসিভ এর দায়িত্ব পালন করে থাকে। এই কাজের জন্য POP3 110 পোর্ট ব্যবহার করে থাকে। POP3 এর জন্য আরেকটি অল্টারনেটিভ পোর্ট হল 995.

1. প্রথমে প্রেরকের ইমেইল ক্লায়েন্ট বা ওয়ার্কস্টেশন থেকে SMTP প্রোটোকলের মাধ্যমে একটি ই-মেইল পাঠানো হয়ে থাকে। এই ইমেইলে অবশ্যই প্রাপকের এড্রেস থাকা বাধ্যতামুলক।
2. এই মেইল পাবলিক ইন্টারনেট এরিয়ায় এসে বিভিন্ন রাউটার ক্রস করে প্রেরকের মেইলের জন্য নির্দিষ্ট করা ইমেইল সার্ভার এর এসে জমা হয়।
3. যদি প্রাপকের ইমেইল এড্রেস একই মেইল ট্রান্সফার এজেন্ট (MTA)-এর অধীনে হয়ে থাকে তাহলে ইমেইল সার্ভার সেই মেইলটিকে প্রাপকের কাছে সেন্ড করবে আর যদি ডিফারেন্ট MTA হয়ে থাকে তাহলে ইমেইল সার্ভার সেই মেইলকে ভিন্ন ইমেইল সার্ভারের নিকট পাঠাবে।
4. ইমেইল সার্ভার সেই মেইলকে SMTP প্রটোকল ব্যবহার করে প্রাপকের এড্রেসে পাঠাবে। মূলত প্রাপকের এড্রেস কিংবা মেইলের জন্য স্পেস সেই মেইল সার্ভারেই থাকে। ইমেইল ক্লায়েন্ট মেইল রিসিভ করার জন্য POP3 প্রোটোকলের ১১০ পোর্টের মাধ্যমে SMTP প্রোটোকলের 25 পোর্টের সাথে যোগাযোগ করবে।

5. তারপর সেই মেইল আনরিড স্ট্যাটাস হিসেবে প্রাপকের ইমেইল ক্লায়েন্ট এর ইনবক্স বক্সে জমা হবে।

6. পাঠক ইমেইল ক্লায়েন্ট ওপেন করে সেই মেইল পড়লে মেইলটির স্ট্যাটাস চেঞ্জ হয়ে রিড স্ট্যাটাস হবে। প্রেরক মেইলের সাথে কোন এটাচমেন্ট পাঠালে প্রাপক তা ডাউনলোড করে লোকাল কম্পিউটারে সেভ করতে পারবে।

ব্লগ (Blogs)

নিজের প্রাত্যহিক জীবনের কিছু ঘটনা অথবা কোন একটি নির্দিষ্ট ঘটনা নিয়ে ধারাবাহিক ভাবে লিখা বা কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর ধারাবাহিক ভাবে লিখার মাধ্যমে ইন্টারনেটে সবার সাথে শেয়ার করাকে বলা হয় ব্লগিং। যেসব ওয়েবসাইটে এই লেখাগুলো প্রকাশ করা হয় তাকে ব্লগ বলে। Blog শব্দটির আবির্ভাব Weblog থেকে। Weblog শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করা হয় 1997 সালের ১৭ই ডিসেম্বর। শব্দটির স্রষ্টা মার্কিন নাগরিক জন বার্জার (Jorn Barger)। এর ঠিক দু'বছর পর 1999 সালের এপ্রিল এবং মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে পিটার মহোলজ (Peter Merholz) নামে একব্যাক্তি Weblog শব্দটিকে ভেঙ্গে দুই ভাগ করেন -We Blog এর পরই সারা বিশ্বব্যাপী ব্লগ জনপ্রিয় হতে শুরু করে। তবে মাঝামাঝি সময়ে আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। তা হল অনলাইনে দিনলিপি লেখার সুবিধা নিয়ে যাত্রা শুরু করে 'ওপেন ডায়েরি" যা ছিল অনেকটা এখনকার ব্লগের মতোই। যারা ব্লগে পোস্ট দেয় তাদেরকে ব্লগার বলা হয়। ইংরেজী Blog শব্দের অর্থে Oxford Dictionary তে বলা হয়েছে -Blog is a personal record that somebody puts on their website giving an account of their activities and opinions and discussing places on the Internet they have visited.

যে সমস্ত ওয়েবসাইট এবং ব্লগিং এপ্লিকেশনের মাধ্যমে একটি ব্লগ তৈরি করা যায়, এগুলোকে ব্লগিং প্লাটফর্ম বলা হয়। বর্তমানে কিছু জনপ্রিয় ব্লগিং প্লাটফর্মের মধ্যে গুগলের ব্লগার, ওয়ার্ডপ্রেস, টেকনোরাতি, ব্লগ ডট কম, হোপব্লগ ইত্যাদি অন্যতম। Blogger.com হচ্ছে জনপ্রিয় সার্চ ইঞ্জিন Google-এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান। তবে Google এটি তৈরি করেনি। 1999 সালের 23 শে আগস্ট সানফ্রান্সিসকোতে Pyra Labs নামের একটি প্রতিষ্ঠান সর্বপ্রথম Blogger.com তৈরি করেন। তারা মূলত এটি তৈরি করেছিলেন বিভিন্ন মানুষের ব্যক্তিগত বস্তুগুলোকে একটি প্লাটফর্মে নিয়ে আসার জন্য। খুব অল্প সময়ের মধ্যে Blogger.com জনপ্রিয় হয়ে উঠে। কিন্তু এমন সময়ে ঘটে প্রথম বিপত্তি। Blogger.com অর্থাভাবে পরে। এটির সার্ভার চালানোর মতো যথেষ্ট অর্থ Pyra Labs-এর কাছে ছিল না। এরপর অবশেষে ২০০২ সালে Blogger.com-কে Google কিনে নেয় এবং এর সংস্কারের জন্য কাজ শুরু করে। এরপর থেকে Google ও Blogger.com এক হয়ে কাজ করছে। Blogger.com-এর হোস্টিং গুগলের নিজস্ব সার্ভারে এবং এর সাবডোমেন ব্লগস্পট (Blogspot) নামে পরিচিত।

ব্লগিং জনপ্রিয় হওয়ার আগে, ডিজিটাল গোষ্ঠীগুলোর নানান ধরন ছিল। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল—ইউজনেট (Usenet), জিনি (GEnie), বিক্স (BiX)-এর মতো বাণিজ্যিক অনলাইন সার্ভিস, কম্পুসার্ভ (CompuServe), ই-মেল লিস্টস আর বুলেটিন বোর্ড সিস্টেমস (বিবিএস)। 1990 সালে ইন্টারনেট ফোরাম সফটওয়্যার 'থ্রেড'-এর মাধ্যমে কথোপকথন চালানোর ব্যবস্থা শুরু করে। থ্রেড হল একটা ভার্চুয়াল 'কর্কবোর্ড'-এ বার্তাগুলোর সাময়িক সংযোগের সমষ্টি।

ব্লগের প্রকারভেদ (Types of Blogs) :

ব্লগকে বিভিন্ন ভাবে ভাগ করা যায়। ব্লগিং করার উদ্দেশ্যকে বিবেচনা করে আমরা ব্লগিংকে দুই ভাগে ভাগ করতে পারি। যথা :

- **ব্যক্তিগত বা অলাভজনক ব্লগ :** ব্যক্তিগত বা অলাভজনক ব্লগ বলতে আমরা সেসব ব্লগকে বুঝি যেসব ব্লগে শুধুমাত্র আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের কিছু ঘটনা লিপিবদ্ধ থাকে অথবা যার মাধ্যমে আমরা কোনো আয় করতে পারি না।
- **নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর বা লাভজনক ব্লগ :** যেসব ব্লগ নির্দিষ্ট কোনো বিষয়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে অথবা যার মাধ্যমে আমরা আয় করতে পারি সেসব ব্লগকে নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর বা লাভজনক ব্লগ বলে।

আবার, ব্যাবহারকারীদের সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে ব্লগকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। একটি সিঙ্গেল ইউজার ব্লগ অন্যটি মাল্টি ইউজার ব্লগ।

- সিঙ্গেল ইউজার ব্লগে একজন ব্যবহারকারী লিখে থাকেন, যেখানে অন্য অনলাইন ব্যবহারকারীরা শুধু তাদের মন্তব্য করতে পারেন।
- মাল্টি ইউজার ব্লগ হচ্ছে একটা সোশ্যাল মিডিয়া যেখানে কয়েক হাজার থেকে শুরু করে লক্ষ কোটি ব্যবহারকারি তাদের ব্লগ এবং মন্তব্য প্রকাশ করেন।

এছাড়াও, নিম্নলিখিত ভাগে ব্লগকে ভাগ করা হয়ে থাকে

1. **ব্যক্তিগত ব্লগ (Personal Blog) :** ব্যক্তিগত ব্লগগুলো সাধারণত মতামত ভিত্তিক হয়ে থাকে এটি যে কেউ যে কোন বিষয়ে লিখতে পারে।
2. **ক্ষুদ্র ব্লগ (Micro Blog) :** ক্ষুদ্র ব্লগে সাধারণত একাধিক বিষয়ের সংযুক্তি করা হয় যেমন-টেক্স,ছবি, লিংক, ছোট ভিডিও ক্লিপ ইত্যাদি অথবা অন্যান্য যে কোন বিষয়ের উপর। এখানে সাধারণত মানুষের মনের চিন্তা চেতনা আরো অনেক কিছু নিয়ে আলোচনা করা হয়। বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ,ব্যবসায়িক মিটিং বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয় সমূহ শেয়ার এবং

সেলিব্রেটির বা রাজনৈতিকবিদদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সময়, লেকচারনতুন বই এর প্রকাশনাভ্রমন ইত্যাদি বিষয় এর উপর প্রকাশিত হতে পারে।

3. **কর্পোরেট এবং অর্গানাইজেশনাল ব্লগ (Corporate and Organizational Blogs) :** মার্কেটিং এর জন্য ব্লগিং বর্তমান সময়ে অনেক জনপ্রিয় একটি বিষয়। এই সব ব্লগে যে কোন কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানের মার্কেটিং, ব্যান্ডিং অথবা ক্রেতা-বিক্রেতা সম্পর্কিত নানা তথ্য প্রকাশ পায়। একইভাবে ক্লাব বা সামাজিক ভাবে প্রকাশিত ব্লগ গুলোকে ক্লাব ব্লগ, গ্রুপ ব্লগ ইত্যাদি বলা হয় এবং সেখানে তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য প্রকাশ হয়ে থাকে। এছাড়া কিছু নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ের উপরও ব্লগ প্রকাশিত হয় যেমন-রাজনৈতিক ব্লগ, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত ব্লগ, ভ্রমন সম্পর্কিত ব্লগ বা ট্রাভেল ব্লগ, ফ্যাশন ব্লগ, প্রজেক্ট ব্লগ, শিক্ষা সম্পর্কিত ব্লগ ইত্যাদি।

4. **মিডিয়া ব্লগ (Media Blog) :** যখন একটি ব্লগ শুধু মাত্র বিভিন্ন ভিডিও প্রকাশ করে তখন তাকে ভিলগ (vlog) বলে আখ্যায়িত করা হয়। তেমনি বিভিন্ন লিংক শেয়ার করে তাকে লিংকলগ (linklog) বলে। এরকম আরো অনেক ব্লগ আছে যেমন—টৈমবললগ (tumblelogs), টাইপক্যাসটিং (typecasting (blogging)) ইত্যাদি।

5. **ডিভাইস ব্লগ (Device Blog) :** যে সব ব্লগ মোবাইল ডিভাইস (mobile device), পিডিএ (PDA) সম্পর্কিত হয় তাকে মোব্লগ বলে এবং যে ব্লগ এর মাধ্যমে সরাসরি ভিডিও বা অডিও বা ছবি সেয়ার করে সেই সব ব্লগকে ভিডিও/অডি/পিকচার ব্লগ বলে।

উইকি (Wikis)

উইকিপিডিয়া হল ইন্টারনেট জগতের বৃহত্তম এবং সমৃদ্ধতম তথ্যভাণ্ডার। এখানে পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য প্রত্যেকটি বিষয়ের উপর এনসাইক্লোপিডিয়া বা সুবিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। উইকিপিডিয়া একটি ওয়েব-ভিত্তিক, বহু-ভাষীক, বিশ্বকোষ যা উইকিমিডিয়া ফাউন্ডেশন নামের একটি প্রতিষ্ঠান দ্বারা পরিচালিত হয়। উইকিমিডিয়া ফাউন্ডেশন (Wikimedia Foundation) একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান। এর প্রধান কার্যালয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার সানফ্রান্সিস্কো শহরে।

প্রাথমিকভাবে প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম ফ্লোরিডাতে শুরু করা হয় এবং সেই রাজ্যের আইন অনুযায়ী এটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। উইকিমিডিয়া ফাউন্ডেশন ইন্টারনেট ভিত্তিক বেশকিছু সমন্বিত উইকি প্রকল্প পরিচালনা করে থাকে। এর মধ্যে রয়েছে উইকিপিডিয়া (Wikipedia), উইকশনারী (Wiktionary), উইকিউক্তি (Wikiquote), উইকিবই (Wikibooks), উইকিসোর্স (Wikisource), উইকিমিডিয়া কমন্স (Wikimedia Commons), উইকিপ্রজাতি (Wikispecies), উইকিসংবাদ (Wikinews), উইকিবিশ্ববিদ্যালয় (Wikiversity), উইকিমিডিয়া ইনকিউবেটর (Wikimedia Incubator), মিডিয়াউইকি (Mediawiki), উইকিডেটা (Wikidata), উইকিভ্রমণ (Wikivoyage) এবং মেটাউইকি (Metawiki)।

উইকিমিডিয়া প্রকল্পসমূহ (Wikimedia Projects) :

নাম	ওয়েবসাইট	প্রতিষ্ঠাতা	বর্ণনা
উইকিপিডিয়া (Wikipedia)	www.wikipedia.org	জিমি ওয়েলস (Jimmy Wales) ও ল্যারি স্যাঙ্গার (Larry Sanger)	উইকিপিডিয়া হল ইন্টারনেট জগতের বৃহত্তম এবং সমৃদ্ধতম তথ্যভাণ্ডার। এখানে পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য প্রত্যেকটি বিষয়ের উপর এনসাইক্লোপিডিয়া বা সুবিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। উইকিপিডিয়া একটি ওয়েব- ভিত্তিক, বহু-ভাষীক, বিশ্বকোষ যা উইকিমিডিয়া ফাউন্ডেশন নামের একটি প্রতিষ্ঠান দ্বারা পরিচালিত হয়।
মেটাউইকি (Metawiki)	meta.wikimedia.org	উইকিমিডিয়া ফাউন্ডেশন (Wikimedia Foundation)	মেটা বা উইকিমিডিয়া মেটা-উইকি হল একটি উইকি- ভিত্তিক ওয়েব সাইট যা সমস্ত রকমের উইকিমিডিয়া ফাউন্ডেশন প্রকল্পের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে থাকেন।
মিডিয়াউইকি (Mediawiki)	mediawiki.org	ম্যাগনাস মান্স (Magnus Manske) ও লি ড্যানিয়েল ক্রকার (Lee Daniel Crocker)	মিডিয়াউইকি একটি ওয়েব ভিত্তিক উইকি সফটওয়ার যা উইকিমিডিয়া ফাউন্ডেশনের সকল প্রকল্পে ব্যবহার করা হয়। এটি প্রধানত উইকিপিডিয়ার জন্য তৈরি করা হয়েছিল, যা এখন বাণিজ্যিকসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আভ্যন্তরিন জ্ঞান ব্যবস্থাপনা ও কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্টের কাজেও ব্যবহৃত করা হয়।
উইকশনারী (Wiktionary)	www.wiktionary.org	জিমি ওয়েলস (Jimmy Wales) উইকিমিডিয়া কম্যুনিটি (Wikimedia community)	উইকিঅভিধান বা উইকশনারি হল একটি উন্মুক্ত অবিধান সম্পর্কিত ওয়েব-ভিত্তিক প্রকল্প। এটি 173টি ভাষায় উপলব্ধ। এটি কোন আদর্শ অভিধান নয়। এটি করা হয়েছে স্বেচ্ছাসেবকদের সহযোগীতায় উইকি সফটওয়্যার ব্যবহার করে, যেখানে ইন্টারনেটে এ ওয়েব সাইট ব্যবহার করে এমন প্রায় সবাইকে তা পরিবর্তন করার সুযোগ করে দেয়।
উইকিবই (Wikibooks)	www.wikibooks.org	কার্ল উইক (Karl Wick) উইকিমিডিয়া কম্যুনিটি (Wikimedia community)	উইকিবই হল উইকিমিডিয়া ফাউন্ডেশনের একটি স্বেচ্ছাসেবী প্রকল্প, যেখানে বিভিন্ন প্রকার পাঠ্যপুস্তক পঠনযোগ্য আকারে সংরক্ষণ করা হয়। উইকিজুনিয়র নামে উইকিবইয়ের একটি সাব-প্রোজেক্ট আছে যা শিশুদের জন্য বিভিন্ন পত্রিকা এবং ওয়েবসাইট নিয়ে গঠিত।

নাম	ওয়েবসাইট	প্রতিষ্ঠাতা	বর্ণনা
উইকিউক্তি (Wikiquote)	www.wikiquot	জিমি ওয়েলস (Jimmy Wales) ও উইকিমিডিয়া কম্যুনিটি (Wikimedia community)	উইকিউক্তি উইকি-ভিত্তিক পরিবারের একটি প্রকল্প যা মিডিয়াউইকি সফটওয়্যারের মাধ্যমে চালিত এবং উইকিমিডিয়া ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত হয়। এটি ড্যানিয়েল অ্যালস্টনের ধারণার উপর ভিত্তি করে এবং ব্রিয়ন ভিবের কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়। উইকিউক্তিতে বিভিন্ন বিশিষ্ট মানুষদের উক্তিগুলিকে একত্রিত করা হয়েছে।
উইকিমিডিয়া কমন্স (Wikimedia commons)	commons.wikimedia.org	উইকিমিডিয়া কম্যুনিটি (Wikimedia community)	উইকিমিডিয়া কমন্স পিকচার, অডিও ও ও অন্যান্য মাল্টিমিডিয়ার ফাইলের একটি উন্মুক্ত ভান্ডার। এটি উইকিমিডিয়া ফাউন্ডেশনের উইকিপিডিয়ার মত আর একটি প্রকল্প যা উইকিপিডিয়া সহ অন্যান্য সহপ্রকল্পের সম্পদ ভান্ডার হিসেবে কাজ করে। উইকিমিডিয়া কমন্সে আপলোড করা সকল ফাইল উইকিমিডিয়া সার্ভারের সকল প্রকল্পের স্থানীয় ভাবে আপলোড করা ফাইলের মত কাজ করে থাকে।
উইকিপ্রজাতি (Wikispecies)	species.wikimedia.org	বেনেডিক্ট মান্ডল (Benedikt Mandi), জিমি ওয়েলস (Jimmy Wales) ও উইকিমিডিয়া কম্যুনিটি (Wikimedia community)	উইকিপ্রজাতি হল একটি উইকি-ভিত্তিক অনলাইন প্রকল্প যা উইকিমিডিয়া ফাউন্ডেশনের দ্বারা সমর্থিত। এই প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হল সমস্ত প্রজাতি সম্পর্কিত বিষয়বস্তুর একটি ক্যাটালগ তৈরি করা। বিশ্ব জুড়ে বিভিন্ন জীববিজ্ঞানীদের সহযোগিতায় এই প্রকল্পটি গড়ে উঠেছিল।
উইকিসংবাদ (Wikinews)	www.wikinews.org	উইকিমিডিয়া কম্যুনিটি (Wikimedia community)	উইকিসংবাদ হল বিনামূল্যে সকলের সাহায্যে তৈরি সংবাদ বিশ্বকোষ। এটি উইকি মুক্ত বিষয়বস্তুর আলোকে পরিচালিত একটি সংবাদ বিষয়ক ওয়েবসাইট এবং উইকিমিডিয়া ফাউন্ডেশনের একটি প্রকল্প যা বিশ্বব্যাপী সহযোগিতামূলক সাংবাদিকতার মাধ্যমে কাজ করে থাকে।

নাম	ওয়েবসাইট	প্রতিষ্ঠাতা	বর্ণনা
উইকিমিডিয়া ইনকিউবেটর (Wikimedia Incubator)	incubator.wikimedia.org	উইকিমিডিয়া কম্যুনিটি (Wikimedia community)	উইকিমিডিয়া ইনকিউবেটর হল উইকিমিডিয়া ফাউন্ডেশনের দ্বারা পরিচালিত এমন একটি স্থান যেখানে বিভিন্ন বিষয়ের বিষয়বস্তুর সম্ভাব্য নতুন ভাষাগত সংস্করণ সঞ্চয় করে রাখা হয়।
উইকিবিশ্ববিদ্যালয় (Wikiversity)	www.wikiversity.org	উইকিমিডিয়া কম্যুনিটি (Wikimedia community)	উইকিবিশ্ববিদ্যালয় একটি উইকি-ভিত্তিক প্রকল্প যা শিখন উপকরণের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের টিউটোরিয়াল কোর্স প্রদান করে থাকে। এটি মিডিয়াউইকি সফটওয়্যারের মাধ্যমে চালিত এবং উইকিমিডিয়া ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত হয়।
উইকিডেটা (Wikidata)	wikidata.org	উইকিমিডিয়া কম্যুনিটি (Wikimedia community)	উইকিডেটা হল একটি তথ্য ভিত্তিক ডেটা বেস যা উইকিমিডিয়া ফাউন্ডেশন দ্বারা পরিচালিত হয়। এটি উইকিমিডিয়া কমন্সের মিডিয়া ফাইলের মত কাজ করে থাকে।
উইকিভ্রমণ (Wikivoyage)	wikivoyage.org	উইকিভয়েজ ই.ভি. অ্যাসোসিয়েশন (Wikivoyage e.V. association)	উইকিভ্রমণ হল উইকিমিডিয়া ফাউন্ডেশনের একটি প্রকল্প যা ভ্রমণ বিষয়ক ট্রাভেল নির্দেশিকা প্রদান করে থাকে। এই প্রকল্পটি 2006 সালের সেপ্টেম্বর মাসে জার্মান অ্যাসোসিয়েশন উইকিভয়েজ নামের একটি সংগঠনের মাধ্যমে উইকিট্রাভেল নামে শুরু হয়। 2012 সালের মাঝামাঝি সময়ে এর বেশির ভাগ অবদানকারী প্রকল্পটিকে উইকিমিডিয়া ফাউন্ডেশনের আওতায় নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানান। পরবর্তীতে 2013 সালের জানুয়ারী মাস থেকে উইকিভয়েজ উইকিমিডিয়া ফাউন্ডেশনের প্রকল্প হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে, এই প্রকল্পটি 17টি ভাষায় উপলব্ধ।

উইকিম্যানিয়া (Wikimania)

উইকিম্যানিয়া হল উইকিমিডিয়া ফাউন্ডেশনের অফিসিয়াল বার্ষিক সম্মেলন। এই সম্মেলনে উইকিমিডিয়ার বিভিন্ন প্রকল্প যেমন উইকিপিডিয়া, অন্যান্য উইকিসমূহ, ওপেন-সোর্স সফওয়ার, মুক্ত জ্ঞান এবং মুক্ত কন্টেন্ট, এবং এই বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত সামাজিক এবং প্রযুক্তিগত দিক উপস্থাপনা এবং আলোচনা করা হয়। উইকিমিডিয়া ফাউন্ডেশন 2005 সাল থেকে বার্ষিক সম্মেলনের আয়োজন করে

আসছে। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন শহরে উইকিম্যানিয়া সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উইকি সম্মেলন ভারত (Wiki Conference India) হল ভারতে আয়োজিত জাতীয় উইকিমিডিয়া সম্মেলন (National Wikipedia conference)। এই সম্মেলনের প্রধান লক্ষ্য ছিল সব ভারতীয় উইকিমিডিয়ানদের জন্য একটি সাধারণ প্লাটফর্ম প্রদান করা যার মাধ্যমে তারা নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের দ্বারা বিভিন্ন বিষয়ে সহযোগিতামুলক দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করতে পারে।

উইকিপিডিয়া (Wikipedia) হল একটি বহুভাষীক ইন্টারনেট বিশ্বকোষ। এটি উইকিমিডিয়া ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত হয়। বর্তমানে, মোট 295টি ভাষায় উইকিপিডিয়ায় বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনা করা হয়েছে। এই 295টি ভাষার মধ্যে শুধুমাত্র ইংরেজি ভাষায় উইকিপিডিয়ায় 4.9 মিলিয়নের অধিক বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। উইকিপিডিয়ায় ইংরেজি ভাষা ছাড়াও, আরো দশটি ভাষায় (ওলন্দাজ, জার্মান, ফরাসি, ইতালীয়, পোলিশ, স্পেনীয়, রুশ, সুয়েডীয়, ভিয়েতনামীয়, এবং ওয়ারে-ওয়ারে) প্রতিটিতে এক মিলিয়নের বেশি নিবন্ধ রয়েছে। আরো চারটি ভাষায় (সেবুয়ানো, চীনা, জাপানি এবম্প পর্তুগিজ) 700,000 এর বেশি নিবন্ধ রয়েছে। আরো 40 টি ভাষায় 100,000-এর বেশি নিবন্ধ রয়েছে, এবং 76 টি ভাষায় রয়েছে 10,000 নিবন্ধ। 2016 সালের ডিসেম্বরের রিপোর্ট অনুযায়ী, উইকিপিডিয়ায় যে ছয়টি ভাষায় নিবন্ধের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি সেইগুলি হল ইংরেজি, সুইডিশ, সেবুয়ানো, জার্মান, ডাচ ও ফরাসি। উইকিপিডিয়ায় যে কেউ ওয়েবসাইটে প্রবেশের মাধ্যমে যে কোনো নিবন্ধের সম্পাদনা করতে পারেন, যা সম্মিলিতভাবে ইন্টারনেটের সর্ববৃহৎ এবং সর্বাধিক জনপ্রিয় সাধারণ তথ্যসূত্রের ঘাটতি পুরণ করতে সাহায্য করে থাকে।

উইকিপিডিয়ার ইতিহাস (History of Wikipedia)

আজ থেকে দুই দশক আগেও তথ্য প্রযুক্তি এতটা সহজ লভ্য ছিলনা। বিভিন্ন সাধারন তথ্যও সাধারণ মানুষের হাতের নাগালের বাইরে ছিল। তাই সবার জন্য তথ্য নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন বিশেষজ্ঞদের লেখা প্রবন্ধ সঙ্কলন করে সেগুলো বিনামূল্যে ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করার উদ্দেশ্যে একটি প্রকল্প শুরু হয়। 1999 সালের অক্টোবর মাসে জিমি ওয়েলস (Jimmy Wales) একটি অনলাইন বিশ্বকোষ তৈরি করার কথা ভাবেন। ২০০০ সালের জানুয়ারিতে তিনি ল্যারি স্যাঙ্গার (Larry Sanger) কে এই প্রকল্পটিকে বাস্তবায়নের বিষয়ে কথা বলেন। ২০০০ সালের মার্চ মাসে এই দুই ব্যক্তির নিজ ইচ্ছাতে এই প্রকল্পটি 'নুপিডিয়া (Nupedia)' নামে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে। প্রথম থেকেই Nupedia একটি মুক্ত বিশ্বকোষ ছিল। নুপিডিয়া ছিল ইংরেজি ভাষায় ওয়েব ভিত্তিক একটি ইন্টারনেট বিশ্বকোষ যার নিবন্ধসমূহ মুক্ত কন্টেন্ট লাইসেন্সের আওতায় উপযুক্ত বিষয়ে দক্ষ ব্যাক্তি কর্তৃক লিখিত এবং বিশেষজ্ঞ সম্পাদকদের দ্বারা পর্যালোচনার পর প্রকাশিত হত। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন জিমি ওয়েলস। এই প্রকল্পটিকে পরিচালনা করতেন বোমিস (Bomis) নামে একটি সংস্থা ও প্রধান সম্পাদকের ভূমিকায় ছিলেন ল্যারি

স্যাঙ্গার। নুপিডিয়া 2000 সালের মার্চ মাস থেকে 2003 সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত কার্যকর ছিল। যদিও এটিকে উইকিপিডিয়ার পূর্বসূরী মনে করা হলেও উইকিপিডিয়ার মতো এখানে লাইভ সম্পাদনার সুবিধা এখানে ছিল না, নুপিডিয়ায় নিবন্ধের বিষয়বস্তু নিয়ন্ত্রনের জন্যে সাত-স্তরের অনুমোদন প্রক্রিয়া নীতি অনুসৃত হত। নুপিডিয়ার নিয়ম-নীতি ছিল একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি মাধ্যমে পূর্বপরিকল্পিত, যার ফলে শুরুর প্রথম বছরে নুপিডিয়ায় মাত্র 21টি অনুমোদিত নিবন্ধ ছিল।

আর এই নুপিডিয়ার বর্ধিত প্রকল্প হিসাবে উইকিপিডিয়া শুরু করা হয়েছিল। নুপিডিয়া ছিল ইংরেজি ভাষার একটি মুক্ত বিশ্বকোষ যেখানে অভিজ্ঞরা বিভিন্ন বিষয়ে লিখতেন এবং একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুযায়ী লেখাগুলি সম্পাদনা করা হত। নিউপিডিয়া মুক্ত তথ্য লাইসেন্সের অধীনে পরিচালনা করা হত কিন্তু রিচার্ড স্টলম্যান (Richard Stallman) উইকিপিডিয়া কার্যক্রমের সাথে যুক্ত হবার পর মুক্ত ডকুমেন্টেশন লাইসেন্সে পরিবর্তন করা হয়। ল্যারি স্যাঙ্গার এবং জিমি ওয়েলস ছিলেন উইকিপিডিয়ার প্রতিষ্ঠাতা। সকলে সম্পাদনা করতে পারে এমন একটি বিশ্বকোষ তৈরির করার উদ্দেশ্যে এবং উইকি প্রকল্প প্রয়োগের মাধ্যমে এটিকে সার্থকভাবে সম্পাদনের কৌশল নির্ধারণের জন্য Nupedia-এর মেইলিংলিস্টে Nupedia-র সহপ্রকল্প হিসাবে একটি উইকি তৈরির প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে 2001 সালের 15ই জানুয়ারি শুধুমাত্র ইংরেজি ভাষার জন্য সর্বপ্রথম www.wikipedia.com ওয়েবসাইটটিকে চালু করা হয়। এই বিশ্বকোষটি সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য প্রাথমিকভাবে আরও কিছু নীতিমালা ও নির্দেশাবলী তৈরি করা হয়েছিল এবং সেইসাথে উইকিপিডিয়া Nupedia থেকে আলাদা একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানের মত কাজ শুরু করেছিল। 2001 সালের মধ্যে উইকিপিডিয়ায় 18টি ভিন্ন ভাষায় প্রায় 20,000 নিবন্ধ তৈরি করা হয়। 2003 সালের শেষের দিকে 26টি ভাষায় কাজ শুরু হয় এবং 2003 সালের মধ্যে মোট 46টি ভাষার উইকিপিডিয়া চালু হয়। 2004 সাল শেষ হবার আগেই মোট 162টি ভাষার উইকিপিডিয়া প্রকল্প শুরু করা হয়।

সবার কাছে বিজ্ঞান এবং অন্যান্য তথ্য পৌঁছে দেবার জন্য 2003 সালে টেক্স (Tex) ব্যবহার করে উইকিপিডিয়ায় গাণিতিক সূত্র সহ বিজ্ঞান বিষয়ক অন্যান্য তথ্য যুক্ত করা হয়। এর ফলে খুব তাড়াতাড়ি ইংরেজি উইকিপিডিয়া 100,000 নিবন্ধের মাইলফলক অতিক্রম করে। একই বছর উইকিপিডিয়ায় লোগো হিসেবে 'সবার জন্য তথ্য এই কথাটি নিশ্চিত করার জন্য "পৃথিবীর ছবি" যুক্ত করা হয়।

উইকিপিডিয়ার লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজন ছিল বিপুল পরিমাণ তথ্য। আর এই তথ্য শুধু মাত্র একটি প্রতিষ্ঠানের কিছু কর্মকর্তাদের পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল না। তাই উইকিপিডিয়া সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় যাতে করে সবাই নিজেদের প্রয়োজনমত এবং অন্যের চাহিদা অনুযায়ী একে অন্যের কাছে তথ্য পৌঁছে দিতে পারে।

2004 সালে পৃথিবীজুড়ে উইকিপিডিয়ার মোট নিবন্ধ সংখ্যা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এক

বছরেই নিবন্ধ সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়। পৃথিবীর 100 টিরও বেশি ভাষায় মোট নিবন্ধ সংখ্যা ৫ লক্ষ থেকে 10 লক্ষে পৌছায়। যার মধ্যে ইংরেজি উইকিপিডিয়ার নিবন্ধ সংখ্যা ছিল অর্ধেকের কিছু কম। এই বিপুল পরিমাণ নিবন্ধ সমূহের সুরক্ষা বৃদ্ধির জন্য এবং ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে উইকিপিডিয়ার সার্ভারগুলো ক্যালিফোর্নিয়া থেকে ফোরিডায় স্থানান্তর করা হয়। ব্যবহারকারীদের সুবিধার জন্য উইকির সফটওয়্যারে ক্যাটাগরি বিশিষ্ট আরও উন্নত করা হয়। 2006 সালে ইংরেজি উইকিপিডিয়ায় মোট নিবন্ধের সংখ্যা 15 লক্ষে পৌঁছায় যা পূর্বের সব নিবন্ধের মাইলফলক অতিক্রম করে। এর ফলশ্রুতিতে 2006 সালে জিমি ওয়েলস ঘোষণা করেন উইকিপিডিয়া যথেষ্ট পরিমাণে বড় হয়েছে এবং তিনি নিবন্ধের মান বাড়ানোর ব্যাপারে তাগিদ দেন যার ফলে Oversight নামে একটি নতুন সুবিধা সংযোজন করা হয়। যাতে কম গ্রহণযোগ্য অথবা যে তথ্য সমূহ গ্রহণযোগ্য নয় তা প্রদর্শন না করার ব্যবস্থা করা হয়। ফলশ্রুতিতে উইকিপিডিয়াকে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ব্র্যান্ড হিসেবে গণ্য করা হয়। শীর্ষস্থানীয় ব্র্যান্ড হিসেবে বিশ্বে উইকিপিডিয়া নিজেকে প্রকাশ করার পর এর নিবন্ধের সংখ্যা বাড়তেই থাকে এবং ক্রমবর্ধমান প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রাখে। এর নিদর্শন স্বরূপ 2007 সালে মোট 250 টি ভাষায় প্রায় 75 লক্ষ নিবন্ধ উইকিপিডিয়ায় যুক্ত হয়। ইংরেজি উইকিপিডিয়াতে প্রতিদিন নিয়মিত প্রায় 1800 নতুন নিবন্ধ যোগ হতে থাকে এবং wikipedia.org ডোমেইনটি ইন্টারনেটের প্রথম 10টি ডোমেইনের মধ্যে একটিতে পরিণত হয়। যার ফলে উইকিপিডিয়ার উপস্থিতি সংবাদ মাধ্যমে জনপ্রিয় হতে থাকে।

উইকিপিডিয়ার বিভিন্ন বিষয়ের ওপর কাজ করার জন্য 2008 সালে গঠিত বিভিন্ন উইকিপ্রকল্প তাদের নিজ নিজ বিষয়ের নিবন্ধগুলো তৈরি ও সমৃদ্ধ করতে থাকে। ওই বছরের এপ্রিলে উইকিপিডিয়ার 1 কোটিতম নিবন্ধটি তৈরি হয় এবং এর কয়েক মাস পরেই ইংরেজি উইকিপিডিয়ার নিবন্ধ সংখ্যা 25 লক্ষ ছাড়িয়ে যায়। 2009 সালের আগস্ট মাসে সব উইকিপিডিয়ার সর্বমোট নিবন্ধ সংখ্যা দাঁড়ায় 1 কোটি 40 লক্ষ। ওই বছরেরই মে মাসে ইংরেজি উইকিপিডিয়ার বিতর্ক নিরসণ কমিটি 'চার্চ অব সায়েন্টোলিজ''-এর আইপি ঠিকানাগুলো থেকে ইংরেজি উইকিপিডিয়ায় সম্পাদনা সুবিধা বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেয়।

2010 সালের মার্চ মাসে উইকিপিডিয়ার ইউরোপিয়ান সার্ভার অতিরিক্ত গরমের কারণে বন্ধ হয়ে যায়। এই বিপদ থেকে রক্ষা পেতে সাময়িক ব্যবস্থা হিসেবে ফ্লোরিডার অতিরিক্ত সার্ভারগুলো চালু করার চেষ্টা করা হয় কিন্তু তাও সম্ভবপর হয়নি। যার ফলে উইকিপিডিয়ার সম্পূর্ণ সিস্টেম সারাবিশ্বে অকেজো হয়ে পড়ে। এ সমস্যাটি দ্রুতই সমাধান করা হয়। এরপর উইকিপিডিয়া নতুন সংস্করণের দিকে ঝুঁকে পরে। যার ফলশ্রুতিতে 2010 সালে 13ই মে সাইটটির নতুন সংস্করণ প্রকাশ করা হয়। নতুন বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে ছিল—নতুন লোগো, নতুন নেভিগেশন টুল সহ আরও নতুন কিছু সুবিধা। যারা পুরনো সংস্করণটি ব্যবহার করতে চান তাদের জন্য আগেরটি ব্যবহারের সুবিধাও রাখা হয়েছিল। উইকিপিডিয়ার 10 তম বার্ষিকী উদযাপন করার লক্ষ্যে 2011 সালের 15ই জানুয়ারী বিভিন্ন দেশে শত

শত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ভারতে উইকিপিডিয়ার প্রসার বাড়ানোর লক্ষ্যে 2011 সালের নভেম্বরে মুম্বাই'য়ে প্রথম ভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এত বিশাল পরিমাণ তথ্য ভাণ্ডার মোবাইল ব্যবহারকারীদের হাতের নাগালে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে বিনামূল্যে মোবাইল দিয়ে উইকিপিডিয়া ব্যবহারের উদ্দেশ্যে 'উইকিপিডিয়া জিরো" নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। উইকিপিডিয়ার এত বিশাল ভাণ্ডারের মাঝে ইন্ডিয়ানার ইন্ডিয়ানাপলিস এর জাস্টিন ক্যানাপ (Justin Knapp) 2012 সালের এপ্রিলে সর্বপ্রথম 1 মিলিয়ন সম্পাদনা করার রেকর্ড অর্জন করেন। উইকিপিডিয়ার প্রতিষ্ঠাতা জিমি ওয়েলস তার কাজের জন্য জাস্টিন ক্যানাপ কে অভিনন্দন জানান এবং তাকে বিশেষ বার্নস্টার পদক দেন এবং তার কৃতিত্বের জন্য তাকে গোল্ডেন উইকি পুরস্কার প্রদান করা হয়। জিমি ওয়েলস জাস্টিনের এই বিশেষ অবদানকে আজীবন স্মরণীয় করে রাখতে 20ই এপ্রিল 'জাস্টিন ক্যানাপ' দিবস ঘোষণা করেন।

বাংলা উইকিপিডিয়া (Bengali Wikipedia)

বাংলা উইকিপিডিয়া হল উইকিপিডিয়ার বাংলা সংস্করণ। এটি উইকিমিডিয়া ফাউন্ডেশন পরিচালনা করে থাকে। বাংলা উইকিপিডিয়া সংস্করণটি 27শে জানুয়ারি 2004 সালে তৈরি করা হয়। এর প্রধান কার্যালয় পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা ও বাংলাদেশের ঢাকায় অবস্থিত। ডিসেম্বর 2016-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, বাংলা উইকিপিডিয়ার নিবন্ধ সংখ্যা 45,755-এর সীমানা অতিক্রম করেছে। এটির বাংলা লিপি সরঞ্জামে একটি লাতিন বর্ণমালা ফনেটিক রয়েছে, সুতরাং যেকোন সফটওয়্যার ডাউনলোড করা ব্যতীত লাতিন বর্ণমালা কি-বোর্ডে বাংলা টাইপের জন্য ব্যবহার করা যায়।

2006 সালে, দেশব্যাপী উইকিপিডিয়া জনপ্রিয় করতে বাংলাদেশ ওপেন সোর্স নেটওয়ার্ক (বিডিওএসএন) কর্তৃক একটি উইকি দল গঠন করা হয়। এই দলের লক্ষ্য ছিল উইকিপিডিয়ার মাধ্যমে বিশ্ব দরবারে বাংলাকে পরিচিত করা ও বাংলা ভাষায় একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্বকোষ তৈরি করা। সেই সময়, বাংলা উইকিপিডিয়ায় মাত্র 500টি নিবন্ধ ছিল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই 'বিডিওএসএন উইকি দল"-এর সাথে আরও অনেকে যোগদান করেন। দলটি সেসময় কিছু সংবাদপত্রের মাধ্যমে উইকিপিডিয়ার কথা ছড়িয়ে দিতে শুরু করে এবং একটি বাংলা উইকি মেইলিং লিস্ট পরিচালনা করা শুরু করে।

এতে শীঘ্রই, দেশ এবং বিদেশের অনেক বাংলাভাষী এই গতিশীল প্রকল্পে যোগদান করা শুরু করে। এর ফলস্বরূপ, অক্টোবরের শেষে, বাংলা উইকিপিডিয়া 10 হাজার নিবন্ধের মাইলফলক স্পর্শ করে। দক্ষিণ এশীয় ভাষার উইকিপিডিয়ার মধ্যে, বাংলা উইকিপিডিয়া প্রথম এই মাইলফলকে পৌঁছে। 2009-2010 সালের মাঝামাঝি সময়ে পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতের বাংলাভাষীগণ বাংলা উইকিপিডিয়ায় অবদান রাখা শুরু করেন। নিবন্ধের সংখ্যা অনুসারে 295টি উইকিপিডিয়ার মধ্যে বাংলা উইকিপিডিয়ার অবস্থান 76তম। বর্তমানে, বাংলা উইকিপিডিয়া ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রায় 129580 জন।

শিক্ষাক্ষেত্রে উইকিপিডিয়ার উপকারিতা (Benefits of Wikipedia in Education)

শিক্ষাক্ষেত্রে উইকিপিডিয়ার ব্যবহারের ফলে, শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষার প্রতি গভীর প্রেষণার সঞ্চার হয়েছে এবং কাম্য আচরণগত শিখন সামর্থ্য ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। তারা এর ফলে অনেক ধরনের দক্ষতাকে অর্জন করতে সচেষ্ট হয়েছে। সেইগুলি হল-

- পঠন দক্ষতা (Reading Skill)
- লিখন দক্ষতা (Writing Skill)
- বিমূর্ত চিন্তন দক্ষতা (Abstract Thinking Skill)
- তথ্য সাক্ষরতা (Information literacy)
- সাহিত্য পর্যালোচনা সংক্রান্ত দক্ষতা (Literature Review Skill)

সামাজিক যোগসূত্র (Social Networking)

সামাজিক যোগসূত্র (সোসাল নেটওয়ার্কিং) হল এমন একধরনের কার্যকলাপ যা বিশেষত ইন্টারনেটের সহায়তায় বিভিন্ন ধরনের তথ্য ও ব্যক্তিগত বার্তা আদান-প্রদানের মাধ্যমে অন্যদের সাথে ব্যক্তিগত ও ব্যবসায়িক সম্পর্ক তৈরি করে। বর্তমানে, সামাজিক যোগসূত্র সাইটের ব্যবহার প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। 1994 সাল থেকে ইন্টারনেটে সামাজিক যোগসূত্রভিত্তিক কার্যকলাপ GeoCities নামক ওয়েবসাইট দিয়ে শুরু হয় যা ব্যবহারকারীগণকে তাদের প্রোফাইল ও বন্ধুর তালিকা তৈরি করতে অনুমতি দেয়। ওয়েব প্রযুক্তির ও তার প্রয়োগের অগ্রগতি হওয়ার পর ব্যবহারকারী তাঁর প্রিয়জনদের সাথে যখন খুশি যোগাযোগের জন্য নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবিত হয়েছে। উইকিপিডিয়া অনুযায়ী, সক্রিয় সামাজিক যোগসূত্র সাইটের সংখ্যা প্রায় 200 ছাড়িয়ে গেছে।

1971 সালে যখন প্রথমবারের মত ই-মেইল প্রেরণ করা সম্ভব হয়েছিল ঠিক তখন থেকেই সোসাল নেটওয়ার্কিংয়ের জন্ম। পরবর্তীকালে, 1978 সালে, বুলেটিন বোর্ড পরিষেবা বা BBS গঠিত হয়। এই প্রযুক্তিতে ব্যক্তিগত কম্পিউটার থেকে ব্যবহারকারীরা মডেমের সহায়তায় ডায়ালের মাধ্যমে একটি হোস্ট কম্পিউটারের সাথে যুক্ত হয় এবং অন্যান্য ব্যবহারকারীদের ফোন লাইনের মাধ্যমে তথ্য বিনিময় করা হত। বিবিএস হল প্রথম সিস্টেম যা ইন্টারনেটের সহায়তায় ব্যবহারকারীদের একে অপরের সাথে যোগাযোগ প্রদান করেছিল।

ঠিক তার পরের বছর, প্রথম ওয়েব ব্রাউজার তৈরি হয় যা Usenet-এর মাধ্যমে তথ্য আদান-প্রদান করত। জিম এলিস এবং টম ট্রাসকট (Jim Ellis & Tom Truscott) Usenet তৈরি করেন যার দ্বারা ব্যবহারকারীরা খবর, নিবন্ধ এবং মজার জিনিস একে অপরের সাথে আদান-প্রদান করতে পারত।

বিবিএস এবং ফোরামের মত, Usenet-এ কোন 'কেন্দ্রীয় সার্ভার' ছিল না। Usenet-এর এই ধারণায় বর্তমানে 'Group' ভিত্তিক সামাজিক যোগসূত্র সংক্রান্ত সাইটের (যেমন - Yahoo! Groups, Google Groups and Facebook Groups) তাত্ত্বিক ধারণা প্রদান করেছিল।

1988 সালে ইনস্ট্যান্ট মেসেজিংয়ের ধারণার জন্ম হয় যা আইআরসি বা ইন্টারনেট রিলে চ্যাট (IRC or Internet Relay Chat) নামে পরিচিত। আইআরসি তখন ইউনিক্স ভিত্তিক ছিল। যার ফলে এই ধরনের সুবিধা শুধুমাত্র কিছু লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

1994 সালে, প্রথম জিওসিটিস (GeoCities) নামে সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট তৈরি করা হয়েছিল। জিওসিটিস সর্বপ্রথম ব্যবহারকারীদের নিজস্ব ওয়েব সাইট তৈরি করার অনুমতি দিয়েছিল। ঠিক তার পরের বছর অর্থাৎ 1995 সালে The Globe.com নামে একটি সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটের জন্ম হয়। এটি বিভিন্ন মানুষের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে তাদের নিজস্ব বিষয়বস্তু ও চিন্তাধারা প্রকাশের ক্ষমতা প্রদান করত। পরবর্তীকালে আরো বেশ কিছু সোসাল নেটওয়ার্কিং সাইটের জন্ম হয়। সেইগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু হল–Classmates, Friendzy, Hi-5 ইত্যাদি।

দুই বছর পরে, ১৯৯৭ সালে এওএল ইনস্ট্যান্ট মেসেঞ্জার (AOL Instant Messenger) এবং SixDegrees.com নামে দুটি সোসাল নেটওয়ার্কিং পরিষেবা চালু হয়। ইনস্ট্যান্ট মেসেজিং ব্যবহারকারীদের নিজস্ব প্রোফাইল তৈরি করতে ও বন্ধুদের সাথে চ্যাট করার স্বাধীনতা প্রদান করেছিল। এওএল ইনস্ট্যান্ট মেসেঞ্জার (AOL Instant Messenger) কে বর্তমানের সামাজিক নেটওয়ার্কিং সাইটগুলির অগ্রদূত হিসাবে পরিগণিত করা হয়। এই সাইটে একজন ব্যবহারকারী তার প্রোফাইলে নিজের সম্পর্কে কিছু লেখার সুযোগ পেত এবং সেই লেখাটিকে সবার সাথে শেয়ার করতে পারত। এই পরিষেবায়, ব্যবহারকারীরা খুব সহজেই অন্যের প্রোফাইল খুঁজে পেতে পারত। এইগুলি সেই সময়ের সবচেয়ে উদ্ভাবনী বৈশিষ্ট্য ছিল।

1997 সালে AsianAvenue প্রতিষ্ঠিত হয়, 1999 সালে BlackPlanet প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ২০০০ সালে হিস্পানিক সার্ভারের জন্য MiGente.com প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম আধুনিক সামাজিক নেটওয়ার্কিং সাইট হল ফ্রেন্ডস্টার (Friendster)। এই প্রধানত একটি ডেটিং সাইট ছিল। প্রথম ৩ মাসেই, ফ্রেন্ডস্টার 3,000,000 ব্যবহারকারীদের একত্রিত করতে পেরেছিল। ঠিক কিছুদিন পরেই, মাইস্পেসের (My Space) জন্ম হয়। মাত্র 10 দিনের কোডিং-র পর চালু করা হয়েছিল। এটি শীঘ্রই ফ্রেন্ডস্টার চেয়ে বেশি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। মাইস্পেস ফ্রেন্ডস্টারের চেয়েও ব্যবহারকারীদের বেশি স্বাধীনতা প্রদান করেছিল যেখানে ব্যবহারকারীদের অডিও ও ভিডিও তথ্য আদান-প্রদানের ব্যবস্থা ছিল।

সোসাল নেটওয়ার্কিংয়ের যুগে আর একটি মাইল ফলক হল LinkedIn। এটি 2003 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটি সাধারণত পেশাদারী এবং ব্যবসায়িক কাজের জন্য তৈরি করা হয়েছিল। বর্তমানে,

LinkedIn-এর সদস্য সংখ্যা প্রায় ৩০ মিলিয়ন। পরবর্তীকালে, 2004 সালে orkut ও facebook এবং 2005 সালে Yahoo!360 প্রতিষ্ঠা লাভ করে। 2006 সালে Twitter-এর জন্ম হয়।

সোসাল নেটওয়ার্কিং-এর সংজ্ঞা (Definition of Social Networking)

Web 2.0-এর ব্যবহারের দ্বারা যে সব বিভিন্ন ধরনের ধারণা ও পরিষেবা পাওয়া যায় তার মধ্যে সামাজিক যোগসূত্র বা সোসাল নেটওয়ার্কিং অন্যতম।

Social Networking 2.0 is defined as applications or web sites that support the maintenance of personal relationships, the discovery of potential relationships and should aid in the conversion of potential ties into weak and strong ties, by utilising emergent Web 2.0 technologies.

অংরিয়া সোফিয়া ভ্যান জিল (Anria Sophia van Zyl)-এর মতে, সোসাল নেটওয়ার্কিং হল Web 2.0 প্রযুক্তি নির্ভর, যা সামাজিক যোগাযোগ, ব্যবসায়িক কার্যকলাপের সম্প্রসারণ করে, ক্রেতাদের সাথে সম্পর্কের উন্নতি করে দক্ষ কর্মীদের ব্যয় সুবিধা যুক্ত নিয়োগ এবং কর্মীদের মধ্যে নীতি, অনুপ্রেরণা এবং কর্মসন্তুষ্টির উন্নতিসাধন করে (Social Networking, incorporating Web 2.0 technologies, has been credited with the ability to expand social contacts, accelerate business processes, the improvement of customer relations, cost-effective recruitment of high-calibre staff, and the improvement of morale, motivation and job satisfaction among staff.)

বয়েড ও এলিসান (Boyd & Ellison)-দের মতে, সোসাল নেটওয়ার্কিং হল ওয়েব নির্ভর পরিষেবা যা ব্যক্তিদের নিম্নলিখিত বিষয়গুলির অনুমতি দেয় — (ক) একটি আবদ্ধ ব্যবস্থার মধ্যে পাবলিক (Public) বা সেমি-পাবলিক (Semi-Public) প্রোফাইল গঠন, (খ) যেসব ব্যবহারকারীগণের সাথে তথ্যের বা মতামতের আদান-প্রদান করা হয় তার একটি তালিকা তৈরি এবং (গ) অন্যান্য ব্যক্তিগণ কর্তৃক তৈরি করা যোগাযোগকারী ব্যক্তিদের তালিকা দেখা ও বিচরণ করা (Social Networking is defined as a web based services that allows individuals to construct a public or semi-public profile, profile within a bounded system, define a list of other users with whom they share a social connection and use the connections made by themselves and others within the system.)

সোসাল নেটওয়ার্কিং সাইটগুলিতে বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা থাকার ফলে যোগাযোগকারী ব্যক্তিদের একটি ডোমেইন তৈরি হয়ে যায় এবং ওই ডোমেইনের অন্তর্গত ব্যবহারকারীদের প্রোফাইল দেখা ও মতামত আদান-প্রদান করা সম্ভবপর হয়। সোসাল নেটওয়ার্কিং সাইটগুলির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা হল এই সাইটগুলি অপরিচিত ব্যক্তিদের সাক্ষাৎ করার অনুমতি প্রদান করে থাকে এবং একইসাথে

একজনের নিজস্ব ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-ভাবনা ও ইচ্ছা প্রকাশের স্বাধীনতা দেয়। এই ধরনের সাইটগুলি মানুষের জীবনের কিছু আদর্শকে অনুমান করে তৈরি করা হয় যেখানে মানুষ একে অপরের সাথে কিভাবে পরিচিত হতে পারে তার উপর ভিত্তি করে যোগসূত্র কাঠামো গড়ে ওঠে।

2004 সালে টিম ও'রেইলি ও ডেল দৌগহের্ট (Tim O'Reilly and Dale Doughert) Web 200 আবিষ্কার করার পর থেকেই ওয়েব ভিত্তিক কমউনিটি তৈরি ও ওয়েব হোস্ট করা মাধ্যমে তথ্য আদান-প্রদান শুরু হয়। সাধারণভাবে, ঢত্রত্ন 2.0 বলতে ওয়ার্ল ওয়াইড ওয়েবের একটি নতুন ধারাকে বোঝানো হয়ে থাকে। এই নতুন ধারাটি বেশ কয়েক বছর থেকে প্রসার লাভ করেছে। এই ধারার মূল লক্ষ্য হল ওয়েবের সৃজনশীলতা, পারস্পরিক যোগাযোগ, নিরাপদ তথ্য আদান-প্রদান, সহযোগিতা এবং কার্যক্ষমতাকে বৃদ্ধি করা। এই নতুন ধারা ওয়েবে বেশ কিছু নতুন সাংস্কৃতিক ও কারিগরি সম্প্রদায়ের জন্ম দিয়েছে। এর মধ্যে বিভিন্ন হোস্টিং সেবাও রয়েছে। এই নতুন সম্প্রদায় ও সেবাগুলির মধ্যে আছে সামাজিক নেটওয়ার্কিংভিত্তিক ওয়েবসাইট, ভিডিও ওয়েবসাইট, উইকি, ব্লগ এবং ফোকসোনমি। Web 2.0-এর মাধ্যমে ওয়েবের একটি নতুন সংস্করণের কথা বলা হলেও এটা আসলে নতুন কোন সফওয়্যার প্লাটফর্ম বা কারিগরি বিষয়ে নতুন কোন প্রজন্মকে নির্দেশ করে না। অর্থাৎ কারিগরি দিক দিয়ে Web ও Web 2.0 এর মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই। পার্থক্য আছে শুধু ব্যবহার এবং উপযোগিতায়। টিম ও'রেইলির মতে, Web 2.0 is the business revolution in the computer industry caused by the move to the Internet as a platform, and an attempt to understand the rules for success on that new platform.

Web 2.0 প্রযুক্তি ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের জন্য একটি নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। যেমন — ওয়েব ব্লগস (Web Blogs), সোসাল বুকমার্কিং (Social Bookmarking), উইকিস (Wikis), পডকাস্টস (Podcasts), সোসাল সফওয়্যার (Social Software), ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস (Web Application Programming Interface) ইত্যাদি প্রযুক্তি ব্যবহারকারীগণকে বিভিন্ন ধরনের তথ্য আদান-প্রদানের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে থাকে।

সোসাল নেটওয়ার্কিং-এর বৈশিষ্ট্যসমূহ (Characteristics of Social Networking)

- সোসাল নেটওয়ার্কিং-এর বৈশিষ্ট্যগুলিকে নিম্নে বর্ণনা করা হল -
- ব্যবহারকারীদের সহজ 'user interface' প্রদান করে থাকে।
- ব্যবহারকারীদের বিনামূল্যে প্রোফাইল খোলার অনুমতি প্রদান করে থাকে।
- বিশেষভাবে অনুসন্ধান করার কার্যকারিতাকে বৃদ্ধি করে থাকে।
- শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন পরিসেবা সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করে থাকে।

- Picture, Audio এবং Video ফাইল আপলোড করার অনুমতি দেয়। বিনামূল্যে ওয়েব স্পেস প্রদান করে থাকে।
- বিভিন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে তথ্যের আদান-প্রদান করে থাকে।
- চ্যাট রুম, ডিসকাশন ফোরাম, ইত্যাদি পরিসেবা প্রদান করে থাকে।
- ব্যবহারকারীদের ব্লগে লেখার অনুমতি প্রদান করে থাকে।
- বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ধরনের মানুষের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে সাহায্য করে থাকে।

সোসাল নেটওয়ার্কিং-এর সুবিধাসমূহ (Advantages of Social Networking) :

সোসাল নেটওয়ার্কিং-এর সুবিধাগুলিকে নিম্নে বর্ণনা করা হল -

- বিশ্বব্যাপী সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে সারা বিশ্বকে একটি পরিবারে রূপান্তরিত করতে সাহায্য করে।
- Online resource তৈরিতে সাহায্য করে থাকে।
- জ্ঞান অর্জন ও জ্ঞান বিতরণের প্রক্রিয়াকে সচল রাখে।
- ব্যক্তিকে অন্যান্য দেশের ব্যক্তিদের সাথে তার নিজস্ব চিন্তাধারাকে প্রকাশ করার সুযোগ প্রদান করে থাকে।
- একই ধরনের রুচি ও ইচ্ছাযুক্ত মানুষদের খুঁজতে সাহায্য করে থাকে।
- দ্রুত তথ্য আদান-প্রদান করতে সাহায্য করে।
- যে সব ব্যক্তিরা একটু লাজুক প্রকৃতির হয় তাদের নিজস্ব ব্যক্তিসত্তাকে প্রকাশের সুযোগ করে দেয়।
- বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংস্থা এই ধরনের সাইটগুলিতে তাদের নিজস্ব পণ্যগুলির বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকেন যার দ্বারা ওই সাইটগুলি ব্যবহারকারী ব্যক্তিরা ওই পণ্যগুলি সম্পর্কে জানতে পারেন।
- এই ধরনের সোসাল নেটওয়ার্কিং সাইটগুলির পেশা অনুসন্ধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্লাটফর্ম হিসাবে কাজ করে থাকে।
- এই সাইটগুলিতে খুব সহজেই কোন একটি বিষয়ভিত্তিক ত্রন্তত্রদ্রষ্ঠ তৈরি করে সেই সম্পর্কে বিভিন্ন মানুষের মতামত পাওয়া যায়, যার দ্বারা ওই বিষয় সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণার জন্ম হয়।।

সোসাল নেটওয়ার্কিং-এর অসুবিধাসমূহ (Disadvantages of Social Networking)

সোসাল নেটওয়ার্কিং-এর অসুবিধাগুলিকে নিম্নে বর্ণনা করা হল -

- ব্যবহারকারী ব্যক্তির মনে মাঝে মাঝে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়।
- সোসাল নেটওয়ার্কিং সাইগুলির মাধ্যমে খুব সহজেই সাইবার ক্রাইম করার সুযোগ থাকে।
- জালিয়াতি ও প্রতারণার ঝুঁকি থাকে।
- কোন কারণে প্রোফাইল হ্যাক হয়ে গেলে নিজস্ব গোপনীয়তাকে রক্ষা করা যায় না।
- অনেক সময় ভুল তথ্য প্রদান করে থাকে।
- ব্যক্তিদের মধ্যে বিশেষ করে যুবকদের মধ্যে সাইটগুলিকে ব্যবহার করার আসক্তি বাড়িয়ে তোলে। বাস্তবিক জগতের সংযোগ অনেকটাই কমিয়ে দেয়।
- বেশি সময় ধরে এই সাইটগুলিকে ব্যবহারের ফলে দৈহিক স্বাস্থ্যেরও অবনতি ঘটে।

কিছু উল্লেখযোগ্য সোসাল নেটওয়ার্কিং সাইট (Some Notable Social Networking Sites)

Facebook :

ফেসবুক হল বর্তমানে পৃথিবীর নাম্বার ওয়ান সোস্যাল মিডিয়া বা সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম। এটি একটি ওয়েবসাইট, যা 2004 সালের 4ঠা ফেব্রুয়ারি প্রতিষ্ঠিত হয়। 1984 সালে নিউ ইয়র্কে জন্ম নেওয়া কম্পিউটার প্রোগ্রামার মার্ক জুকারবার্গ ফেসবুক প্রতিষ্ঠা করেন। এটিতে বিনাখরচে সদস্য হওয়া যায়। এর মালিক হল Facebook Ink. একজন User বা ব্যবহারকারী বন্ধু সংযোজন, বার্তা প্রেরণ এবং তাদের ব্যক্তিগত তথ্যাবলী হালনাগাদ ও আদান প্রদান করতে পারেন, সেই সাথে একজন ব্যবহারকারী শহর, কর্মস্থল, বিদ্যালয় এবং অঞ্চল-ভিত্তিক নেটওয়ার্কেও যুক্ত হতে পারেন। মার্ক জাকারবার্গ (Mark Zuckerberg) হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালীন তার কক্ষনিবাসী ও কম্পিউটার বিজ্ঞান বিষয়ের ছাত্র এডওয়ার্ডো সেভারিন (Eduardo Saverin), আন্দ্রেও ম্যাককল্যাম (Andrew McCollum), ডাস্টিন মস্কোভিত (Dustin Moskovitz) এবং ক্রিস হিউজেসের (Chris Hughes) যৌথ প্রচেষ্টায় ফেসবুক নির্মাণ করেন। 2003 সালে মার্ক জাকারবার্গ, হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিতে পড়াকালীন ফেসবুকের পূর্বসূরি সাইট ফেসম্যাস (Facemash) তৈরি করেন। ঠিক তার পরের বছর 2004 সালের জানুয়ারিতে ফেসম্যাস থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে মার্ক তার নতুন সাইট এর কোড লেখা শুরু করেন এবং ফেব্রুয়ারিতে thefacebook.com-এর উদ্বোধন করেন। 2005 সালের আগস্টে 'The facebook.com' নাম পাল্টে কোম্পানির নাম রাখা হয় 'Facebook'। 2006 সালে ফেসবুকের সাথে Microsoft সম্পর্ক স্থাপন করে। ওই বছরের সেপ্টেম্বর থেকে সর্বসাধারণের জন্য ফেসবুক উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। 2008

সালে কানাডা ও ব্রিটেনের পর ফেব্রুয়ারিতে ফ্রান্স ও স্পেনে ফেসবুক ব্যবহার শুরু হয়। ওই বছর এপ্রিলে ফেসবুক চ্যাট চালু হয়।

LinkedIn :

লিঙ্কডইন সামাজিক যোগাযোগের একটি ওয়েবসাইট যা বিশেষত পেশাজীবীদের জন্য নির্মাণ করা হয়েছিল। এই সাইটটি প্রধানত পেশাদারী নেটওয়ার্কিং তৈরি করার উদ্দেশ্য নিয়ে স্থাপন করা হয়েছিল। বিভিন্ন পেশার মানুষদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করা ও নবাগতদের যোগ্যতা অনুযায়ী পেশা অন্বেষণের ক্ষেত্রে এই সোসাল নেটওয়ার্কিং সাইটটি একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। এই সাইটটি 2002 সালের ডিসেম্বর মাসে প্রতিষ্ঠিত হয় কিন্তু 5ই মে, 2003 সালে আনুষ্ঠানিক ভাবে এই সাইটটিকে চালু করা হয়। রিড হফম্যান (Reid Hoffman) ও জ্যা-লুক ভাইল্যান্ড (Jean-Luc Vaillant) হলেন লিঙ্কডইনের প্রতিষ্ঠাতা। লিঙ্কডইনের প্রোগ্রামিং কোডটি জাভাতে লেখা। বর্তমানে, এই সাইটটিকে আরবি, চাইনিস, ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ, জার্মান, ইতালিয়ান, পর্তুগিজ, স্পেনিশ, ওলন্দাজ, সুইডিশ, রোমানিয়ান, রাশিয়ান, তুর্কি, জাপানিজ, চেক, পোলিশ, কোরিয়ান, ইন্দোনেশিয়ান, মালয় এবং তাগালোগ ভাষায় ব্যবহার করা যায়।

Instagram :

ইন্সটাগ্রাম হল একটি অনলাইন মোবাইল ফটো শেয়ারিং, ভিডিও শেয়ারিং, এবং সামাজিক নেটওয়ার্কিং পরিষেবা যে তার ব্যবহারকারীদের ছবি এবং ভিডিও শেয়ার করা অনুমতি প্রদান করে থাকে। ইন্সটাগ্রামের মাধ্যমে ছবি এবং 640×640 রেসুলিউশেনের 15 সেকেন্ডের দৈর্ঘ্যের ভিডিও আপলোড করা যায়। এই পরিসেবাটিকে 2010 সালের অক্টোবর মাসে আনুষ্ঠানিক ভাবে চালু করা হয়। কেভিন সীসট্রোম (Kevin Systrom) ও মাইক ক্রিয়েগর (Mike Krieger) হলেন ইন্সটাগ্রামের প্রতিষ্ঠাতা। বর্তমানে, এই সাইটটিকে আফ্রিকান, চেক, ডানিস, চাইনিস, ইংরেজি, গ্রিক, ফ্রেঞ্চ, ফিননিস, হিন্দী, ইন্দোনেশিয়ান, জার্মান, ইতালিয়ান, কোরিয়ান, পর্তুগিজ, নরওয়েজীয়, স্পেনিশ, ওলন্দাজ, সুইডিশ, রোমানিয়ান, রাশিয়ান, তুর্কি, জাপানিজ, পোলিশ, মালয় এবং তাগালোগ ভাষায় ব্যবহার করা যায়।

Bebo :

বেবো হল একটি সামাজিক যোগাযোগের ওয়েবসাইট। এই সাইটটি 2005 সালের জানুয়ারী মাসে প্রতিষ্ঠিত হয় কিন্তু 2005 সালের জুলাই মাসে আনুষ্ঠানিক ভাবে এই সাইটটিকে চালু করা হয়। বর্তমানে, এই ওয়েবসাইটটি ক্রাইটেরিওন ক্যাপিটাল পার্টনারস (Criterion Capital Partners) কর্তৃক পরিচালিত হয়। 2005 সালে মিচেল বিচ (Michel Birch) ও জচি বিচ (Xochi Birch) বেবো ওয়েবসাইটটি চালু করেন। এই ওয়েবসাইটে ব্যবহারকারীরা একটি ব্যাক্তিগত প্রোফাইল তৈরি করতে পারে এবং প্রোফাইলে তারা নিজের ইচ্ছেমত ব্লগ লিখতে পারে, ছবি, সঙ্গীত, ভিডিও ও প্রশ্ন রাখতে পারে। অন্যান্য

ব্যবহারকারীদের সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ারও ব্যবস্থা রায়েছে। এছাড়াও ব্যবহারকারীরা নিজের প্রোফাইল ব্যবহার করে অন্যান্য ব্যবহারকারীদের সাথে বার্তার মাধ্যমে যোগাযোগ ও তাদের বন্ধু তালিকায় যুক্ত করতে পারে। বেবো অন্যান্য ফেসবুকের সাথে অনেকটাই সাদৃশ্যপূর্ণ।

Twitter :

টুইটার একটি বহুল প্রচলিত সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট। ফেসবুকের মতই টুইটারে একটি অ্যাকাউন্ট খোলার পর তাতে স্ট্যাটাস আপডেট, কারো ওয়ালে পোস্ট করা, বা কারো ওয়ালে কমেন্ট ইত্যাদি করা যায়। ফেসবুকের মত টুইটারে ফ্রী সাইন আপ করা যায়। তবে ফেসবুকের সাথে এর কিছু ব্যাতিক্রম রয়েছে। যেমন ফেসবুকে যেটাকে বলা হয় স্ট্যাটাস আপডেট টুইটারে সেটিকে বলা হয় টুইট (Tweet)। ফেসবুকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠানো যায় কিন্তু টুইটারে ফলো করা যায়। যেকোন কিছু সম্পর্কে মাত্র 140 ক্যারেক্টারের পোস্ট করা যায়। ছবি এবং নিজস্ব আইডিয়া শেয়ার করা যায়। 2006 সালের মার্চ মাসে টুইটারের যাত্রা শুরু হয়। কিন্তু ২০০৬ সালের জুলাই মাসে জ্যাক ডর্সি (Jack Dorsey) আনুষ্ঠানিকভাবে এর উদ্বোধন করেন। জ্যাক ডর্সি ছাড়াও ইভান উইলিয়ামস (Evan Williams), নোয়া গ্লাস (Noah Glass) ও বিয স্টোন (Biz Stone) হলেন টুইটারের প্রতিষ্ঠাতা। টুইটারের মূল কার্যালয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সান ফ্রান্সিস্কো শহরে। টুইটার সারা বিশ্বজুড়ে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

Flickr :

ফ্লিকার হল একটি ইমেজ হোস্টিং এবং ভিডিও হোস্টিং সোসাল নেটওয়ার্কিং সাইট। এটি 2004 সালের ফেব্রুয়ারী মাসে লুডিকর্প (Ludicorp) কোম্পানি কর্তৃক তৈরি করা হয়। ব্যক্তিগত চিত্র প্রচার এবং সংস্থাপন করার জন্যে ব্যবহারকারীদের নিকট এটি একটি জনপ্রিয় ওয়েবসাইট এবং কার্যকরী অনলাইন কমিউনিটি। ব্লগারদের দ্বারা এই সাইটটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। 2005 সালে ইয়াহু (Yahoo) এই সাইটটিকে কিনে নেয়। বর্তমানে, এই ওয়েবসাইটটিকে চাইনিজ, ইংরেজি, ফরাসি, জার্মানী, ইন্দোনেশীয়, ইতালীয়, কোরিয়ান, পর্তুগিজ স্পেনীয় ও ভিয়েতনামীয় ভাষায় ব্যবহার করা যায়।

Google+ :

গুগল + বা গুগল প্লাস হল গুগলইন কর্পোরেশনের একটি সোশাল নেটওয়ার্কিং ওয়েব পরিসেবা। গুগলের এই পরিসেবাটি 28শে জুন 2011 সালে পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয়। পরবর্তীতে 20ই সেপ্টেম্বর 2011 সালে এটি 18 বছরের উপরের সকল দেশের মানুষদের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। ল্যারি পেইজ (Larry Page) ও সের্গেই ব্রিন (Serge Brin) হলেন এর প্রতিষ্ঠাতা। Google+ হল গুগল কোম্পানির চতুর্থ সামাজিক নেটওয়ার্কিং সাইট। এর আগে Orkut তৈরি হয় (২০০৪ সালে চালু করা হয় ও ২০১৩ সালে বন্ধ হয়ে যায়), তারপর Google Friend Connect তৈরি হয় (যা

২০০৮ সালে তৈরি হয় ও ২০১২ সালে বন্ধ হয়ে যায়) এবং Google Buzz তৈরি হয় (যা ২০১০ সালে চালু হয় ও ২০১১ সালে বন্ধ হয়ে যায়)। গুগল প্লাসের প্রোগ্রামিং কোডটি জাভা স্ক্রিপ্টে লেখা।

Tumblr :

টাম্বলার হল একটি মাইক্রোব্লগিং এবং সামাজিক নেটওয়ার্কিং সাইট। এই সাইটটির সাহায্যে শর্ট ফর্মের ব্লগে মাল্টিমিডিয়া এবং অন্যান্য সামগ্রী পোস্ট করা যায়। এই সাইট ব্যবহারকারীরা অন্যান্য ব্যবহারকারীদের ব্লগ অনুসরণ করতে পারেন। ব্লগাররাও তাদের ব্লগকে ব্যক্তিগত করতে পারেন। এই ওয়েবসাইটে 'ড্যাশবোর্ড' ইন্টারফেস ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরণের পরিসেবাকে ব্যবহার করতে পারেন। ২০০৭ সালে ডেভিড কার্প (David Karp) এই সাইটটি তৈরি করেন। ২০১৩ সালে ইয়াহু (Yahoo) এটিকে কিনে নেয়। ২০০৯ সালে জেফ রক (Jeff Rock) এবং গ্যারেট রস (Garrett Ross) Tumblerette নামে একটি iOS অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করেন। 2010 সালের এপ্রিল মাসে এই পরিসেবা Mobelux নামের একটি অ্যাপ্লিকেশনের সাহায্যে BlackBerry মোবাইলে চালু করা হয়। 2012 সালের মে মাসে টাম্বলার স্টোরিবোর্ড (Storyboard) নামের একটি ব্লগ তৈরি করে যা সঠিক ভাবে পরিচালনার অভাবে 2013 সালের এপ্রিল মাসে বন্ধ হয়ে যায়। 2012 সালের জুন মাসে টাম্বলার তাদের নতুন ভার্সন Tumblr 3.0 তৈরি করেন। Android-এর জন্য একটি অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করা হয়। 2013 সালের এপ্রিল মাসে উইনডোজ ফোনের জন্য অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করা হয়। ২০১৩ সালের মে মাসে Google Glass-এর জন্য অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করা হয়।

Pinterest :

পিন্টারেস্ট হল একটি ওয়েব এবং মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন কোম্পানি, যা একটি ফটো শেয়ারিং ওয়েবসাইট হিসেবে কাজ করে থাকে। এটি ব্যবহারের জন্য নিবন্ধন করার প্রয়োজন পড়ে। এই সাইটটি 2010 সালের মার্চ মাসে পল শিয়ারা (Paul Sciarra), ইভান শার্প (Evan Sharp) এবং বেন সিলবারমান (Ben Silbermann) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। এটি ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র দলের অর্থায়নে কোল্ড ব্রিউ ল্যাবস (Cold Brew Labs) কর্তৃক পরিচালিত হয়। এই সাইটটি বিশ্বব্যাপী নারীদের জন্যই সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় ছিল। 2012 সালের একটি প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে, বিশ্বব্যাপী ব্যবহারকারীদের মধ্যে শতকরা 83% ছিল নারী। বর্তমানে, এই সাইটটিকে ইংরেজি, বোকমাল, নরওয়েজিয়ান, চেক, প্যানিশ, ওলন্দাজ, ফিনিশ, ফরাসি, জার্মান, গ্রিক, ইন্দোনেশিয়, ইতালীয়, জাপানি, কোরিয়, পোলিশ, পর্তুগিজ, রূশ, স্লোভাক, স্প্যানিশ, সুইডিশ, তুর্কী এবং বেন্বা ভাষায় ব্যবহার করা যায়।

VK :

ভিকে হল একটি জনপ্রিয় সোসাল নেটওয়ার্কিং ওয়েবসাইট। এই সাইটটি 2006 সালের সেপ্টেম্বর

মাসে প্রতিষ্ঠিত হয় কিন্তু অক্টোবর মাসে আনুষ্ঠানিক ভাবে এই সাইটটিকে চালু করা হয়। পাভেল দুরভ (Pavel Durov) হলেন ভিকের প্রতিষ্ঠাতা। রাশিয়া এবং সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রগুলি, যেমন ইউক্রেন, বেলারুশ ও কাজাখস্তান-এ এটি সর্বাধিক জনপ্রিয় ওয়েবসাইট। এই সামাজিক নেটওয়ার্কিং পরিষেবাটি বাংলাসহ মোট ৮৩টি ভাষায় উপলবদ্ধ, কিন্তু এটি রুশ ভাষা ব্যবহারকারীদের মধ্যে বেশি জনপ্রিয়। ভিকে ব্যবহারকারীদের প্রোফাইল তৈরি করতে, গ্রুপ তৈরি করতে, ছবি, অডিও ও ভিডিও শেয়ার করতে অনুমতি প্রদান করে থাকে। এছাড়াও, ব্রাউজারভিত্তিক গেম খেলতে সাহায্য করে থাকে।

অনলাইন কনফারেন্সিং (Online Conferencing)

অনলাইন কনফারেন্সিং হল একটি অনলাইন যোগাযোগের মাধ্যম যা দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে থাকে। আর এই অনলাইন অনলাইন কনফারেন্সিং-এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রযুক্তি হল টেলিকনফারেন্সিং। টেলিকনফারেন্সিং হল একটি টেলিফোন মিটিং যা একটি টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে দুই বা ততোধিক স্থানগুলির মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। টেলিফোন কনফারেন্সিং, টেলিফোন কনফারেন্সিং এবং অডিও কনফারেন্সিং এর মতো কারিগরি পদগুলি কখনো কখনো 'টেলিফোনেন্সিংকে" বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। কেবলমাত্র টেলিফোনে, কম্পিউটার, টেলিভিশন, রেডিও, টেলিগ্রাফ এবং টেলিটাইপ্রেটারের মাধ্যমে টেলিফোনে একটি অডিও-ভিডিও বা অডিও-ভিডিও তথ্য প্রেরণ করা যেতে পারে। বিশেষ করে, ইন্টারনেট টেলিকনফারেন্সের মধ্যে রয়েছে ভিডিও কনফারেন্সিং, ওয়েব কনফারেন্সিং, ইন্টারনেট টেলিফোন কনফারেন্সিং।

ইন্টারনেট ফোরাম (Internet Forum)

ইন্টারনেট ফোরাম হল একটি অনলাইন আলোচনার সাইট যেখানে লোকেরা কোন একটি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করতে পারে বার্তা বা ম্যাসেজ পোস্টিং ব্যবস্থার মাধ্যমে। ফোরাম চ্যাট রুমের থেকে আলাদা কেননা এতে চ্যাট রুমের থেকেও বড় মাপের লেখা, আর্কাইভের সুযোগ ইত্যাদি রয়েছে। ইন্টারনেট ফোরাম ব্যবহারকারীদের অ্যাকসেস লেভেল প্রদান করে থাকে অর্থাৎ ব্যবহারকারী কোন সীমা পর্যন্ত ফোরামের সুবিধা ব্যবহার করতে পারবে। ফোরামের নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে ব্যবহারকারীর লিখিত কোন বার্তা মডারেটর বা নিয়ন্ত্রক কর্তৃক পরীক্ষিত না হলে সেটা তাৎক্ষণিক প্রকাশ না করারও ব্যবস্থা রয়েছে। ফোরামের সুনির্দিষ্ট পারিভাষিক ভাষা রয়েছে যেমন কোন একক আলোচনাকে 'থ্রেড' বা 'টপিক' বলা হয়।

আলোচনা ফোরামগুলোর গঠন হয় 'ট্রি স্ট্রাকচার" অর্থাৎ একটির নিচে একটি। একটি ফোরামের অভ্যন্তরে অনেকগুলি উপফোরাম থাকতে পারে যেগুলোতে আবার একাধিক বিষয় বা টপিক থাকতে পারে। একটি ফোরামের টপিকের একাধিক 'থ্রেড' থাকতে পারে যাতে এক বা একাধিক লোক একে অন্যের লিখিত বার্তার জবাব দিয়ে আলোচনা চালাতে পারে। ফোরামের সেটিংয়ের উপর ভিত্তি করে

কোন ব্যবহারকারী নামহীন, নিবন্ধিত অবস্থায় থাকতে পারে। নিবন্ধন ব্যবস্থায় কোন ব্যবহারকারী নিবন্ধন সম্পন্ন করার পর ফোরামে লগ ইন করতে পারে তারপর ফোরামের ব্যবস্থা অনুযায়ী এবং ব্যবহারকারীকে প্রদত্ত সুবিধা অনুযায়ী বার্তা লেখা শুরু করতে পারে। বেশিরভাগ ফোরামেই পোষ্ট করা লেখা পড়ার জন্য ব্যবহারকারীকে নিবন্ধিত হতে হয় না।

ই-লাইব্রেরি (e-Library)

পৃথিবী এখন হাতের মুঠোয়। জ্ঞান পিপাসুদের তৃষ্ণা মেটাতে বিশ্বের খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয় ও লাইব্রেরিগুলো ইন্টারনেট ভিত্তিক কার্যক্রম চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যেকোনো দেশের মানুষ স্বনামধন্য এই লাইব্রেরিগুলো ব্যবহার করতে পারবে, দেখতে পারবে লাইব্রেরির ক্যাটালগ, স্থাপনা, ছবি, স্ট্যাম্প সহ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও দুর্লভ বই, জার্নাল। কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে লাইব্রেরির কার্যক্রম পরিচালনা ও সবার জন্য নির্দিষ্ট ওয়েব ঠিকানায় উন্মুক্ত করে দেওয়াকে ডিজিটাল লাইব্রেরি বলা হয়। সর্বপ্রথম নাসা 1994 সালে ই-লাইব্রেরি শব্দটি ব্যবহার করে এবং তাদের নিজস্ব তথ্যগুলো স্ক্যান করে কম্পিউটারে ঢুকিয়ে ডিজিটাল লাইব্রেরি চালুর সিদ্ধান্ত নেয়।

জ্ঞানচর্চার জন্য বই পড়ার কোনো বিকল্প নেই। আধুনিক প্রযুক্তির এই যুগে নিজেকে সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি বাইরের দুনিয়ার খোঁজখবরও রাখতে হয়। মুহূর্তেই গোটা বিশ্বের তথ্যভান্ডারের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে এখন প্রচলিত হচ্ছে 'ই-লাইব্রেরি"। ই-লাইব্রেরি হল অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে গঠিত এমন এক লাইব্রেরি, যেখানে মুদ্রিত বইয়ের

পাশাপাশি ইলেকট্রনিক বই বা ই-বুক পড়ার সুযোগ থাকে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে দুনিয়ার যেকোনো জায়গার নির্দিষ্ট লাইব্রেরি বা প্রকাশকের ডেটাবেসে যুক্ত হয়ে ডিজিটাল প্রকাশনা পাওয়া যায়। ই-লাইব্রেরির প্রথম ধাপেই থাকে ডিজিটাল ক্যাটালগ। গতানুগতিক কাগজের কার্ডগুলো রূপান্তরিত হচ্ছে ডিজিটাল কার্ডে, অর্থাৎ বইয়ের তথ্যগুলো অর্থাৎ বইয়ের নাম, লেখক, প্রকাশক, বছর ও অন্যান্য তথ্য থাকবে ডিজিটালে। এর ফলে খুব সহজেই আমরা কাঙ্খিত বইটি খুঁজে পেতে পারি ক্যাটালগ কার্ডে। সব লাইব্রেরি এভাবে তাদের বইয়ের তথ্যগুলো ডিজিটালে রূপান্তরিত করছে। অনেক ই-লাইব্রেরি বই খোঁজার এই সুবিধাটি দেয় অনলাইনে বা কোনো ইন্টারনেট ব্রাউজারের মাধ্যমে।

এই সিস্টেমটি দিয়েই আমরা কোনো বই ইচ্ছে করলে দেখতে ও কিনতে পারি। অর্থাৎ পুরো লাইব্রেরির বই ম্যানেজমেন্টের কাজগুলো ই-লাইব্রেরির কল্যাণে দ্রুত ও সহজেই করতে পারা যায়। ই-লাইব্রেরিতে আমরা খুব সহজেই আমাদের নাম লগইন করে দেখে নিতে পারেন আমরা বর্তমানে কী কী বই লাইব্রেরি থেকে ধার নিয়েছেন এবং কবে তা ফেরত দিতে হবে। এরপরের স্তরে ই-লাইব্রেরি যে সুবিধা দিয়ে থাকে তা হল শুধু বইয়ের তথ্যগুলো ডিজিটালে নয়, বইগুলোই থাকে ডিজিটালে। অর্থাৎ বই বলতে যে কাগজের মলাট দেওয়া বস্তুটিকে আমরা জানি, সেটি লুপ্ত হয়েই আসছে ই-বুক

বা ই-বই। আমরা খুব সহজেই বইটি ডাউনলোড করে নিতে পারি কমপিউটারে এবং তা পড়তে পারি। এ ছাড়া মাইক্রোফিল্মে সংগৃহীত আর্কাইভগুলোকে ডিজিটালে রূপান্তর করে কমপিউটারে দেখার সুযোগ থাকছে। এছাড়া সহজে বই পড়ার জন্য বেশ কিছু ডিভাইস বাজারে এসেছে। এর মধ্যে সোনির ই-বুক রিডার বেশ জনপ্রিয়।

কিছু উল্লেখযোগ্য ই-লাইব্রেরি (Some Notable-Library)

ইউনিভার্সাল ডিজিটাল লাইব্রেরি (Universal Digital Library) : যুক্তরাষ্ট্রের কার্নেগিমেলন বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগে 2002 সালে এই লাইব্রেরি যাত্রা শুরু করে। শুরুতে তাদের বই সংখ্যা ছিল মাত্র এক হাজার, এখন মোট বইয়ের সংখ্যা 15 লক্ষ, যে সব বইয়ের কপিরাইট স্বত্ব মেয়াদোত্তীর্ণ হয়ে গেছে সে সব বই ও বিখ্যাত লেখকদের ব্যক্তিগত অনুমতি সাপেক্ষে স্ক্যানিং করে এই লাইব্রেরি গড়ে তোলা হচ্ছে। প্রতিদিন প্রায় নতুন করে 1 হাজার বই স্ক্যানিং করে রাখা হচ্ছে এই লাইব্রেরিতে। 20টি ভিন্ন ভাষায় রচিত বইয়ের সমাহার আছে এই লাইব্রেরিতে। 9 লক্ষ 70 হাজার চীনা, 3 লক্ষ 60 হাজার ইংরেজি, 50 হাজার তেলেগুতে, 40 হাজার আরবি ভাষার বই রয়েছে এখানে। প্রাথমিকভাবে আমেরিকাতে শুরু হলেও এই কার্যক্রম দ্রুত চীন, ভারত ও মিশরে ছড়িয়ে পড়ে। চীন, ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র এই কাজের উন্নয়নের জন্য এক কোটি ডলার করে সাহায্য দিয়েছে। এগিয়ে এসেছে সার্চ ইঞ্জিন গুগল, ইয়াহু ও সফটওয়্যার নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান মাইক্রোসফট তবে এ কাজটি সম্পূর্ণ অবাণিজ্যিক। বিষয় ভিত্তিক বই খুঁজে নেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে এখানে।

উইকিপিডিয়া (Wikipedia) : উইকিপিডিয়া হল অন-লাইন ভিত্তিক এনসাইক্লোপিডিয়া। এর যাত্রা শুরু হয় 2001 সালে। বর্তমানে এটি ওয়েব সাইট ভিত্তিক সবচেয়ে বড় রেফারেন্স ভান্ডার। প্রায় 260টি ভাষায় 1 কোটি প্রবন্ধ রয়েছে এখানে। প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বিভিন্ন দেশ যেমন জাপান, চীন, মিশর, ভারত, রাশিয়া তাদের নিজস্ব ঐতিহ্য ও ইতিহাসের সেরা নিদর্শনের বিবরণ দিয়ে প্রবন্ধ পাঠাতে থাকে। এটি উইকিপিডিয়া ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে জেমি ওয়েলস-এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে। নিজ দেশের সর্বশেষ তথ্য জানা থাকলে আপনি নিজেই এডিট করে দিতে পারেন সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধটি।

ব্রিটিশ লাইব্রেরি (British Library) : 1973 সালে লন্ডনে দু'টি শাখা নিয়ে এই লাইব্রেরি যাত্রা শুরু করে। 1972 সালের ব্রিটিশ লাইব্রেরি অ্যাক্ট অনুসারে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। 40টি দেশ থেকে গুরুত্বপূর্ণ বই, জার্নাল, ছবি, ডাকটিকেট, রিপোর্ট সংগ্রহ করে এই লাইব্রেরি গড়ে উঠে। বর্তমানে এখানে 2 কোটি 40 লক্ষ বইসহ মোট প্রায় 15 কোটি আইটেম রয়েছে। এতে রয়েছে প্রায় 1 কোটি পত্রিকা, 2 লক্ষ ভিডিও ও অডিও ক্যাসেট এবং 72 হাজার ডাকটিকেট ও পোষ্ট কার্ড। 1998 সাল থেকে লাইব্রেরি কর্তৃপক্ষ নেট ভিত্তিক বই আদান প্রদান কার্যক্রম চালু করে। বর্তমানে এর ওয়েব সাইটে রয়েছে 2 কোটি বই ও 30 হাজার অন্যান্য আইটেম।

ওয়ার্ল্ড ডিজিটাল লাইব্রেরি (World Digital Library) : যে বইগুলো হারিয়ে যাচ্ছে এবং যে বইগুলো পাঠক নন্দিত সে বইগুলো নিয়ে ইউনেস্কো 2003 সালে গড়ে তোলে ওয়ার্ল্ড ডিজিটাল লাইব্রেরি। 45টি সদস্য রাষ্ট্রের জাতীয় লাইব্রেরি থেকে বই সংগ্রহ করে এই লাইব্রেরি গড়ে তোলা হয়েছে। 2004 সালে যুক্তরাষ্ট্র ইউনেস্কো পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর ইউরোপীয় দেশগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করে। 2005 সালে সার্চ ইঞ্জিন গুগল এর উন্নয়নে 30 লক্ষ ডলার দান করে। প্রায় সবদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, কৃষ্টি, অর্থনীতি নিয়ে এখানে বই রয়েছে। 23 লক্ষ ডিজিটাল বই ও জার্নালের সমাহার এই লাইব্রেরি।

ডিজিটাল লাইব্রেরি অব ইন্ডিয়া (Digital Library of India) : ভারতের প্রযুক্তি নগরী ব্যাঙ্গালোরের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স এই লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করে 2000 সালে। মানুষকে প্রযুক্তি জ্ঞানে উন্নত করাই এর মূল লক্ষ্য। এই লাইব্রেরিতে 1 কোটি বই রয়েছে। প্রায় হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্য সম্পন্ন বইগুলো ধরে রাখতে এটি সর্বোত্তম পদ্ধতি।

লাইব্রেরি অব কংগ্রেস (Library of CongressV) : এটি যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় লাইব্রেরি। ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত এই লাইব্রেরিতে প্রায় 3 কোটি 11 হাজার বইসহ মোট 13 কোটি 83 লক্ষ আইটেম রয়েছে। প্রতি বছর এটির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে 600 মিলিয়ন ডলার খরচ করতে হয় যার 60 শতাংশই ব্যয় হয় কর্মচারীদের বেতনের পেছনে। তাই 1800 সালে প্রতিষ্ঠিত এই লাইব্রেরির পেছনে ব্যয় রোধ করতে তাকে কম্পিউটারাইজড করার চিন্তা করা হয়। এতে এখন 28 লক্ষ ডিজিটাল বই রয়েছে।

ন্যাশনাল লাইব্রেরি অব স্কটল্যান্ড (National Library of Scotland) : এটি স্কটল্যান্ডের সবচেয়ে বড় লাইব্রেরি। 490টি ভাষায় সমৃদ্ধ ও দুর্লভ বইগুলো নিয়ে সাজানো হয়েছে এই লাইব্রেরি। এতে প্রায় 14 লক্ষ স্ক্যান করা বই ও প্রবন্ধ রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে 1 লক্ষের মত দলিলপত্র। তাছাড়া 20 লক্ষ ম্যাপ, 25 হাজার পত্রিকা রয়েছে এখানে। প্রতি বছর নতুন করে এর সাথে যুক্ত হচ্ছে 32 হাজার স্ক্যান করা বই। স্কটল্যান্ডের 100 বছরের ইতিহাসের উপর রয়েছে ডকুমেন্টারি ও 1 হাজার ভিডিও ক্লিপ।

ইউরোপিয়ান লাইব্রেরি (European Library) : ইউরোপীয়রা শুরু থেকেই কপিরাইট ভঙ্গ করে এই ডিজিটাল লাইব্রেরি গড়ে তোলার বিপক্ষে ছিল কিন্তু 2000 সালে ইউরোপীয় ইউনিয়নের শিক্ষা ও প্রযুক্তি কমিশন একবিংশ শতাব্দীর নতুন এজেন্ডা ঠিক করে যে মেয়াদোত্তীর্ণ বইগুলো কম্পিউটারাইজড করে সবার জন্য উন্মুক্ত করে দিতে হবে। প্রথম পর্যায়ে ফিনল্যান্ড, ব্রিটেন, নেদারল্যান্ড, জার্মানি, ইতালি, পর্তুগালসহ 9টি দেশ এতে অংশগ্রহণ করে। অবশেষে 2005 সালের 17ই মার্চ গঠিত হয় ইউরোপীয় লাইব্রেরি। বর্তমানে প্রায় 27টি সদস্য রাষ্ট্রের জাতীয় লাইব্রেরি থেকে দুর্লভ বই ও প্রবন্ধ

সংগ্রহে কাজ করে যাচ্ছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন। প্রতি বছর ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের মধ্যে 5 লক্ষ জন এই লাইব্রেরি ভিজিট করে থাকেন।

ইন্টারন্যাশনাল চিল্ড্রেন ডিজিটাল লাইব্রেরি (International Children Digital Library) : প্রায় 49টি ভিন্ন ভাষায় রচিত শিশুদের মজার মজার বই নিয়ে এটি তৈরি করা হয়েছে। 166টি দেশে এই লাইব্রেরির স্টাফরা তথ্য সংগ্রহের কাজ করে যাচ্ছে। এতে প্রায় 3 হাজার 119টি বই রয়েছে। চীন, দক্ষিণ আফ্রিকা এর সার্বিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে।

3.7 সারসংক্ষেপ (Summary)

তথ্যপ্রযুক্তিকে শুধুমাত্র কম্পিউটারের মধ্যে সীমিত না রেখে মোবাইল ফোন, রেডিও, টেলিভিশন, নেটওয়ার্কিং কিংবা সকল তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণের ব্যপক অর্থে ব্যবহার করার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ করতে হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অন্তর্ভূক্ত করার নানাবিধ প্রয়াস দেখা যায়। বিভিন্ন দেশের সরকার তাদের নাগরিকদেরকে তথ্যপ্রযুক্তিতে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে শিক্ষাক্রমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

'ভার্চুয়াল শ্রেণীকক্ষ" শব্দটি তুলনামূলকভাবে নতুন একটি ধারণা এবং এই ধারণাটি শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির দ্রুত ব্যবহারকে নির্দেশ করার উদ্দেশ্যে দূরবর্তী শিক্ষা থেকে আবির্ভূত হয়েছে। যদিও এই ধারণাটি শিক্ষাক্ষেত্রে খুবই নতুন একটি ধারণা তবুও সাংগঠনিক দিক দিয়ে এটি একটি প্রচলিত বা গতানুগতিক শ্রেণীকক্ষের মৌলিক কাজগুলিকে সঠিক ভাবে পালন করতে সক্ষম হয়েছে। প্রচলিত শ্রেণীকক্ষগুলি থেকে এর পার্থক্য হল যে এই ধরনের শ্রেণীকক্ষগুলি ইন্টারনেট ও সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তির সাহায্যে পরিচালিত হয়ে থাকে। 'ভার্চুয়াল শ্রেণীকক্ষ" শব্দটিকে বিভিন্ন ভাবে ও বিভিন্ন উপায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। ভার্চুয়াল শ্রেণীকক্ষ হল একটি শিক্ষণ-শিখন পরিবেশ যেখানে অংশগ্রহণকারীরা একক ভাবে বা দলের অন্তর্গত হয়ে শিখন সম্পদকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের মধ্যে মিথক্রিয়া করতে পারে, যোগাযোগ করতে, দেখতে এবং কোনো বিষয়কে উপস্থাপনা করে সেই সম্পর্কে আলোচনা করতে পারে। শিক্ষার প্রচলিত ধারার শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতির পরিবর্তে শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতিতে তথ্য-প্রযুক্তির সংযোগ ঘটানো হয়েছে। শ্রেণি কার্যক্রমে অন্যান্য শিক্ষা উপকরণের মতো প্রযুক্তিকেও একটি শিক্ষা উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা শুরু হয়েছে, যা শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন মেটাতে সহায়তা করছে। কম্পিউটার শিক্ষা বা ল্যাবভিত্তিক বদ্ধমূল ধারণা থেকে বেরিয়ে এসে তথ্য-প্রযুক্তিকে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রমে কাজে লাগানো হচ্ছে। এক্ষেত্রে কম্পিউটার বা অন্যান্য তথ্য-প্রযুক্তি ব্ল্যাকবোর্ডের পাশাপাশি শ্রেণিকক্ষে ব্যবহৃত একটি আধুনিক শিক্ষা উপকরণ হিসেবে কাজ করছে। বর্তমানে শ্রেণীকক্ষে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপকরণের পাশাপাশি শ্রেণিকক্ষে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ল্যাপটপ, ইন্টারনেট মডেম ও স্পীকারের সমন্বয় ঘটানো হয়েছে। আর এই ধরনের শ্রেণিকক্ষকেই বলা হচ্ছে 'স্মার্ট শ্রেণীকক্ষ।

ব্লেন্ডেড লার্নিং মূলত ট্র্যাডিশনাল টিচিং মেথডের সাথে ই-লার্নিং-এর সমন্বয়ে একটি হাইব্রিড টিচিং মেথড তৈরি করে। কিন্তু আমরা ডিজিটাল শ্রেণীকক্ষ বলতে যা বুঝি তার সাথে ব্লেন্ডেড লার্নিং-এর পার্থক্য আছে। এই সিস্টেম গতানুগতিক শেখার পদ্ধতির বেসিক টেকনিককে পরিবর্তন করেছে। সশরীরে উপস্থিতি ও ভার্চুয়াল পদ্ধতির সংমিশ্রণে শিক্ষা কার্যক্রম চালানোকে সহজ ভাষায় ব্লেন্ডেড শিক্ষা বলা হয়ে থাকে। এ ধরনের শিক্ষায় শ্রেণিকক্ষের একঘেঁয়েমি কাটানোর জন্য কিছু সময় মুখের বক্তৃতা ও কিছু সময় আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে পাঠদান করা হয়। পাঠদানে বৈচিত্র্য আনতে ও তা আনন্দময় করতে ব্লেন্ডেড শিক্ষণ পদ্ধতির উদ্ভব হয়েছে। ব্লেন্ডেড শিক্ষাপদ্ধতি নতুন কিছু নয়। প্রথমদিকে শিশু ও বয়স্ক শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্লেন্ডেড শিক্ষার কথা ভাবা হলেও পরবর্তী সময়ে প্রযুক্তির সাহায্যে লেখাপড়াকে সহজ করে তোলাই এর মূল উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। মূল্যবান সময়কে জয় করে সব মানুষের জন্য দ্রুত আধুনিক শিক্ষা ও প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহারের নিরিখে এটাকে আধুনিক শিক্ষার নীতি ও রূপরেখার মধ্যে বিবেচনা করা শুরু হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয় 1960 সালে এই পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের চিন্তা শুরু করে। এরপর প্লাটো বা 'প্রোগ্রামড লজিক ফর অটোমেটিক টিচিং" অর্থাৎ স্বয়ংক্রিয়ভাবে শেখাতে পারে এমন একটি উদ্যোগ হাতে নেওয়া হয়।

প্রযুক্তির ব্যবহার মানুষের জীবনকে সহজ করে দিয়েছে। বর্তমানে মানুষের জীবন প্রণালী, আধুনিক জীবন পুরোপুরিভাবে প্রযুক্তি নির্ভর হয়ে পড়েছে। তাই প্রযুক্তিকে বাদ দিয়ে আধুনিক জীবন কল্পনা করা যায় না। প্রযুক্তির কল্যাণে মানুষের জীবন আরও গতিশীল আরও উন্নয়নমুখী হচ্ছে। এই কারণে সমগ্র বিশ্ব পরিণত হচ্ছে প্রযুক্তি নির্ভর একটি বিশ্বে। এ যেন আধুনিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ। এই প্রযুক্তির উন্নয়নে যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজ থেকে সহজতর হয়েছে। মুহূর্তের মধ্যে বার্তা প্রেরিত হচ্ছে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে। ইলেকট্রনিক মেইলের সংক্ষিপ্ত রূপ হল ই-মেইল যা এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে মানুষ পরস্পর পরস্পরের সাথে যোগাযোগ করে থাকে।

নিজের প্রাত্যহিক জীবনের কিছু ঘটনা অথবা কোন একটি নির্দিষ্ট ঘটনা নিয়ে ধারাবাহিক ভাবে লিখা বা কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর ধারাবাহিক ভাবে লিখার মাধ্যমে ইন্টারনেটে সবার সাথে শেয়ার করাকে বলা হয় ব্লগিং। যেসব ওয়েবসাইটে এই লেখাগুলো প্রকাশ করা হয় তাকে ব্লগ বলে। Blog শব্দটির আবির্ভাব Weblog থেকে। Weblog শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করা হয় 1997 সালের 17ই ডিসেম্বর। শব্দটির স্রষ্টা মার্কিন নাগরিক জন বার্জার (Jorn Barger)। এর ঠিক দু'বছর পর 1999 সালের এপ্রিল এবং মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে পিটার মহোলজ (Peter Merholz) নামে একব্যাক্তি Weblog শব্দটিকে ভেঙ্গে দুই ভাগ করেন -We Blog এর পরই সারা বিশ্বব্যাপী ব্লগ জনপ্রিয় হতে শুরু করে।

উইকিপিডিয়া হল ইন্টারনেট জগতের বৃহত্তম এবং সমৃদ্ধতম তথ্যভাণ্ডার। এখানে পৃথিবীর

উল্লেখযোগ্য প্রত্যেকটি বিষয়ের উপর এনসাইক্লোপিডিয়া বা সুবিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। উইকিপিডিয়া একটি ওয়েব-ভিত্তিক, বহু-ভাষীক, বিশ্বকোষ যা উইকিমিডিয়া ফাউন্ডেশন নামের একটি প্রতিষ্ঠান দ্বারা পরিচালিত হয়। উইকিমিডিয়া ফাউন্ডেশন (Wikimedia Foundation) একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান। এর প্রধান কার্যালয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার সানফ্রান্সিস্কো শহরে।

বাংলা উইকিপিডিয়া হল উইকিপিডিয়ার বাংলা সংস্করণ। এটি উইকিমিডিয়া ফাউন্ডেশন পরিচালনা করে থাকে। বাংলা উইকিপিডিয়া সংস্করণটি 27শে জানুয়ারি 2004 সালে তৈরি করা হয়। এর প্রধান কার্যালয় পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা ও বাংলাদেশের ঢাকায় অবস্থিত। ডিসেম্বর 2016-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, বাংলা উইকিপিডিয়ার নিবন্ধ সংখ্যা 45,755-এর সীমানা অতিক্রম করেছে। এটির বাংলা লিপি সরঞ্জামে একটি লাতিন বর্ণমালা ফনেটিক রয়েছে, সুতরাং যেকোন সফটওয়্যার ডাউনলোড করা ব্যতীত লাতিন বর্ণমালা কি-বোর্ডে বাংলা টাইপের জন্য ব্যবহার করা যায়। সামাজিক যোগসূত্র (সোসাল নেটওয়ার্কিং) হল এমন একধরনের কার্যকলাপ যা বিশেষত ইন্টারনেটের সহায়তায় বিভিন্ন ধরনের তথ্য ও ব্যক্তিগত বার্তা আদান-প্রদানের মাধ্যমে অন্যদের সাথে ব্যক্তিগত ও ব্যবসায়িক সম্পর্ক তৈরি করে। বর্তমানে, সামাজিক যোগসূত্র সাইটের ব্যবহার প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। 1994 সাল থেকে ইন্টারনেটে সামাজিক যোগসূত্রভিত্তিক কার্যকলাপ GeoCities নামক ওয়েবসাইট দিয়ে শুরু হয় যা ব্যবহারকারীগণকে তাদের প্রোফাইল ও বন্ধুর তালিকা তৈরি করতে অনুমতি দেয়। ওয়েব প্রযুক্তির ও তার প্রয়োগের অগ্রগতি হওয়ার পর ব্যবহারকারী তাঁর প্রিয়জনদের সাথে যখন খুশি যোগাযোগের জন্য নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবিত হয়েছে। উইকিপিডিয়া অনুযায়ী, সক্রিয় সামাজিক যোগসূত্র সাইটের সংখ্যা প্রায় 200 ছাড়িয়ে গেছে।

অনলাইন কনফারেন্সিং হল একটি অনলাইন যোগাযোগের মাধ্যম যা দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে থাকে। আর এই অনলাইন অনলাইন কনফারেন্সিং-এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রযুক্তি হল টেলিকনফারেন্সিং। টেলিকনফারেন্সিং হল একটি টেলিফোন মিটিং যা একটি টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে দুই বা ততোধিক স্থানগুলির মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। টেলিফোন কনফারেন্সিং, টেলিফোন কনফারেন্সিং এবং অডিও কনফারেন্সিং এর মতো কারিগরি পদগুলি কখনো কখনো 'টেলিফোনেন্সিংকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

ইন্টারনেট ফোরাম হল একটি অনলাইন আলোচনার সাইট যেখানে লোকেরা কোন একটি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করতে পারে বার্তা বা ম্যাসেজ পোষ্টিং ব্যবস্থার মাধ্যমে। ফোরাম চ্যাট রুমের থেকে আলাদা কেননা এতে চ্যাট রুমের থেকেও বড় মাপের লেখা, আর্কাইভের সুযোগ ইত্যাদি রয়েছে। ইন্টারনেট ফোরাম ব্যবহারকারীদের অ্যাকসেস লেভেল প্রদান করে থাকে অর্থাৎ ব্যবহারকারী কোন সীমা পর্যন্ত ফোরামের সুবিধা ব্যবহার করতে পারবে। ফোরামের নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে ব্যবহারকারীর লিখিত কোন বার্তা মডারেটর বা নিয়ন্ত্রক কর্তৃক পরীক্ষিত না হলে সেটা তাৎক্ষণিক প্রকাশ

না করারও ব্যবস্থা রয়েছে। পৃথিবী এখন হাতের মুঠোয়। জ্ঞান পিপাসুদের তৃষ্ণা মেটাতে বিশ্বের খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয় ও লাইব্রেরিগুলো ইন্টারনেট ভিত্তিক কার্যক্রম চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যেকোনো দেশের মানুষ স্বনামধন্য এই লাইব্রেরিগুলো ব্যবহার করতে পারবে, দেখতে পারবে লাইব্রেরির ক্যাটালগ, স্থাপনা, ছবি, স্ট্যাম্প সহ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও দুর্লভ বই, জার্নাল। কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে লাইব্রেরির কার্যক্রম পরিচালনা ও সবার জন্য নির্দিষ্ট ওয়েব ঠিকানায় উন্মুক্ত করে দেওয়াকে ডিজিটাল লাইব্রেরি বলা হয়। সর্বপ্রথম নাসা 1994 সালে ই-লাইব্রেরি শব্দটি ব্যবহার করে এবং তাদের নিজস্ব তথ্যগুলো স্ক্যান করে কম্পিউটারে ঢুকিয়ে ডিজিটাল লাইব্রেরি চালুর সিদ্ধান্ত নেয়।

জ্ঞানচর্চার জন্য বই পড়ার কোনো বিকল্প নেই। আধুনিক প্রযুক্তির এই যুগে নিজেকে সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি বাইরের

দুনিয়ার খোঁজখবরও রাখতে হয়। মুহূর্তেই গোটা বিশ্বের তথ্যভাণ্ডারের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে এখন প্রচলিত হচ্ছে 'ই-লাইব্রেরি'। ই-লাইব্রেরি হল অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে গঠিত এমন এক লাইব্রেরি, যেখানে মুদ্রিত বইয়ের পাশাপাশি ইলেকট্রনিক বই বা ই-বুক পড়ার সুযোগ থাকে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে দুনিয়ার যেকোনো জায়গার নির্দিষ্ট লাইব্রেরি বা প্রকাশকের ডেটাবেসে যুক্ত হয়ে ডিজিটাল প্রকাশনা পাওয়া যায়।

3.8 প্রশ্নাবলি (Questions)

1. 'ভার্চুয়াল শ্রেণীকক্ষ" কাকে বলে?
2. ভার্চুয়াল শ্রেণীকক্ষের বৈশিষ্ট্যগুলি লেখ।
3. ভার্চুয়াল শ্রেণীকক্ষের উপাদানগুলিকে আলোচনা করো।
4. ভার্চুয়াল শ্রেণীকক্ষ তৈরি করার কারণগুলিকে লেখ।
5. ভার্চুয়াল শ্রেণীকক্ষের সুবিধা ও অসুবিধাগুলিকে আলোচনা করো।
6. 'স্মার্ট শ্রেণীকক্ষ" কি?
7. স্মার্ট শ্রেণীকক্ষের উদ্দেশ্যগুলি কি কি?
8. স্মার্ট শ্রেণীকক্ষের প্রকারভেদগুলি লেখ।
9. স্মার্ট শ্রেণীকক্ষের বৈশিষ্ট্যগুলিকে আলোচনা করো।
10. স্মার্ট শ্রেণীকক্ষের উপাদানগুলিকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করো।

11. স্মার্ট শ্রেণীকক্ষের সুবিধা ও অসুবিধাগুলিকে আলোচনা করো।
12. ব্লেন্ডেড লার্নিং বা মিশ্র শিখনের ধারণা দাও।
13. ব্লেন্ডেড লার্নিং বা মিশ্র শিখন মডেলগুলি কি কি?
14. ব্লেন্ডেড লার্নিং-এর গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলি লেখ।
15. ব্লেন্ডেড লার্নিং বা মিশ্র শিখনের সুবিধাগুলিকে আলোচনা করো।
16. ই-মেইল কি?
17. ইন্টারনেটে সংযোগ স্থাপন পদ্ধতিগুলি কি কি?
18. ব্লগ কি?
19. ব্লগের প্রকারভেদগুলি কি কি?
20. উইকিপিডিয়া কি?
21. বাংলা উইকিপিডিয়া সম্পর্কে একটি টীকা লেখ।
22. শিক্ষাক্ষেত্রে উইকিপিডিয়ার উপকারিতাগুলো আলোচনা করো।
23. সামাজিক যোগসূত্র (সোসাল নেটওয়ার্কিং) কি?
24. অনলাইন কনফারেন্সিং বলতে কি বোঝ?
25. ইন্টারনেট ফোরাম কি?
26. ই-লাইব্রেরি সম্পর্কে টীকা লেখ।

3.9 তথ্যসূত্র (References)

- Aroldi, P., Colombo, F. and Carlo, S. (2014, "Stay tuned": The role of ICTs in elderly life, in Riva, G., Ajmone, P. and Grassi, C. (Eds.) Active Ageing and Healthy Living, IOS Press, Amsterdam, pp.145-156.
- Blaschke, C., Freddolino, P. and Mullen, E. (2009) 'Ageing and Technology: A Review of the literature', British Journal of Social Work, 39, 641-656.
- Buckingham, D. (2008) Youth, Identity, and Digital Media. The John D. and Catherine T. MacArthur Foundation Series on Digital Media and

Learning. Cambridge, MA: The MIT Press.

- Colombo, F., Aroldi, P. and Carlo, S. (2015) 'New elders, old divides: ICTs, inequalities and well-being amongst young elderly Italians', Comunicar, 45. DOI: 10.3916/C45-2015-05
- Frissen, V. (2000) 'ICTs in the Rush Hour of Life', The Information Society, No.16, pp 65- 75.
- Geldof, M (2011) 'Earphones are not for Women: Gendered ICT use among Youths in Ethiopia and Malawi', Information Technologies and International Development, 7(4), 669-80.
- Haddon, L. (2001) Time and ICTs. Paper for the CRIC workshop 'Researching Time', University of Manchester, 19th September.
- Helle-Valle, J. and Slettemeås, D. (2008) 'ICTs, Domestication and Language Games: A Wittgensteinian Approach to Media Use', New Media and Society, 10 (1), 45-66.
- Mishra, P. K. and A. Joseph (2012) 'Early Childhood Care and Education: An ICT Perspective', Information Technologies and Learning Tools 27(1).
- Pellegrino, G. (2009) 'Learning from Emotions towards ICTs: Boundary Crossing and Barriers in Technological Appropriation', in Vincent, J. and Fortunati, L. Electronic Emotion. The Mediation of Emotion via Information and Communication Technologies, Peter Lang, Oxford, pp.207-30.
- Quan-Haase, A., Martin, K. and Schreurs, K. (2016)' Interviews with digital seniors: ICT use in the context of everyday life', Information, Communication and Society, 19(5), 691- 707.
- Silverstone, R. (1993) 'Time, Information and Communication Technologies in the Household', Time and Society, 2(3), 283-311.

একক - 4 ❑ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সমন্বিত শিক্ষা (ICT Integrated Education)

গঠন (Structure)

4.1 উদ্দেশ্য (Objectives)

4.2 ভূমিকা (Introduction)

4.3 ডিজিটাল পাঠ নকশা (Digital Lesson Designing)

4.4 শিক্ষার্থীদের ই-পোর্টফোলিও (E-Portfolios of Learners)

4.5 শিখন সম্পদ ব্যবস্থাপনা (Learning Resources Management)

4.6 ওয়েব ভিত্তিক নির্দেশদান (Web Based Instruction)

4.7 ই-মডিউল (E-modules)

4.8 সারসংক্ষেপ (Summary)

4.9 প্রশ্নাবলি (Questions)

4.10 তথ্যসূত্র (References)

4.1 উদ্দেশ্য (Objectives)

এই অধ্যায়টি সমাপ্ত হওয়ার পরে, শিক্ষার্থীরা -

- শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারবে।
- ডিজিটাল পাঠ নকশা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করবে।
- ইলেকট্রনিক পোর্টফোলিও কিভাবে তৈরি করতে হয় সেই সম্পর্কে অবগত হবে।
- শিখন সম্পদ ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন দিকগুলি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করবে।
- ওয়েব ভিত্তিক নির্দেশদানের সুবিধা ও অসুবিধা সম্পর্কে জানতে পারবে।
- শিক্ষাক্ষেত্রে কিভাবে ইলেকট্রনিক মডিউলকে ব্যবহার করা যায় এবং ইলেকট্রনিক মডিউল প্রস্তুতের পর্যায় সম্পর্কে অবগত হবে।

4.2 ভূমিকা (Introduction)

সমন্বয়ী শিক্ষণপদ্ধতি শিক্ষার্থীদের সামনে পাঠক্রমের অন্তর্গত বিবিধ বিষয় ও একই বিষয়ের বিভিন্ন অংশগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে সার্বিক ধারণা গঠনে উৎসাহিত করে। পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর মনোযোগ আকর্ষণের পরিবর্তে সমন্বয়ী পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের জন্য প্রাসঙ্গিক কোনো বিষয় বা ক্ষেত্রে তাদের দক্ষতার বিকাশের দিকে অধিক সচেষ্ট হয়।

সমন্বয়ী শিক্ষণ পদ্ধতি শিশু-চালিত ক্রীড়া ও শিখন, পরিচালিত ক্রীড়া ও শিখন এবং প্রাপ্তবয়স্ক-আদেশানুগ শিখনের একত্রিত রূপদান। সমন্বয়ী শিখন-শিক্ষণে শিশুকাল থেকেই শিশুদের শিখন-শিক্ষণের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে শিশুদের বাধাহীন মিথোষ্ক্রিয়ার সুযোগ করে দেন। এক্ষেত্রে পারিপার্শিক জগত সম্পর্কে শিশুদের মধ্যে গঠিত ধারণা ও সম্ভাব্য সিধান্তগুলিই ঐ মিথোষ্ক্রিয়ার চালিকাশক্তি রূপে কাজ করে। অন্যান্য জ্ঞানী ব্যক্তি ও সমবয়সী সহপাঠীর সাথে তথ্যের আদানপ্রদানের দ্বারা নিজ জ্ঞান ও শিখনের পরিব্যাপ্তি ঘটানোর সুযোগ পায় শিশুরা। এক্ষেত্রে উদ্দেশ্যভিত্তিক শিক্ষণের জন্য শিক্ষকদের প্রতিক্রিয়াশীল উপস্থিতি একান্ত কাম্য। শিক্ষকরা শিশুদের বিদ্যমান সক্ষমতা ও জ্ঞান অনুযায়ী কিভাবে ঐ পারদর্শিতাগুলির আরোও বিকাশ ঘটানো যায়, তার পথনির্দেশ করেন। স্বার্থক সমন্বয়ী শিক্ষণ পদ্ধতি শিক্ষার্থীকে তার বৌদ্ধিক স্তর থেকে ক্রমাগত অগ্রসর হতে সহায়তা করে এবং বাস্তব জীবনের উদাহরণ ব্যবহারের মাধ্যমে শিখনকে আকর্ষণীয় ও প্রাসঙ্গিক করে তোলে।

প্রযুক্তিগত জ্ঞান এবং প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত বেড়েই চলেছে। অ্যাসাইনমেন্ট থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত সমস্ত কাজ এখন কম্পিউটার এবং মোবাইল ব্যবহার করে করা হচ্ছে। শিক্ষা জীবনকে অনেক বেশী সহজ করে তুলেছে আর সহজ করে তোলার পেছনে রয়েছে শিক্ষা খাতে নতুন নতুন সব সফওয়্যার উদ্ভাবন। এটি সমস্ত কাজগুলোকে অনেক গুছিয়ে নিয়েছে। বর্তমান সময়ে মোবাইল এবং কম্পিউটার ব্যবহার করে ইন্টানেটের সুবিধায় ঘরে বসেই বিভিন্ন টপিক নিয়ে অনলাইনে ক্লাস করার মত সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে যার ফলে আলাদাভাবে কোথাও টিউশন নিতে হচ্ছেনা। যেকোনো নোটস বা তথ্য সুরক্ষিত রাখা যায় খুব সহজেই। চাইলেই অনলাইন লাইব্রেরি থেকে যেকোনো বই পড়া যায় এবং মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করে সরাসরি পৃথিবীর যেকোনো প্রান্ত থেকে ক্লাসে উপস্থিত থাকা যায়। সমস্ত কিছু যাচাই বাছাই করে অতি সহজেই একটি ভালো সিদ্ধান্ত গ্রহন করা যায়। বর্তমান সময়ে ক্লাসরুমগুলোতে কম্পিউটার ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরণের ক্লাস নেওয়া হয় যাকে আমরা মাল্টিমিডিয়া ক্লাস নামে চিনে থাকি। মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করার মাধ্যমে খুব সহজেই প্রজেক্টর ব্যবহার করে বিভিন্ন বিষয়ের খুটিনাটি সহজেই পাঠদান করা করা যায়।

4.3 ডিজিটাল পাঠ নকশা (Digital Lesson Designing)

পাঠ পরিকল্পনা বা নকশা হল শ্রেণীকক্ষে পাঠের বিষয়বস্তু প্রয়োগের কার্যকর পরিকল্পনা। শিক্ষণ প্রক্রিয়ার সাফল্য অনেকাংশেই পূর্বপাঠ পরিকল্পনার উপর নির্ভর করে থাকে। শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবিষয়ের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করার জন্য তাদের মানসিক বয়সের উপযোগী করে মনোবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে পাঠ উপস্থানপন করা দরকার। 'পাঠ নকশা বা পরিকল্পনা' কথাটির উৎপত্তি হয়েছে Gestalt Psychology থেকে। একটি ভালো পাঠ পরিকল্পনা একজন শিক্ষক বা শিক্ষিকাকে প্রচুর পরিমাণে সাহায্য করে থাকে। বিদ্যালয়ে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে নির্ধারিত শিক্ষার লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের পৌঁছে দেওয়ার জন্য শিক্ষক মহাশয়ের পাঠদান প্রক্রিয়ার সুনিশ্চিত ও লিখিত রূপটিই হল 'পাঠ নকশা বা পরিকল্পনা SLesson Designing)'।

একজন শিক্ষক মহাশয় যখন শ্রেণীকক্ষে কোনো একটি বিষয়ে পাঠদান করেন তখন তিনি ওই পাঠদানের বিষয়টিকে কী ভাবে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপিত করবেন তা ঠিক করে থাকেন। পাঠ্যাবিষয়টিকে সঠিকভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে শ্রেণীকক্ষে উপস্থাপন করতে হলে একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার প্রয়োজন হয়। পরিকল্পনাটিকে সঠিকভাবে উপস্থাপনের জন্য একটি নির্দিষ্ট পাঠএকক নির্বাচন করা হয়। ওই নির্বাচিত পাঠএককটিকে সঠিকভাবে উপস্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয়ও পাঠদান কৌশল বা পদ্ধতিকেও নির্বাচন করতে হয়।

ওই নির্দিষ্ট এককের অন্তর্গত পাঠ্যবিষয়বস্তুর উপর নির্ভর করে কি ধরনের শিক্ষণ প্রদীপন ও শিক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে তা ঠিক করা হয়ে থাকে। শুধুমাত্র পাঠ্যবিষয়বস্তুই নয়, শিক্ষার্থী ও শিখন পরিবেশের উপর নির্ভর করেও শিক্ষণ কৌশল নির্বাচিত করা হয়। উপযুক্ত শিখনের জন্য শিক্ষার্থীর মানসিক প্রস্তুতি থাকা একান্ত প্রয়োজন। শ্রেণীকক্ষে আদর্শ কৌশল বা পদ্ধতিতে পাঠদানের জন্য শিক্ষক ও শিক্ষিকারও প্রস্তুতি থাকা প্রয়োজন। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক- শিক্ষিকার কার্যকারিতা অনেকাংশেইপরিকল্পনার উপর নির্ভর করে।

অনেক সময় লক্ষ্য করা যায় যে, একজন শিক্ষক বা শিক্ষিকার প্রচুর বিষয়গত জ্ঞান আছে কিন্তু তিনি তাঁর বিষয়গত জ্ঞানকে সঠিকভাবে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপিত করতে পারেন না, যার ফলে শিক্ষার্থীরা শ্রেণীকক্ষে অমনোযোগী হয়ে ওঠে ও শ্রেণীকক্ষে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। কিন্তু কোনো শিক্ষক বা শিক্ষিকা তাঁর বিষয়গত জ্ঞানকে সঠিকভাবে উপস্থাপনার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট শিখন পরিকল্পনা গ্রহণ করে থাকেন ও তার মাধ্যমে বিষয়গত জ্ঞানকে ব্যক্ত করেন তাহলে সেটি অনেক বেশি কার্যকরী হয়। সুতরাং, পাঠদান প্রক্রিয়াকে কার্যকরী করে তোলার জন্যই শিখন পরিকল্পনার প্রয়োজন হয়ে থাকে।

কোনো বিশেষ শ্রেণীতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোনো পাঠ্যবিষয়বস্তুকে সার্থক ও সুন্দরভাবে উপস্থাপন করার জন্য যে পরিকল্পনা গৃহীত হয় তাকে পাঠ নকশা বা পাঠ পরিকল্পনা বলা হয়। আর এই পাঠ নকশা বা পরিকল্পনা যখন ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়া ও তথ্য প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে করা হয় তখন তাকে ডিজিটাল পাঠ নকশা বলা হয়ে থাকে। যেমন, পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে একাধিক স্লাইডের সাহায্যে যে কোনো মূর্ত-বিমূর্ত বিষয়ে অতি সহজেই শিক্ষার্থীদের পাঠদান সম্ভব হয়।

এই পাঠদান শিক্ষার্থীদের মধ্যে যেমন হবে আনন্দদায়ক, তেমনি সহজবোধ্য। চক, ডাস্টার, চকবোর্ড দিয়ে শিক্ষার্থীদের অনেক তত্ত্বগত ধারণা যথাযথ ভাবে দেওয়া অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না। কিন্তু ডিজিটাল পাঠ নকশার মাধ্যমে একাধিক স্থির বা চলমান চিত্রের সাহায্যে শিক্ষার্থীদের যে কোনো বিষয়ে পূর্ণ ধারণা দেওয়া সম্ভব। সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগ্রহণ অনেক বেশি আনন্দদায়ক হয়।

ডিজিটাল পাঠ নকশা প্রণয়নে লক্ষণীয় বিষয়—

- শিক্ষার্থীদের আর্থ সামাজিক অবস্থা,বয়স, সামর্থ্য ও চাহিদার ওপর গুরুত্ব প্রদান করা
- পাঠের উদ্দেশ্যসমূহকে সঠিকভাবে ব্যক্ত করা
- বিষয় বস্তু নির্বাচন ও প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা
- সঠিক শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি নির্বাচন করা
- উপযুক্ত উপকরণ নির্বাচন করা
- পাঠ মূল্যায়নের জন্য যথাযথ প্রশ্ন প্রণয়ন যার মাধ্যমে শিখন ফল যাচাই করা যায়
- শিক্ষার্থীর দুর্বলতা চিহ্নিত করণ ও পুনরালোচনা করা

ডিজিটাল পাঠ নকশার গুরুত্ব (Importance of Digital Lesson Designing) :

- ডিজিটাল পাঠ নকশার মাধ্যমে শিক্ষণ শিখনের উদ্দেশ্য জানা যায়।
- পাঠের বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা পাওয়া যায়।
- উপযুক্ত পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহার করা যায়।
- তথ্য প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়াকে পরিচালিত করা যায়।
- সুশৃঙ্খল, ধারাবাহিক ও মনোবিজ্ঞান সম্মত ভাবে পাঠ উপস্থাপন করা যায়।
- শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশ গ্রহন নিশ্চিত করা যায়।

- মূল্যায়নের কৌশল সম্পর্কে দিক নির্দেশনা পাওয়া যায়।
- শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা ও কোন কোন ক্ষেত্রে মনোভাব যাচাই করা যায়।
- পাঠদান পক্রিয়া আনন্দদায়ক ও ফলপ্রসূ হয়।

4.4 শিক্ষার্থীদের ই-পোর্টফোলিও (E-Portfolios of Learners)

ইলেকট্রনিক পোর্টফোলিও হল কোনো একটি ব্যক্তির বিভিন্ন কার্যকলাপের একটি প্রক্রিয়াভিত্তিক ইলেকট্রনিক তথ্যের সমষ্টি। এই ধরনের পোর্টফোলিও 'ডিজিটাল পোর্টফোলিও" বা 'অনলাইন পোর্টফোলিও" নামেও পরিচিত। এখানে ইলেকট্রনিক তথ্য বলতে ই-ফাইল, চিত্র, মাল্টিমিডিয়া, ব্লগ এবং হাইপারলিঙ্ককে বোঝানো হয়ে থাকে। ই-পোর্টফোলিওগুলি স্ব-প্রকাশের জন্য ব্যবহারকারীর দক্ষতা এবং প্ল্যাটফর্ম উভয়ই প্রদান করে থাকে। ই-পোর্টফোলিও হল লার্নিং রেকর্ডের সমষ্টি যা কোন একটি শিক্ষার্থীর পারদর্শিতাকে প্রদর্শন করে থাকে। ই-পোর্টফোলিওগুলি, গতানুগতিক পোর্টফোলিওগুলির মত, শিক্ষার্থীদের নিজস্ব শিখনে সুবিধা প্রদান করতে পারে, যার দ্বারা শিক্ষার্থীরা শিখন কৌশল এবং চাহিদার বিষয়ে আরো সচেতনতা অর্জন করে থাকে।

ই-পোর্টফোলিও প্রকারভেদ (Types of E Portfolios) :

ই-পোর্টফোলিওকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। সেইগুলি হল —

উন্নয়নমূলক ই-পোর্টফোলিও (Developmental e-portfolio)	একটি উন্নয়নমূলক ই-পোর্টফোলিও একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দক্ষতার অগ্রগতি প্রদর্শন করে থাকে। এর প্রধান উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থী এবং প্রশিক্ষক মধ্যে যোগাযোগের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট উপায় প্রদান করা।
অ্যাসেসমেন্ট ই-পোর্টফোলিও (Assessment e-portfolio)	অ্যাসেসমেন্ট পোর্টফোলিও একটি নির্দিষ্ট ডোমেন বা ক্ষেত্রের দক্ষতা এবং যোগ্যতা প্রদর্শন করে থাকে।
প্রদর্শনীমূলক ই-পোর্টফোলিও (Showcase e-portfolio)	একটি প্রদর্শনীমূলক ই-পোর্টফোলিও একটি নির্দিষ্ট এলাকায় কাজকে প্রদর্শন করে থাকে। এটি যখন কাজের অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ব্যবহৃত হয় তখন এই ধরনের পোর্টফোলিওকে কখনও কখনও ক্যারিয়ার পোর্টফোলিও (Career Portfolio) বলা হয়ে থাকে।

4.5 শিখন সম্পদ ব্যবস্থাপনা (Learning Resources Management)

শিখন সম্পদের আলোচনার পূর্বে আমাদের দুটি শব্দের সঙ্গে পরিচিত হওয়া বিশেষ জরুরি। এই দুটি শব্দ হল 'শিখন' এবং 'সম্পদ'। 'শিখন' বলতে আমরা সহজ ভাষায় বুঝি শিক্ষার্থী শিক্ষাপ্রক্রিয়া চলাকালীন যা শেখে বা করে। আর 'সম্পদ' হল বস্তুর সেই গুণ যা মানুষের চাহিদা পূরণ করে অর্থাৎ কোনো বস্তুর কার্যকারিতাই হল সম্পদ। কোনো বস্তু বা পদার্থকে সম্পদ বলা যায় না, সম্পদ হল বস্তুর অন্তর্নিহিত কার্যকারিতা শক্তি। এবার আমাদের আলোচনার বিষয়ে আসা যাক, তাহলে শিখন সম্পদ কী? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় শিক্ষার্থীর শেখাকে বেশি কার্যকরী বা ফলপ্রসূ করে তোলার জন্য যে সমস্ত বস্তুসামগ্রীর কার্যকারিতা শক্তিকে কাজে লাগানো হয় তাই হল শিখন সম্পদ।

প্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া চলাকালীন শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক বা শিক্ষিকা পাঠকে বেশি প্রাণবন্ত বা আগ্রহযুক্ত করে তোলার জন্য শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে যা ব্যবহার করেন এবং যার থেকে শিক্ষার্থীর তাদের সক্ষমতা, শক্তি, আগ্রহ, গ্রহণক্ষমতা অনুযায়ী শেখে তাই হল প্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থায় শিখন সম্পদ। তবে শুধুমাত্র যে প্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থাতেই শিখন সম্পদ ব্যবহৃত হয় তা নয়, প্রথাবহির্ভূত (Non-formal) এবং অপ্রথাগত (Informal) শিক্ষাব্যবস্থাতেও যে সমস্ত সম্পদ শিক্ষার্থীদের শিখতে সাহায্য করে তাই হল শিখন সম্পদ। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় দূরশিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক বেশি শিক্ষার্থীকে পাঠদানের জন্য শিক্ষক বা শিক্ষিকা মাইক্রোফোন এবং প্রোজেক্টরের মাধ্যমে পাঠদান করেন। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থী এগুলির মাধ্যমেই শিখনে আগ্রহী হয়, তাই এইগুলিকে শিখন সম্পদ বলা যায়।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যুগে শিক্ষাসংক্রান্ত প্রায় সব ধরনের সহায়ক তথ্য ও শিখন সম্পদ ইন্টারনেটে পাওয়া যায়। শিক্ষার্থীদের নানা সমস্যা সমাধানের জন্য ইন্টারনেটে অনেক ওয়েবসাইট রয়েছে। এমন অনেক ওয়েবসাইট আছে যেখানে বিভিন্ন গাণিতিক কাজ করার ব্যবস্থা রয়েছে ও বিভিন্ন গাণিতিক সমস্যারও সমাধান পাওয়া যায়। বিভিন্ন বিষয়ের উপর তথ্য সরবরাহের জন্য নানান ধরনের ওয়েবসাইট আছে। যার মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থী খুব সহজেই তার নিজের বিষয়ের প্রচুর তথ্য পেয়ে থাকে। অনলাইন ব্যবস্থায় ইন্টারনেটের সাহায্যে এই ধরনের শিক্ষা সম্পর্কিত তথ্য বা সম্পদগুলিকে 'অনলাইন লার্নিং রিসোর্স (Online Learning Resource)' বলা হয়ে থাকে। আর ইন্টারনেটকে সঠিকভাবে ব্যাবহারের দ্বারা শিখন সম্পর্কিত তথ্য বা সম্পদগুলিকে সঠিকভাবে পরিকল্পনার মাধ্যমে তৈরি করা, খুঁজে পাওয়া, সংগঠিত করা, ব্যবহার করা ও ভবিষ্যতে ব্যাবহারের জন্য সঞ্চয় করে রাখা সম্পর্কিত সমগ্র প্রক্রিয়াটিকে শিখন সম্পদ ব্যবস্থাপনা (Learning Resources Management) বলা হয়ে থাকে।

4.6 ওয়েব ভিত্তিক নির্দেশদান (Web Based Instruction)

'World Wide Web' কথাটির সাথে আমরা সকলেই পরিচিত। 1989 খ্রিস্টাব্দে বরামাস লি নামে সুইজারল্যান্ড নিবাসী একজন পদার্থ বিজ্ঞানী, ওয়ার্ল ওয়াইড ওয়েভের আবিষ্কার করেন। এই কম্পিউটারের একটি সংগঠিত পদ্ধতি যা ব্যক্তিকে-ব্যক্তিকে বিভিন্ন বিভাগে এবং বিভিন্ন স্থানের তথ্যসংগ্রহ করতে এবং তথ্যের আদানপ্রদান করতে সাহায্য করে। একাধিক website-এর ব্যবহার না করে একটি সুনির্দিষ্ট পথে গিয়ে সহজেই তথ্যসংগ্রহ করা যায়। World Wide Web ব্যক্তিকে বিভিন্ন Website-এর মধ্যে সম্পর্ককে খুঁজে বার করতে সাহায্য করে, যার মধ্যে দিয়ে ব্যাক্তি পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত topic গুলিতে দৃষ্টি দিতে পারে এবং সেখান থেকে প্রয়োজনমতো তথ্যসংগ্রহ করতে পারে। I Web Based Instruction (WBI)-এ www-এর মধ্য দিয়ে যে অসংখ্য তথ্যসংগ্রহ করা হয় তার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা দেওয়া সহজ হয়। অনেক সময়, Web Based Instruction যথেষ্ট সংগঠিত হয় এবং এর মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তথ্যগুলিকে সংগৃহীত করা যায়। এই প্রক্রিয়াতে, যিনি নির্দেশদান দিচ্ছেন এবং যারা তা গ্রহণ করছে উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্ভব হয়। Web Based Instruction– K-12 স্তরে

অপেক্ষাকৃত কম সংগঠিত ও ব্যাপক। www-তে যে তথ্য তাতে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে এবং বিবরণী লেখার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীররা অন্যান্য বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত শিক্ষার্থী এবং বিশেষজ্ঞের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে জটিল কোনো সমস্যার সহজে সমাধান করতে পারে। KIDLINK (http-//www.kidlink.org)-এর মধ্যে দিয়ে হাজার হাজার শিক্ষার্থী বিভিন্ন প্রদেশে পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ রাখতে পারে। "Blue Print Earth"-এই প্রকল্পে শিক্ষার্থীরা পৃথিবীর বর্তমান অবস্থা কেমন এই বিষয়গুলি পরস্পরের সঙ্গে আলোচনা করতে পারে। www– K-12 স্তরের শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণে সাহায্য করে।

ওয়েব ভিত্তিক নির্দেশদানের সুবিধা (Advantages of Web Based Instruction) :

- এর মধ্যে দিয়ে শিখনের সুযোগ বৃদ্ধি পায়। শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর উভয়েই সহজে তথ্যসংগ্রহ করতে পারে, অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে এবং বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠতে পারে যা সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থায় সম্ভব নয়। সমগ্র বিশ্বব্যাপী তথ্য সংগ্রহ করতে পারে।
- Web Based Instruction-এর মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন প্রেক্ষাপটের সঙ্গে করিয়া প্রতিক্রিয়ার সুযোগ যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের সাথে পরিচিত লাভ করতে পারে। এর মাধ্যমে যে তারা কেবল অন্যের দৃষ্টিভঙ্গিকে সন্মান করতে

শেখে এবং সেখান থেকে প্রয়োজনীয় তথ্যসংগ্রহ করে তা নয়, তারা নিজেদের মতামতের দ্বারা অন্যদেরকেও প্রভাবিত করতে শেখে এবং নিজের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হয়।

- WBI শিখনের মানকে, সমস্যাসমাধানের ক্ষমতাকে এবং তথ্য অনুসন্ধানের দক্ষতাকে বৃদ্ধি করে। এর মধ্যে দিয়ে মানুষ সহজেই স্বাধীনভাবে তার সমস্যার সমাধান করতে পারে। শিক্ষার্থী বুঝতে শেখে সমস্যাসমাধানের জন্য কেবলমাত্র কিছু নির্দিষ্ট বিষয় পাঠগ্রহণ নয়, সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্যে দিয়ে তা সম্ভব।

- WBI শিক্ষার্থীকে খুব সহজে কোনো একটি বিষয়কে আয়ত্ত করতে সাহায্য করে। যেমন— শিক্ষার্থী যদি মঙ্গলগ্রহের সাম্প্রতিক আবিষ্কার সম্পর্কে জানতে চায়, সে কম্পিউটারের কী-বোর্ডের সাহায্যে Mars কথাটি টাইপ করার মধ্যে দিয়ে সেকেন্ডের মধ্যে এই সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য পেয়ে যাবে এবং ওই সংক্রান্ত পূর্বের সমস্ত তথ্যও পেয়ে যাবে।

- WBI বিভিন্ন ধরনের শিক্ষণ কৌশলের সঙ্গে শিক্ষার্থীকে পরিচিত করে যা গতানুগতিক নির্দেশদান পদ্ধতিতে সম্ভব নয়। শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন উপায়ে এবং বিভিন্ন সময়ে তথ্যসংগ্রহ করতে পারে যা তাদের স্মৃতি এবং বোধশক্তিকে বাড়াতে সাহায্য করে।

ওয়েব ভিত্তিক নির্দেশদানের অসুবিধা (Disadvantages of Web Based Instruction) :

- WBI-কে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে গেলে শিক্ষার্থীদের Web Navigation দক্ষতা অর্জন করতে হবে। তা না হলে তারা ওয়েবসাইটের মধ্যে দিয়ে কাজ করতে পারবে না। কিভাবে Net Search করতে হয় তার জন্য কতটা সময় দিতে হবে সে সম্পর্কেও শিক্ষার্থীদের দক্ষতা দরকার।

- শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং অভিভাবক প্রত্যেককেই বুঝতে হবে WBI-এর মাধ্যমে যে নির্দেশদান তার লক্ষ্য কী, সেখানে কী ধরনের দক্ষতা প্রয়োজন, তা না হলে এই নির্দেশদানকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা যাবে না।

- WBI-এর মাধ্যমে নির্দেশদান দিতে গেলে যে অর্থের প্রয়োজন তা অনেকসামী বিদ্যালয়গুলির পক্ষে বহন করা সম্ভব নয়। এইজন্যে বিদ্যালয়ের কম্পিউটার ব্যবস্থার যথেষ্ট আধুনিকীকরণ প্রয়োজন। শুধু তাই নয়, এর জন্য অভিজ্ঞ শিক্ষক নিয়োগেরও প্রয়োজন আছ এ। যা অনেক সময় বিদ্যালয়ের পক্ষে সম্ভব হয় না।

- উচ্চ আর্থসামাজিক পরিবেশের বিদ্যালয়গুলি এবং নিম্ন আর্থসামাজিক পরিবেশের বিদ্যালয়গুলির মধ্যে এর জন্য অনেক বেশি তথ্যপ্রযুক্তিগত ব্যবধান এসে যাচ্ছে।

4.7 ই-মডিউল (E-modules)

ইলেকট্রনিক মডিউলকে সংক্ষেপে ই-মডিউল বলা হয়। সাধারণভাবে বলা যায়, যে সকল কন্টেন্ট বা উপকরণ কোন ইলেকট্রনিক যন্ত্র বা যন্ত্রাংশের মাধ্যমে ব্যবহার করা হয় তাকেই ই-মডিউল বলা হয়। যে সকল যন্ত্র বা যন্ত্রাংশের মাধ্যমে আমরা ই-মডিউল ব্যবহার করি সেগুলোকে তথ্য-প্রযুক্তি ভিত্তিক যন্ত্র বা আইসিটি ডিভাইস বলা যায়। আইসিটি ডিভাইস এর মধ্যে অন্যতম প্রধান হল কম্পিউটার। কম্পিউটার ছাড়াও মোবাইল, টেলিভিশন, রেডিও, সিডিডিভিডি প্লেয়ার, টেপ রেকর্ডার, ইন্টারনেট মডেম, মাল্টিমিডিয়া প্রোজেক্টর, প্রিন্টার, স্ক্যানার, স্পিকার, ক্যামেরা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য আইসিটি ডিভাইস। এ সকল যন্ত্রের মাধ্যমে ব্যবহার্য প্রায় সব উপকরণই ই-মডিউল।

সাম্প্রতিক সময়ে ই-মডিউলগুলো মূলত ডিজিটাল প্রযুক্তির সহায়তায়ই তৈরি করা হয়। এ জন্য ই-মডিউলকে অনেকে 'ডিজিটাল কন্টেন্ট" বলেও অভিহিত করেন। এ ছাড়া ডিজিটাল কন্টেন্ট বা ই-মডিউল সম্পর্কিত আলোচনার আরও একটি প্রত্যয় ব্যবহার করা হয়, তা হলো : মাল্টিমিডিয়া কন্টেন্ট। মাল্টিমিডিয়া কন্টেন্টে একই সাথে একের বেশি মিডিয়া বা মাধ্যম বিদ্যমান থাকে। যেমন—কোন একটি কন্টেন্টে কোন কিছু দেখাও যায় আবার একই সাথে শোনাও যায়, এরকম কন্টেন্টই মাল্টিমিডিয়া কন্টেন্ট। অর্থাৎ কোন একটি কন্টেন্টকে মাল্টিমিডিয়া কন্টেন্ট হতে হলে তাতে অবশ্যই একের বেশি মিডিয়ার উপস্থিতি থাকতে হবে। তবে ডিজিটাল কন্টেন্ট বা মাল্টিমিডিয়া কন্টেন্ট কিংবা আইসিটি ডিভাইস বা ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশের মাধ্যমে চালানো হয় এরকম যে কোন কন্টেন্টকে সাধারণভাবে ই-মডিউল বলা যায়।

ই-মডিউলের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of eéôémodule) :

ই-মডিউলের ধারণার আলোচনা থেকেই এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তথাপি, ই-মডিউলের বৈশিষ্ট্যসমূহ নির্দিষ্ট আঙ্গিকে উল্লেখ করা প্রয়োজন। সাধারণভাবে ই-মডিউলের যে সকল বৈশিষ্ট্য দৃশ্যমান হয়, সেগুলো হল—

- ই-মডিউল সাধারণত ইলেকট্রনিক যন্ত্রের মাধ্যমেই ব্যবহার করা যায়।
- ই-মডিউল প্রস্তুত করতে প্রযুক্তির সহায়তা লাগে।
- ই-মডিউলকে ধরা বা স্পর্শ করা যায় না, কেবল দেখা ও শোনা যায়।

ই-মডিউলের প্রকারভেদ (Types of eéôémodule) :

ই-মডিউলকে নির্দিষ্ট কয়েকটি ভাগে ভাগ করা বেশ জটিল কাজ। কেননা আইসিটি ডিভাইসের

মাধ্যমে ব্যবহারযোগ্য এমন কন্টেন্ট অগণিত। এখানে আমরা পরিচিত ও বহুল ব্যবহৃত ই-মডিউলের কয়েকটি ধরন সম্পর্কে আলোচনা করব। মূলত শিক্ষাক্ষেত্রে যে ধরনের কন্টেন্ট ব্যবহার করা হয়, তাকে আমরা সাতটি ভাগে ভাগ করে থাকি। সেইগুলি হল—

1. **ডকুমেন্ট (Document) :** শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যবহৃত ই-মডিউলের অন্যতম প্রকার হল ডকুমেন্ট। মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের মাধ্যমে তৈরি বা ব্যবহারকৃত সব ফাইলই ডকুমেন্ট। তাছাড়া, Portable Document Format (PDF) বা পিডিএফ, নোটপ্যাড এসকল অ্যাপ্লিকেশনে তৈরি বা ব্যবহৃত সকল ফাইলই ডকুমেন্ট। একটি ডকুমেন্ট ফাইলের এক্সটেনশন কয়েক ধরনের হতে পারে। যথা: *.doc, *.docx, *.rtf, *.txt, *.pdf ইত্যাদি।

2. **অডিও (Audio) :** যে কন্টেন্ট থেকে কেবল শব্দ বা সাউন্ড শোনা যায়, তাকে অডিও কন্টেন্ট বলা যায়। সাধারণত গান, কথোপকথন, নির্দেশনা ইত্যাদি শোনার কাজে আমরা অডিও কন্টেন্ট ব্যবহার করি। অডিও কন্টেন্টের পরিচিত ফরম্যাটগুলো হল- *.mp3, *.wma, *.wav, *.aif, *.iff, *.m3u, *.m4a, *.mid, *.mpa, *.ra ইত্যাদি।

3. **ভিডিও (Video) :** একই সাথে সাউন্ড ও চলমান চিত্রসমৃদ্ধ কন্টেন্টই ভিডিও। ভিডিওর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এতে চলমান চিত্র ফুটে ওঠে। তবে ভিডিওতে সাউন্ড থাকা বাধ্যতামূলক নয়। বিমূর্ত কোন ধারণাকে মূর্ত করে তোলার ক্ষেত্রে ভিডিও কন্টেন্টের জুড়ি নেই। যে কোন মুভি, অ্যানিমেশন, কার্টুন কিংবা ডুকমেন্টারি ভিডিও কন্টেন্টের অন্তর্ভুক্ত। ভিডিও কন্টেন্টের পরিচিত ফরম্যাটগুলো হল- *.mp4– *.mpg, *.avi, *.flv, *.3gp, *.vob, *.mov, *.wmv, *.srt, *.swf, *.3g2, *.asf, *.asx, *.m4v, *.rm ইত্যাদি।

4. **ইমেজ (Image) :** ইমেজ বা ছবি আরেক নাম স্থিরচিত্র। অর্থাৎ ভিডিওতে আমরা চলমান ছবি দেখি, আর ইমেজের ছবি হল স্থির। কোন একটি নির্দিষ্ট সময় বা মুহূর্তের ছবি ধরে রাখা হয় ইমেজের মাধ্যমে। আবার কোন ব্যক্তি বা বস্তুর ছবিও ইমেজের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়। শিক্ষাক্ষেত্রে, বিশেষ করে পাঠ পরিচালনার নানান ক্ষেত্রে ইমেজ ব্যবহার করা যায়। ইমেজের পরিচিত ফরম্যাটগুলো হল - *.jpg, *.png, *.gif, *.psd, *.bmp, *.dds, *.pspimage, *.tga, *.thm, *.tif, *tiff, *.yuv ইত্যাদি।

5. **প্রেজেন্টেশন (Presentation) :** শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বাধিক ব্যবহৃত ই-মডিউল হল প্রেজেন্টেশন। সাধারণত যে কোন ধরনের কন্টেন্টকেই প্রেজেন্টেশন আকারে প্রদর্শন করা যায়। তবে কিছু কিছু কন্টেন্ট কেবল উপস্থাপনার উদ্দেশ্যেই তৈরি করা হয়। এ ধরনের কন্টেন্টকেই বিশেষত প্রেজেন্টেশন কন্টেন্ট বলা যায়। প্রেজেন্টেশন কন্টেন্ট তৈরি করার জন্য সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য

ও ব্যবহৃত অ্যাপ্লিকেশন হল Microsoft PowerPoint। তবে সাম্প্রতিক কালে Prezi, Google Docs, Zoho Show, Sliderocket এসব অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমেও প্রেজেন্টেশন কন্টেন্ট তৈরি করা হয়। প্রেজেন্টেশন কন্টেন্টের পরিচিত ফরম্যাটগুলো হল - *.ppt, *.pptx, *.ppsx,, *.pps, *.pez, *.odp. *.sxi ইত্যাদি।

6. **ওয়েবসাইট (Website) :** ওয়েবসাইটকে সাধারণত আলাদা এক ধরনের কন্টেন্ট হিসেবে বিবেচনা করা হয় না। তবে ইন্টারনেট ব্যবহার করে শ্রেণিকক্ষে কোন কিছু প্রদর্শন করতে চাইলে, অবশ্যই কোন না কোন ওয়েবসাইটে যেতে হয়। ওয়েবসাইটে যে লেখা বা বর্ণনা থাকে তাকে আমরা ওয়েবসাইট কন্টেন্ট বলে অভিহিত করতে পারি। ওয়েবসাইটের কোন একটি পৃষ্ঠা আমরা সংরক্ষণ করে রাখতে পারি। পরবর্তীতে ইন্টারনেট সংযোগ না থাকলেও সেই পৃষ্ঠা আমরা দেখতে পারি। কোন ওয়েবপেজ সংরক্ষণ করা হলে তার এক্সটেনশন কয়েক ধরনের হতে পারে। যেমন : *.html, *.htm, *.xhtml, *.php, *.rss, *.asp, *.aspx, *.cer *.cfm, *.csr, *.css, *.js, *.jsp ইত্যাদি।

7. **ইনফোগ্রাফ (Infogram) :** ই-মডিউলের এই ধরনটি নতুন বা আলাদা কোন ধরন নয়। ইনফোগ্রাফ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ইমেজ হয়। তবে এর বিশেষত্ব হল এখানে তথ্যকে ছবি আকারে প্রদর্শন করা হয়। তাছাড়া গ্রাফ, চার্ট এগুলোকেও ইনফোগ্রাফ হিসেবে বিবেচনা করা যায়। ইনফোগ্রাফের ফাইল এক্সটেনশন ইমেজের মতই।

ই-মডিউল প্রস্তুতকরণ প্রক্রিয়া (Process of preparing e.module) :

বর্তমানকালে, শ্রেণিকক্ষ পাঠ পরিচালনায় ই-মডিউল ব্যবহারের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি। পঠন দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও ই-মডিউলের কার্যকারিতা ইতোমধ্যেই প্রমাণিত। আর ই-মডিউল ব্যবহারের পূর্বে প্রয়োজনীয় কাজ হল ই-মডিউল প্রস্তুত করা। বর্তমানে শিক্ষককেরা নিজেরাই বিভিন্ন ধরনের ই-মডিউল প্রস্তুত করে পাঠ পরিচালনায় ব্যবহার করছেন। তাই শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির কার্যকর সমন্বয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদেরকে ই-মডিউল প্রস্তুতের পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখতে হয়। ই-মডিউল প্রস্তুতের জন্য অন্যতম পূর্বশর্ত হল মৌলিক তথ্য-প্রযুক্তিগত দক্ষতা থাকা। তবে ই-মডিউল প্রস্তুতের জন্য তথ্য-প্রযুক্তিগত দক্ষতাই একমাত্র প্রয়োজনীয় বিষয় নয়। একটি কাঠামোবদ্ধ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ই-মডিউল প্রস্তুত করা গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষাবিজ্ঞান প্রসূত বিভিন্ন বিষয় যেমন বিবেচনায় আনতে হয়, তেমনি কন্টেন্ট প্রস্তুতের জন্য কোন সফটওয়্যার উপযোগী তাও বিবেচনার সুযোগ থাকে।

ই-মডিউল প্রস্তুতের পর্যায় (Stages of preparing eéôémodule) :

ই-মডিউল প্রস্তুতের পরিকল্পনা থেকে শুরু করে চূড়ান্তকরণ পর্যন্ত আদর্শগতভাবে ৫ টি পর্যায় অনুসরণ করা হয়। সেই পর্যায়গুলি হল —

1. বিশ্লেষণ পর্যায় (Analysis Phase) :

শিক্ষাবিজ্ঞানীরা ই-মডিউল প্রস্তুতের এই পর্যায়কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে অভিহিত করেন। কেননা এই পর্যায়ে ই-মডিউল প্রস্তুতের জন্য যাবতীয় বিষয়াদী বিবেচনা করা হয়। এই পর্যায়ে যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিবেচনায় আনতে হয় এবং সাথে সাথে সে বিষয়গুলোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হয়, সেগুলি হল —

- কোন বিষয়বস্তুর উপর ই-মডিউল তৈরি করা হবে?
- ঐ বিষয়বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট শিখনফলগুলো কী কী?
- কোন শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য এই কন্টেন্টটি তৈরি করা হবে?
- ঐ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের সক্ষমতা ও প্রবণতা কোন পর্যায়ের?
- সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তুটি শ্রেণিতে বাস্তবায়নের জন্য উপযোগী শিখনক্রম কী?
- ঐ বিষয়বস্তুর জন্য শিক্ষাক্রমে কোন শিক্ষণ-শিখন কৌশল নির্ধারিত আছে?
- বিষয়বস্তুটিকে শ্রেণিকক্ষে বাস্তবায়নের জন্য কী কী উপকরণ বিদ্যমান আছে?

উপরোক্ত বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করে পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তুটি সম্পর্কে সম্যক ধারণা নিতে হবে এবং ঐ বিষয়বস্তুটির ওপর ই-মডিউল প্রস্তুতকরণের উপযোগিতা যাচাই করতে হবে।

2. ডিজাইন পর্যায় (Design Phase) :

এই পর্যায়ে মূলত ই-মডিউল প্রস্তুতের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়। যিনি ই-মডিউল তৈরি করবেন তার দক্ষতার পর্যাপ্ততা এই পর্যায়েগুরুত্বপূর্ণ। যদি কারো কেবল পাওয়ারপয়েন্ট ব্যবহার করে ই-মডিউল তৈরির সমক্ষতা থাকে, তিনি নিশ্চয় ভিডিও কন্টেন্ট তৈরির পরিকল্পনা করবেন না। তাই এই পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নিতে হয়, কোন সফটওয়্যার ব্যবহার করে ই-মডিউল তৈরি করা হবে। তাছাড়া, কন্টেন্টে কী ধরনের লেখা এবং ছবি থাকবে সে পরিকল্পনাও এ পর্যায়ে করতে হয়। পাঠ পরিচালনায় সংশ্লিষ্ট কন্টেন্ট কীভাবে ব্যবহৃত হবে সে ব্যাপারটিও এই পর্যায়ে ঠিক করা হয়ে থাকে।

3. প্রস্তুতকরণ পর্যায় (Development Phase) :

এই পর্যায়ে মূলত ই-মডিউল প্রস্তুত করা হয়। পূর্ববর্তী ধাপের পরিকল্পনা অনুযায়ী এ পর্যায়ে কন্টেন্ট

তৈরির কাজে হাত দিতে হয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী কন্টেন্টে লেখা ও ছবি ইনপুট দেওয়া হয়। কন্টেন্টকে ইন্টার্যাকটিভ করার জন্য প্রয়োজনীয় রং ও ডিজাইন সংযুক্ত করা যেতে পারে। উপযুক্ত ক্ষেত্রে লেখা ও ছবিতে অ্যানিমেশন দেওয়া যেতে পারে। শিক্ষার্থীদের উপযোগী সাউন্ডও যোগ করা যেতে পারে। ই-মডিউল প্রস্তুতকরণে শিক্ষার্থীদের প্রবণতা ও সামর্থ্য বিবেচনার ব্যাপারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এমন জটিল কোন ছবি বা লেখা সংযুক্ত করা উচিত হবে না, যা সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের বুঝতে অসুবিধা হয়। তাছাড়া, প্রারম্ভিক শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য প্রস্তুতকৃত কন্টেন্টে যাতে লেখার চেয়ে ছবি বেশি থাকে তা মাথায় রাখতে হয়।

4. পরীক্ষণ পর্যায় (Testing Phase) :

এ পর্যায়ে প্রস্তুতকৃত ই-মডিউলটিকে পরীক্ষা করতে হয়। এ পরীক্ষণের কাজটি দু'টি আঙ্গিক থেকে করা যেতে পারে। একটি হল, কারিগরী, আর অন্যটি হল, বাস্তবায়নযোগ্যতা। প্রথমে দেখতে হবে যে কন্টেন্টটি তৈরি করা হল, তা কারিগরী দিক থেকে ঠিক আছে কি না। কন্টেন্টটি তৈরি করার পর তা কম্পিউটার কিংবা সংশ্লিষ্ট যন্ত্রে চালিয়ে দেখতে হবে যে, এটাতে কোন সমস্যা দেখা দিচ্ছে কি না। পরবর্তীতে, যে শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য কন্টেন্টটি তৈরি করা হল,

তাদের সামনে উপস্থাপন করতে হবে। প্রয়োজনে ঐ কন্টেন্ট ব্যবহার করে একটি পাঠ পরিচালনা করা যেতে পারে। কন্টেন্টটি চলার সময় তাদেরকে পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে। পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে কন্টেন্টটি তাদেরকে কতটুকু আগ্রহান্বিত করতে পারছে তা বোঝা যাবে। পরিশেষে তাদের মতামত নেওয়া যেতে পারে। মতামত নেওয়ার জন্য কন্টেন্ট মূল্যায়ন চেকলিস্ট ব্যবহার করা যেতে পারে।

5. চূড়ান্তকরণ পর্যায় (Finalization Phase) :

পরীক্ষণ পর্যায়ে প্রাপ্ত ফলাফলের উপর ভিত্তি করে এ পর্যায়ে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিমার্জন করে ই-মডিউলটি চূড়ান্ত করতে হয়।

একটি ই-মডিউল কোন একটি নির্দিষ্ট পাঠের জন্য অথবা কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর ওপর তৈরি করা যায়। তাই কন্টেন্ট প্রস্তুতকরণে একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুসরণ করা প্রয়োজন। ই-মডিউল প্রস্তুতের উপরোক্ত পর্যায়গুলো নির্দিষ্ট বা বিধিবদ্ধ নয়। প্রয়োজনে এই প্রক্রিয়ার পরিবর্তন হতে পারে। বর্তমানে প্রযুক্তির অগ্রগামীতার কারণে এখন অনেক কিছুই ইন্টারনেটে পাওয়া যায়। কেউ যদি পাঠ্যবইয়ের উপর ভিত্তি করে ই-মডিউল তৈরি করে এবং তা অনলাইনে শেয়ার করে, তাহলে নির্দিষ্ট পাঠের ক্ষেত্রে সেটা ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু ইন্টারনেটে উন্মুক্তভাবে পাওয়া কন্টেন্টগুলো সবসময় পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয় না। সেক্ষেত্রে পাঠ্যবইয়ের বিষয়ের সাথে মিলে এমন কন্টেন্ট

খুঁজে বের করতে হয়। সেটা অডিও, ভিডিও, প্রেজেন্টেশন যে কোন কিছুই হতে পারে। সবচেয়ে জরুরি হল, ই-মডিউল তৈরি কিংবা সংগ্রহ যাই করা হোক না কেন, মনে রাখতে হবে তা যেন শিক্ষার্থীদের কার্যকর শিখনে সহায়তা করে এবং প্রত্যাশিত শিখনফল অর্জনে সহায়তাকারী হয়।

4.8 সারসংক্ষেপ (Summary)

প্রযুক্তিগত জ্ঞান এবং প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত বেড়েই চলেছে। অ্যাসাইনমেন্ট থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত সমস্ত কাজ এখন কম্পিউটার এবং মোবাইল ব্যবহার করে করা হচ্ছে। শিক্ষা জীবনকে অনেক বেশী সহজ করে তুলেছে আর সহজ করে তোলার পেছনে রয়েছে শিক্ষা খাতে নতুন নতুন সব সফওয়্যার উদ্ভাবন। এটি সমস্ত কাজগুলোকে অনেক গুছিয়ে নিয়েছে। বর্তমান সময়ে মোবাইল এবং কম্পিউটার ব্যবহার করে ইন্টানেটের সুবিধায় ঘরে বসেই বিভিন্ন টপিক নিয়ে অনলাইনে ক্লাস করার মত সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে যার ফলে আলাদাভাবে কোথাও টিউশন নিতে হচ্ছেনা।

একজন শিক্ষক মহাশয় যখন শ্রেণীকক্ষে কোনো একটি বিষয়ে পাঠদান করেন তখন তিনি ওই পাঠদানের বিষয়টিকে কী ভাবে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপিত করবেন তা ঠিক করে থাকেন। পাঠ্যবিষয়টিকে সঠিকভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে শ্রেণীকক্ষে উপস্থাপন করতে হলে একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার প্রয়োজন হয়। পরিকল্পনাটিকে সঠিকভাবে উপস্থাপনের জন্য একটি নির্দিষ্ট পাঠএকক নির্বাচন করা হয়। ওই নির্বাচিত পাঠএককটিকে সঠিকভাবে উপস্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয়ও পাঠদান কৌশল বা পদ্ধতিকেও নির্বাচন করতে হয়।

ওই নির্দিষ্ট এককের অন্তর্গত পাঠ্যবিষয়বস্তুর উপর নির্ভর করে কি ধরনের শিক্ষণ প্রদীপন ও শিক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে তা ঠিক করা হয়ে থাকে। শুধুমাত্র পাঠ্যবিষয়বস্তুই নয়, শিক্ষার্থী ও শিখন পরিবেশের উপর নির্ভর করেও শিক্ষণ কৌশল নির্বাচিত করা হয়। উপযুক্ত শিখনের জন্য শিক্ষার্থীর মানসিক প্রস্তুতি থাকা একান্ত প্রয়োজন। শ্রেণীকক্ষে আদর্শ কৌশল বা পদ্ধতিতে পাঠদানের জন্য শিক্ষক ও শিক্ষিকারও প্রস্তুতি থাকা প্রয়োজন। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক-শিক্ষিকার কার্যকারিতা অনেকাংশেই পরিকল্পনার উপর নির্ভর করে।

ইলেকট্রনিক পোর্টফোলিও হল কোনো একটি ব্যক্তির বিভিন্ন কার্যকলাপের একটি প্রক্রিয়াভিত্তিক ইলেকট্রনিক তথ্যের সমষ্টি। এই ধরনের পোর্টফোলিও 'ডিজিটাল পোর্টফোলিও' বা 'অনলাইন পোর্টফোলিও" নামেও পরিচিত। এখানে ইলেকট্রনিক তথ্য বলতে ই-ফাইল, চিত্র, মাল্টিমিডিয়া, ব্লগ এবং হাইপারলিঙ্ককে বোঝানো হয়ে থাকে। ই- পোর্টফোলিওগুলি স্ব-প্রকাশের জন্য ব্যবহারকারীর দক্ষতা এবং প্ল্যাটফর্ম উভয়ই প্রদান করে থাকে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যুগে শিক্ষাসংক্রান্ত প্রায় সব ধরনের সহায়ক তথ্য ও শিখন সম্পদ ইন্টারনেটে পাওয়া যায়। শিক্ষার্থীদের নানা সমস্যা সমাধানের জন্য ইন্টারনেটে অনেক ওয়েবসাইট রয়েছে। এমন অনেক ওয়েবসাইট আছে যেখানে বিভিন্ন গাণিতিক কাজ করার ব্যবস্থা রয়েছে ও বিভিন্ন গাণিতিক সমস্যারও সমাধান পাওয়া যায়। বিভিন্ন বিষয়ের উপর তথ্য সরবরাহের জন্য নানান ধরনের ওয়েবসাইট আছে। যার মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থী খুব সহজেই তার নিজের বিষয়ের প্রচুর তথ্য পেয়ে থাকে। অনলাইন ব্যবস্থায় ইন্টারনেটের সাহায্যে এই ধরনের শিক্ষা সম্পর্কিত তথ্য বা সম্পদগুলিকে 'অনলাইন লার্নিং রিসোর্স (Online Learning Resource)' বলা হয়ে থাকে। আর ইন্টারনেটকে সঠিকভাবে ব্যাবহারের দ্বারা শিখন সম্পর্কিত তথ্য বা সম্পদগুলিকে সঠিকভাবে পরিকল্পনার মাধ্যমে তৈরি করা, খুঁজে পাওয়া, সংগঠিত করা, ব্যবহার করা ও ভবিষ্যতে ব্যাবহারের জন্য সঞ্চয় করে রাখা সম্পর্কিত সমগ্র প্রক্রিয়াটিকে শিখন সম্পদ ব্যবস্থাপনা (Learning Resources Management) বলা হয়ে থাকে।

Web Based Instruction (WBI)-এ www-এর মধ্য দিয়ে যে অসংখ্য তথ্যসংগ্রহ করা হয় তার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা দেওয়া সহজ হয়। অনেক সময়, Web Based Instruction যথেষ্ট সংগঠিত হয় এবং এর মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তথ্যগুলিকে সংগৃহীত করা যায়। এই প্রক্রিয়াতে, যিনি নির্দেশদান দিচ্ছেন এবং যারা তা গ্রহণ করছে উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্ভব হয়। Web Based Instruction, K-12 স্তরে অপেক্ষাকৃত কম সংগঠিত ও ব্যাপক। www-তে যে তথ্য তাতে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে এবং বিবরণী লেখার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীররা অন্যান্য বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত শিক্ষার্থী এবং বিশেষজ্ঞের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে জটিল কোনো সমস্যার সহজে সমাধান করতে পারে।

ইলেকট্রনিক মডিউলকে সংক্ষেপে ই-মডিউল বলা হয়। সাধারণভাবে বলা যায়, যে সকল কন্টেন্ট বা উপকরণ কোন ইলেকট্রনিক যন্ত্র বা যন্ত্রাংশের মাধ্যমে ব্যবহার করা হয় তাকেই ই-মডিউল বলা হয়। যে সকল যন্ত্র বা যন্ত্রাংশের মাধ্যমে আমরা ই-মডিউল ব্যবহার করি সেগুলোকে তথ্য-প্রযুক্তি ভিত্তিক যন্ত্র বা আইসিটি ডিভাইস বলা যায়। আইসিটি ডিভাইস এর মধ্যে অন্যতম প্রধান হল কম্পিউটার। কম্পিউটার ছাড়াও মোবাইল, টেলিভিশন, রেডিও, সিডিডিভিডি প্লেয়ার, টেপ রেকর্ডার, ইন্টারনেট মডেম, মাল্টিমিডিয়া প্রোজেক্টর, প্রিন্টার, স্ক্যানার, স্পিকার, ক্যামেরা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য আইসিটি ডিভাইস। এ সকল যন্ত্রের মাধ্যমে ব্যবহার্য প্রায় সব উপকরণই ই-মডিউল।

4.9 প্রশ্নাবলি (Questions)

1. পাঠ পরিকল্পনা বা নকশা বলতে কী বোঝ?
2. ডিজিটাল পাঠ নকশা প্রণয়নে লক্ষণীয় বিষয়গুলি কি কি?
3. ডিজিটাল পাঠ নকশার গুরুত্ব আলোচনা করো।

4. ইলেকট্রনিক পোর্টফোলিও কাকে বলে?
5. ই-পোর্টফোলিও প্রকারভেদ সংক্ষেপে বর্ণনা করো।
6. শিখন সম্পদ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে একটি টীকা লেখ।
7. ওয়েব ভিত্তিক নির্দেশদান কি?
8. ওয়েব ভিত্তিক নির্দেশদানের সুবিধা ও অসুবিধাগুলি লেখ।
9. ইলেকট্রনিক মডিউল বলতে কি বোঝ?
10. ই-মডিউলের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করো।
11. উদাহরণ সহযোগে ই-মডিউলের প্রকারভেদগুলির বর্ণনা দাও।
12. ই-মডিউল প্রস্তুতের পর্যায়গুলি আলোচনা করো।

4.10 তথ্যসূত্র (References)

- Das, Rumpa (2012). *Integrating ICT in Teaching Learning Framework in India : Initiatives and Challenges*. Journal of Multidisciplinary Studies.
- Koehler, M. J., & Mishra, P. (2009). What is technological pedagogical content knowledge? *Contemporary Issues in Technology and Teacher Education*, 9 (1), 60-70.
- Mehdipour, Y. & Zerehkafi, H (2013). Mobile Learning for Education: Benefits and Challenges. *International Journal of Computational Engineering Research*, 3 (6), 93-101.
- Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological Pedagogical Content Knowledge : A framework for teacher knowledge. *Teachers College Record*, 108(6), 1017-1054. doi: 10.1111/j.1467-9620.2006.00684.x.
- Vajargah, K. F., Jahani, S., & Azadmanesh, N. (2010). Application of ICTs in teaching and learning at university level: the case of Shahid Beheshti University. *The Turkish Online Journal of Educational Technology*, 9(2), 33-39.
- Erumbam, A. & Das, D. (2016). Information and communication technology and economic growth in India. *Telecommunications Policy archive*, 40(5), 412-431.

একক - 5 ❑ তথ্য নির্ভর দক্ষতা (Information Age Skills)

গঠন (Structure)

5.1 উদ্দেশ্য (Objectives)

5.2 ভূমিকা (Introduction)

5.3 ইনফো-স্যাভি স্কিল (Info-Savvy Skills)

5.4 ডিজিটাল এজ স্কিল (Digital Age Skill)

5.5 সারসংক্ষেপ (Summary)

5.6 প্রশ্নাবলি (Questions)

5.7 তথ্যসূত্র (References)

5.1 উদ্দেশ্য (Objectives)

এই অধ্যায়টি সমাপ্ত হওয়ার পরে, শিক্ষার্থীরা —

- শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির তথ্য-জ্ঞান ভিত্তিক দক্ষতার সম্পর্কে অবগত হবে।
- তথ্য-জ্ঞান ভিত্তিক দক্ষতার বিভিন্ন পর্যায়গুলিকে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারবে।
- প্রযুক্তিগত স্বাক্ষরতা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করবে।
- ডিজিটাল এজ স্কিলের অন্তর্গত বিভিন্ন দক্ষতাগুলির কার্যকারিতা সম্পর্কে অবগত হবে।

5.2 ভূমিকা (Introduction)

বর্তমান যুগ তথ্য প্রযুক্তির যুগ। একুশ শতকের এই বিপুল সম্ভাবনার যুগে প্রতিনিয়ত ঘটে যাওয়া বিভিন্ন তথ্যকে কাজে লাগিয়ে মানুষ সৃষ্টি করছে স্বপ্নীল, সুন্দর ও আকর্ষণীয় বিশ্বজগত। প্রতিদিন মানুষের জীবনে নতুন নতুন তথ্যের সমাবেশ ঘটছে। যার ফলে তথ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে দ্রুত। গড়ে উঠছে বিশাল তথ্য ভাণ্ডার। এজন্যই প্রয়োজন হয়েছে বিভিন্ন প্রযুক্তির, যাদের মাধ্যমে দ্রুত তথ্য আহরণ ও বিপণনের মাধ্যমে আজ জীবনে এসেছে গতি, দক্ষতা ও নানাবিধ সুবিধা। তাই, যে প্রযুক্তির মাধ্যমে

তথ্য আহরণ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, আধুনিকীকরণ ও বিতরণ করা যায় তাকেই আমরা তথ্য প্রযুক্তি বলি। এর সাথে যোগাযোগের রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক।

তথ্য প্রযুক্তিতে বর্তমানে যে সব মৌলিক উপাদান ব্যবহৃত হচ্ছে সেগুলো হল—কম্পিউটার, মডেম, টেলিফোন, মোবাইল ফোন, ক্যামেরা, অডিও-ভিডিও যন্ত্রপাতি, স্যাটেলাইট বা মাইক্রোওয়েভ মিডিয়া ইত্যাদি। আধুনিক প্রযুক্তির কল্যাণে এসবই আজ সহজলভ্য। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত আমাদের দেশেও তরুণ প্রজন্ম দ্রুত এই প্রযুক্তিবান্ধব হয়ে উঠছে এবং দৈনন্দিন জীবনে তা ব্যবহার করে বিশ্ব নাগরিক হয়ে গড়ে উঠছে। এর সুফল মিলছে। জনসংখ্যার যত বেশী অংশ এই প্রযুক্তি দ্রুত আত্মস্থ করতে পারবে ততই আমাদের মঙ্গল হবে।

বর্তমান বিশ্ব তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর এক আধুনিক বিশ্বে পরিণত হয়েছে। তথ্য প্রযুক্তি আজ উন্নত দেশের সমাজ ব্যবস্থায় বিপুল পরিবর্তন এনেছে। কম্পিউটার নির্ভর এই প্রযুক্তি সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে সহায়ক ও বিশাল সম্ভাবনাময় শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রূপ থেকে রাজনীতি, ফুটবল থেকে ফ্যাশন, জীবনের সর্বক্ষেত্রেই এর প্রভাব রয়েছে অপরিসীম। বদলে যাচ্ছে মানুষের চিন্তা-চেতনা, চাহিদা, অভ্যাস ও প্রবণতা। সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, বিজ্ঞান, ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যবস্থাপনা ও যোগাযোগে, শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে তথ্য প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার হচ্ছে। এর অবদান ছড়িয়ে পড়েছে সীমার মাঝে অসীম হয়ে। ঘরে বসে ই-লার্নিং, আউটসোর্সিং খুলে দিয়েছে এক বিশাল সম্ভাবনার দ্বার। সমকালে ওয়াইম্যাক্স, ই-গভর্নেন্স, ই-লার্নিং, এম-লার্নিং, ই-কন্টোল, ই-কমার্স, ই-ব্যাকিং, ওপেন সফটওয়্যার প্রভৃতি তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রে অত্যন্ত আলোচিত বিষয়। আমাদের মত দেশে এসব প্রযুক্তি নির্ভর ব্যবস্থা আত্মস্থ করে দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগের বিষয়টিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

5.3 ইনফো-স্যাভি স্কিল (Info-Savvy Skills)

Info-Savvy Skills বা তথ্য-জ্ঞান ভিত্তিক দক্ষতার অর্থ—যুক্তিপূর্ণ ভাবে সমস্যা-কেন্দ্রিক প্রশ্ন উত্থাপন, বিভিন্ন উৎস থেকে সম্পর্কিত তথ্য সন্ধান, সম্পূর্ণ-অসম্পূর্ণ, আসল-নকল, ভালো-মন্দ, সত্য-অভিমত এই সকল গুনের নিরীখে তথ্যের নিখুঁত বিশ্লেষণ, যথাযত পদ্ধতিতে ঐ বিশ্লেষিত তথ্যাদিকে পূর্বে চিহ্নিত সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োগ করা এবং শেষে এই সমগ্র প্রশ্নকরণ, সমস্যা চিহ্নিতকরণ, তথ্যের বিশ্লেষণ, সমস্যা সমাধানে প্রয়োগ পদ্ধতিগুলিকে স্বতস্ফূর্তভাবে, cybermatic-পদ্ধতিতে, প্রকৃতিগত দিক থেকে মূল্যায়ন করা।

যে ব্যক্তির মধ্যে পূর্বে উল্লিখিত দক্ষতাগুলির প্রকাশ ঘটে, তাকে info-savvy বলা হয়। Jean-LUC Picard-এর সমস্যা-সমাধান পদ্ধতি অনুযায়ী নিম্নলিখিত দক্ষতা সমূহ হল info-savvy skills।

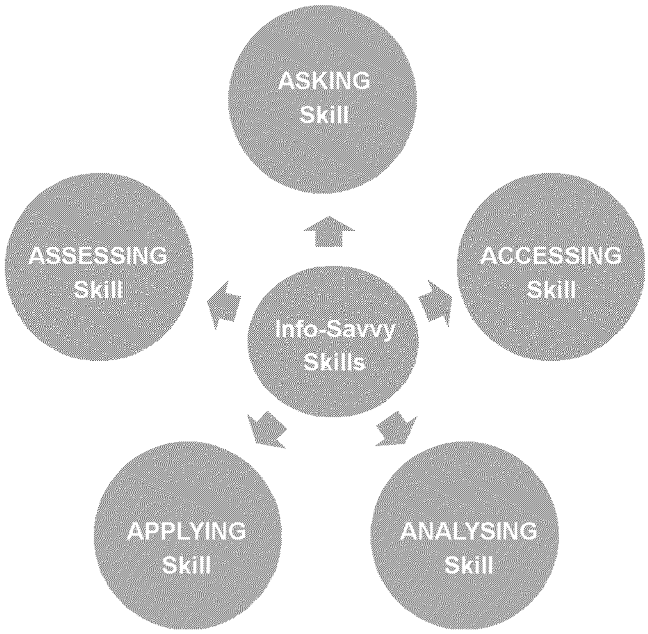

Figure-7

প্রশ্নকরণ করার দক্ষতা (Asking Skill) :

প্রশ্নকরণের মাধ্যমেই শিক্ষার্থীদের শিখন প্রক্রিয়ার সাথে সংযুক্ত করা সম্ভব। শিক্ষক নিজে কোনো বিষয়ের উপস্থাপনা করেন এবং শিক্ষার্থীদের ঐ নির্দিষ্ট বিষয়-কেন্দ্রিক প্রশ্ন তৈরী করতে সহযোগিতা করেন। এর মাধ্যমে গবেষণার সীমা আরো নির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করা যায়। শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের দ্বারা উত্থাপিত প্রশ্নগুলি তথ্যের প্রয়োজনীয়তা ও internet এবং অন্যান্য চিরাচরিত তথ্যের উৎস থেকে তথ্য অনুসন্ধানের সম্ভাব্য পথ সুনির্দিষ্টকরণে সহায়ক হয়। এই দক্ষতা নিম্নলিখিত উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত—

(a) সমস্যা শনাক্তকরণ (Identification of Problem) : শিক্ষার্থীদের সমস্যা চিহ্নিতকরণের ক্ষমতা থাকা জরুরী। তাদের পাঠ্য বিষয়, practice teaching, বিষয়-ভিত্তিক কাজ বা প্র্যাকটিকাল সম্পর্কিত কাজ সমস্যার উৎস হতে পারে।

(b) মূল শব্দ শনাক্ত করা এবং প্রশ্ন গঠন করা (Identifying Key Words and Forming Question) : সমস্যা চিহ্নিতকরণের পর শিক্ষার্থীদের এমন কিছু key words চিহ্নিত করার ক্ষমতা থাকতে হবে, যেগুলিকে কেন্দ্র করে সমস্যাটি বর্তমান। তবেই নির্দিষ্ট সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন নির্মাণে তারা সমর্থ হবে।

(c) মস্তিষ্ক প্রক্ষালন (Brain storming) : নির্দিষ্ট সমস্যা-কেন্দ্রিক Brain storming-এর দ্বারা

শিক্ষার্থীদের মনের মধ্যে থাকা ভাবের বহিঃপ্রকাশ সম্ভবপর হয়। তারা তাদের নির্দিষ্ট দ্বন্দ্ব্রা দ্রদ্রন্থ ও প্রশ্নগুলিকে আরো সুনির্দিষ্ট ও প্রয়োজন-ভিত্তিক রূপ দানে সক্ষম হয়।

(d) ভিন্নভাবে চিন্তা করা (Thinking laterallyùdivergently) : শিক্ষার্থীদের কখনই কোনো বিষয়ে একমুখী চিন্তন করা উচিত নয়। সমস্যাকেন্দ্রিক চিন্তা ভাবনার পাশাপাশি অন্যান্য সম্ভবনার কথাও তাদের ভাবা প্রয়োজন। তাদের কর্তব্য—একটি সমস্যার ভিত্তিতে একাধিক অনুমিতি নির্মাণ।

(e) নৈতিক বোধ (Understanding Ethical Issues) : কোনো সমস্যা সম্পর্কিত নৈতিকতার দিকগুলিও খুঁজে দেখা জরুরী। এই কাজে শিক্ষার্থীরা এমনভাবে অগ্রসর হবে, যাতে নৈতিকতার দিকগুলিও অবহেলিত না হয়। প্রত্যেক পেশারই কিছু নিয়ম-নীতি বর্তমান। তাদের ও সেগুলি মেনে চলা কর্তব্য। এইরকমই কিছু নীতিগত দিক হল—বিশ্বাসযোগ্যতা, সম্মান, দায়বদ্ধতা, স্বচ্ছতা, স্নেহশীলতা এবং নাগরিকবোধ।

(f) গভীরভাবে শোনা, বিজ্ঞতার সাথে দেখা এবং সমালোচনামূলকভাবে কথা বলা (Listening deeply, Viewing wisely and Speaking critically) : Listening deeply বা নিবিড় শ্রবণ বলতে, বোঝানো হয়েছে যে শিক্ষার্থীরা কেবল বহিরঙ্গের পরিবর্তে মনোযোগ সহকারে ভিতরে মানে বুঝে শোনার অভ্যাস করবে, সঙ্গে তা নিয়ে ভাববেও। যখন তারা কোনো ঘটনা দেখবে, সেই সময় বুদ্ধি-সহযোগে তার কারণ, উদ্দেশ্য, উপাদানগুলি নিরীক্ষণ করবে। তারা কথা বলা বা মতামত প্রকাশের সময় যুক্তি-সহকারে অগ্রসর হবে। তাদের বক্তব্যের গঠন, ব্যবহৃত উপমা, শব্দ ইত্যাদির প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। কোনো বক্তব্য পেশের আগে গভীরভাবে চিন্তা করে নেবে।

(g) তথ্য পরিশ্রুত করা (Filtering Information) : শিক্ষার্থীরা কেবলমাত্র গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মাথায় রাখা ও গুরুত্বহীন বিষয়বস্তুকে অতিরিক্ত গুরুত্ব না দেওয়া অভ্যাস করবে। অর্থাৎ, প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদির মধ্যে গুরুত্ব-ভিত্তিক চয়ন প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে হবে।

(h) ব্যক্তিগত জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা উপস্থাপন (Sharing Personal Knowledge and Experience) : শিক্ষার্থীরা তাদের অর্থিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সকলের সাথে ভাগ করে নেবে।

অধিগত করার দক্ষতা (Accessing Skill) :

Accessing stage বা অধিগতকরন পর্যায়ে প্রশিক্ষনরত শিক্ষকরা তথ্য-জ্ঞান ভিত্তিক যে কোনো প্রক্রিয়ার তথ্য সংগ্রহে নিযুক্ত হবেন। ইতিমধ্যে প্রারম্ভিক প্রশ্ন উত্থাপন ও গবেষনাক্ষেত্রের সীমায়িতকরণ হয়ে গেছে। এই পর্যায়ে সম্ভাব্য তথ্যের উৎস নির্বাচন এবং সেই তথ্য নিষ্কাশনের উপায় নির্নয়ই আসল লক্ষ্য। এই দক্ষতার উপাদানগুলি হল নিম্নরূপ-

(a) তথ্যের অবস্থান নির্ধারণ করা (Determining where the information is located) : তথ্যের সঠিক উৎসটি কোথায়, তা সর্বপ্রথম নির্ণিত হয়। এই উৎস খবরের কাগজ, গ্রন্থাগার, Internet ইত্যাদি হওয়া সম্ভব।

(b) তথ্য অন্বেষণে কী দক্ষতার প্রয়োজন তা নির্ধারণ (Determining what skills are needed to find information) : তথ্যের উৎস যাই হোক না কেন, শিক্ষার্থীদের মধ্যে সেই উৎসগুলি খুঁজে বের করার দক্ষতা থাকতে হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, যদি তথ্যের উৎস Internet হয়, তবে তাদের internet surfing-এর ক্ষমতা থাকতে হবে।

(c) বিভিন্ন কাগজপত্র এবং ইলেকট্রনিক উৎস-এর ব্যবহার (Using a variety of paper and electronic sources) : যে তথ্য সংগ্রহ প্রয়োজন, তার জন্য শিক্ষার্থীরা বিভিন্নপ্রকার উৎস, যেমন রেডিও, print, over head projector, দূরদর্শন, Internet প্রভৃতি ব্যবহার করবে।

(d) অনুসন্ধান কৌশলকে অগ্রাধিকার প্রদান (Prioritizing Searching Strategies) : তথ্যের প্রকৃতি অনুযায়ী তাদের গুরুত্ব প্রদান প্রয়োজন। তাদের মধ্যে সঠিক ক্ষেত্রে সঠিক মাত্রার গুরুত্ব প্রদানের দক্ষতা আসা জরুরী।

(e) প্রাসঙ্গিক তথ্যের জন্য স্কিমিং এবং স্ক্যানিং (Skimming and Scanning for Pertinent Data) : Skimming কথার অর্থ হল কেবল বিষয়ের শিরোনামে মনোযোগ আকর্ষণ। তবে শিক্ষণার্থীদের কখনও কখনও scanning-ও করতে হয়, যার অর্থ অভ্যন্তরস্থ সকল বিষয়েই নজরদান।

(f) পরিশ্রুত দক্ষতার ব্যবহার (Using Filtering Skills) : কোনটি সত্য, কোনটি কেবলমাত্র ধারণা, কোনটি মতামত, কিভাবে এই সকল বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য করা উচিত, কতটা পার্থক্য করা উচিত এই বিষয়ে শিক্ষার্থীদের সম্যক জ্ঞান থাকা জরুরী।

(g) স্মার্ট নোট নেওয়া (Taking Smart Notes) : শিক্ষার্থীদের smart notes নিতে শেখা জরুরী।

বিশ্লেষণ করার দক্ষতা (Analysing Skill) :

Analyzing বা বিশ্লেষন Info-Savvy পদ্ধতির ব্যবস্থাপনার স্তর। এক্ষেত্রে তথ্যের যথার্থতা, নির্ভুলতা এবং প্রামাণ্য বিষয়ের ভিত্তিতে বিচার্য হয়। সংগৃহীত-তথ্যের ব্যবহারযোগ্য তথ্যে রূপান্তর শুরু হয় এই স্তরে। সংগৃহীত তথ্যাদি সমস্যা সমাধানের জন্য যথেষ্ট, নাকি আরো গবেষণার প্রয়োজনীয়তা আছে, প্রশিক্ষনার্থীরা তার বিচার এই স্তরেই করে থাকেন। তথ্যের নথীভুক্তকরনও এই স্তরের গুরুত্বপূর্ন পদক্ষেপ। এই স্তরের উপাদানগুলি হল নিম্নরূপ-

(a) বিভিন্ন বিভাগে তথ্যের পৃথকীকরণ (Differentiating the data into different categories) : এক্ষেত্রে তথ্যের গুরুত্ব অনুযায়ী 'অত্যন্ত প্রয়োজনীয়', 'প্রয়োজনীয়', 'স্বল্পমাত্রায় প্রয়োজনীয়" ইত্যাদি শ্রেনীকরণ করা হয়ে থাকে।

(b) প্রাসঙ্গিক তথ্য শনাক্তকরণ (Identification of Relevant Data) : প্রয়োজনীয় তথ্যের সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিতকরণ।

(c) তথ্যের সত্যতা এবং বিশ্বাসযোগ্যতা প্রতিষ্ঠা করা (Establishing authenticity and credibility of the data) : তথ্যের সত্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা যাচাই ও প্রতিষ্ঠা করা এই স্তরের অংশবিশেষ।

(d) মতামতের ভিত্তিতে তথ্যের পৃথকীকরণ (Differentiating the facts from the opinion) : মতামতের থেকে সত্য ঘটনার পৃথকীকরণ।

(e) বিভিন্ন তথ্যের মধ্যে সম্পর্ক অন্বেষণ (Finding relationships amongst different data) : তথ্যের পরিমাণ যখন যথেষ্ট হয়, তখন সেই সকল তথ্যের পারস্পরিক সম্পর্ক খুঁজে বের করা শিক্ষার্থীদের কাজ, যার এই স্তরেই সূচনা হয়।

প্রয়োগ করার দক্ষতা (Applying Skill) :

উপাদানগুলি সুসজ্জিত করা ও বিশ্লেষন করার পর, সেগুলিকে সামগ্রিকভাবে অন্তিম পর্যায়ে উপস্থাপনযোগ্য করে তোলা জরুরী। এই দক্ষতা লিখিত তথ্য, চিত্র, চলচিত্র ও শব্দ এই চারপ্রকার তথ্যের সমন্বয়ের ভিত্তিতে উপস্থাপনা প্রস্তুত করা হয়। উপস্থ্যাপন প্রস্তুতির দ্বারা সংগৃহীত তথ্যকে ব্যবহারযোগ্য তথ্য তথা ব্যবহারযোগ্য জ্ঞানে রূপান্তরের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

মূল্যায়ন করার দক্ষতা (Assessing Skill) :

Info-Savvy প্রক্রিয়ার শেষ স্তর হল assessing বা মূল্যায়ন। মূল্যায়নের দ্বারা শিখনকে সুনিশ্চিত করা যায়। এর সাথে শিক্ষার্থীরা পূর্বজ্ঞানের সাথে সংযোগস্থাপনে সমর্থ হয় এবং পরবর্তীকালে ঐ একই প্রকার তথ্য সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানেও সক্ষম হয়। এই স্তরে নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করা হয় -

(a) সমস্যাটি কি সঠিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত হয়েছিল?

(b) ঐ সম্পর্কিত প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল?

(c) যথেষ্ট পরিমাণ তথ্য সংগৃহীত হয়েছিল?

(d) তথ্যগুলি কি সঠিকভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে?

(e) তথ্যের ব্যবহার কি সঠিকভাবে করা হয়েছে?

(f) সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান হয়েছে কিনা?

যখন কোনো শিক্ষার্থী এই পাঁচটি ধাপই সঠিক ভাবে উত্তীর্ণ হয়, তখন তাকে তথ্য ব্যবহারে স্বচ্ছন্দ বলা যেতে পারে। অর্থাৎ এটিও বলা যেতে পারে যে তথ্য ব্যবহারে স্বচ্ছন্দ হতে গেলে শিক্ষার্থীদের Info-Savvy দক্ষতাগুলিতে স্বচ্ছল হওয়া প্রয়োজন। তবে এর জন্য শিক্ষার্থীদের internet ব্যবহারে স্বচ্ছন্দ হওয়া খুবই জরুরী। তবেই তারা Info-Savvy হয়ে উঠতে পারবেন।

5.4 ডিজিটাল এজ স্কিল (Digital Age Skill)

Digital literacy বা প্রযুক্তিগত স্বাক্ষরতা হল বিভিন্ন প্রকার digital device ব্যবহারের জ্ঞান, দক্ষতা এবং আচরণ, যেমন- smart phones, tablets, laptops এবং desktop PC ইত্যাদি। এগুলির সবকটিকেই computer device এর বদলে network হিসাবে দেখা হয়। Digital literacy প্রাথমিকভাবে digital skill এবং computer সংক্রান্ত দক্ষতার দিকে নির্দেশিত হত। বর্তমানে এক্ষেত্রে network device-গুলিকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়।

Digital literacy সর্বতভাবে computer literacy € digital skill-এর থেকে আলাদা। Digital literacy-রই পূর্বসূরী Computer literacy। Computer literacy হল গতানুগতিক computer ব্যবহারের দক্ষতা, যেমন, desktop PCs এবং laptop। Computer literacy বিভিন্ন software application packages ব্যবহারের দক্ষতার সাথে সম্পর্কিত, Digital skills খুবই সমসাময়িক ধারণা। এই ধারণাটি laptop বা smart-phone-এর ব্যবহারিক দক্ষতার সাথে সম্পর্কিত।

Digital literacy হল digital এবং literacy এই দুই ধারনার সম্মিলন। যদিও প্রকৃতপক্ষে এটি ওই শব্দ দুটির সংযোগের থেকেও অধিক অর্থবহ। Digital information হল তথ্যের প্রতীকি উপস্থাপনা। আর literacy এক্ষেত্রে জ্ঞান আহরণের জন্য পাঠ, যুক্তিপূর্ণ লিখন স্বামর্থ ও লিখিত বিষয়বস্তু সম্পর্কে যুক্তিগ্রাহ্য চিন্তন ক্ষমতা।

Digital Age skills বা Digital Age Literacy skills-এর মধ্যে নিম্নের বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত-

মৌলিক সাক্ষরতা সম্পর্কিত দক্ষতা (Basic Literacy Skill) : সাধারণ ভাষাগত (ইংরাজী) এবং গাণিতিক দক্ষতা, যার সাহায্যে সাধারণ কাজে অংশগ্রহণ করা যায় এবং লক্ষ্যভিত্তিক কাজ করা

যায়। এর সাহায্যে এই প্রযুক্তি-নির্ভর যুগে একজন ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনে সক্ষম হয়। শিক্ষার্থীদের Basic Literacy-র শর্তাবলীগুলি হল—

- অবশ্যই ভাষাগত দক্ষতা থাকা প্রয়োজন।
- সাধারণ পাঠ, লিখন, শ্রবণ ও কথনের দক্ষতা।
- নিম্নলিখিত গুণমান তাদের মধ্যে থাকবে, যেমন-কখন তথ্য প্রয়োজন তা বোঝার ক্ষমতা, তথ্যের উৎস চিহ্নিতকরণের ক্ষমতা, সর্ব প্রকার তথ্য মূল্যায়ন ও স্বার্থকভাবে আত্তিকরণের সক্ষমতা।

বৈজ্ঞানিক সাক্ষরতা সম্পর্কিত দক্ষতা (Scientific Literacy Skill) : কোনো নির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক ধারণা বা পদ্ধতি সংক্রান্ত জ্ঞান ও বোধ যা কোনো ব্যক্তির সিদ্ধান্ত গ্রহন, সামাজিক বা সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ এবং বৃত্তি অর্জনে সহায়ক। শিক্ষার্থীদের Scientific Literacy-র শর্তাবলীগুলি হল—

- বর্তমান প্রযুক্তি-নির্ভর সমাজে অংশগ্রহনের জন্য প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বা পদ্ধতির জ্ঞান ও বোধ।
- দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা বা অনুসন্ধিৎসার ভিত্তিতে উত্থিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা, খোঁজা বা সেগুলির উত্তর নির্ণয়ের সামর্থ্য।
- প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর বিবরণ দান, ব্যাখ্যাকরণের দক্ষতা, অনুমানের ক্ষমতা।
- সাধারণ গণমাধ্যমে প্রকাশিত বিজ্ঞান বিষয়ক লেখা পড়ে বোঝার ক্ষমতা এবং তাতে বর্ণিত উপসংহারের গুণমান সংক্রান্ত ব্যাখ্যাদান বা আলোচনায় অংশগ্রহনের ক্ষমতা।
- সমাজ দেশ বা বৃহত্তর ক্ষেত্রে গৃহীত সিদ্ধান্তের বিজ্ঞানসম্মত কারণ চিহ্নিতকরণ ও বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দান।
- উৎস ও তথ্য আহরণের পদ্ধতির ভিত্তিতে কোনো বৈজ্ঞানিক তথ্যের গুণমান নির্ণয়ের ক্ষমতা।
- প্রামাণ্যের ভিত্তিতে এবং যুক্তির দ্বারা কোনো তথ্যের বিশ্লেষন ও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার ক্ষমতা।

অর্থনৈতিক সাক্ষরতা সম্পর্কিত দক্ষতা (Economic Literacy Skill) : অর্থনৈতিক সমস্যা, বিকল্প, লাভ-ক্ষতি চিহ্নিতকরণের ক্ষমতা; কোনো অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় প্রাপ্ত incentives-এর মূল্যায়ন; অর্থনৈতিক অবস্থা ও জননীতিতে পরিবর্তনের ফলাফল পরীক্ষণ; অর্থনৈতিক প্রামাণ্য সংগ্রহ ও

সজ্জিতকরণ; এবং লাভ ও ক্ষতির তুল্যমূল্য বিচার। শিক্ষার্থীদের Economic Literacy-র শর্তাবলীগুলি হল—

- অর্জিত জ্ঞানের সহায়তায় সম্পদের মূল্য, লাভ এবং সীমাবদ্ধতাগুলিকে মূল্যায়ন করে গ্রাহক, সঞ্চয়কারী, বিনিয়োগকারী বা নাগরিক হিসাবে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম।
- বিভিন্ন পদ্ধতির লাভ-ক্ষতির তুল্য-মূল্য বিচার করে বস্তু সম্পদ ও পরিষেবার বন্টনের বিভিন্ন পদ্ধতি মূল্যায়নে সক্ষম।
- বিভিন্ন আর্থিক সুবিধা কিভাবে কোনো ব্যক্তির আচরণকে প্রভাবিত করে তা সনাক্ত করতে পারবে এবং ঐ আর্থিক সুবিধা কিভাবে তাদের নিজেদের আচরণকে প্রভাবিত করে তাও অনুধাবন করতে পারবে।
- কিভাবে প্রতিযোগিতা, ঘাটতি ও উদ্বৃত্ত এবং ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে মিথষ্ক্রিয়া এই সকল বিষয় মূল্যকে প্রভাবিত করে তা বোঝার ক্ষমতা।
- Federal Reserve-সহ বিভিন্ন সর্বজনীন ও ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক সংস্থার ভূমিকা বিশ্লেষনের ক্ষমতা।
- আয়ের মূল নীতি, বন্টনের নীতি, সুদের হার, মূদ্রাস্ফীতি, বেকারত্ব, লগ্নী এবং ঝুঁকি এই সকল বিষয় সম্বন্ধে ধারণা।
- বিকল্প জননীতির লাভ ও ব্যয়ভার চিহ্নিতকরণে সমর্থ হবে এবং ঐ নীতিগুলির জন্য কারা লাভবান হবে ও কারা ব্যয়ভার বহন করবে তা বুঝতে পারবে।

প্রযুক্তিগত সাক্ষরতা সম্পর্কিত দক্ষতা (Technological Literacy Skill) : প্রযুক্তি কি, কিভাবে তা কাজ করে, কি কাজে তা ব্যবহৃত হতে পারে এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছাতে তা কার্যকারীভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে তা সম্বন্ধীয় জ্ঞান। শিক্ষার্থীদের Technological Literacy-র শর্তাবলীগুলি হল—

- প্রযুক্তি সংক্রান্ত সঠিক বোধ ও সেগুলি ব্যবহারের দক্ষতা।
- সামাজিক ও ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ধনাত্মক, নীতিসম্মত ব্যবহারের পদ্ধতি সম্বন্ধে অবগত।
- সৃজনশীল উৎপাদন বৃদ্ধিতে বিভিন্ন প্রকার প্রযুক্তির ব্যবহার দক্ষতা।
- শ্রেণীকক্ষের বাইরের জগতের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য বিভিন্ন প্রযুক্তির ব্যবহার ও নিজস্ব ধারনার কার্যকরী জ্ঞাপন দক্ষতা।

- বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের মূল্যায়ন, প্রক্রিয়াকরন ও সমন্বয়সাধনে প্রযুক্তির কার্যকরী ব্যবহার।
- বাস্তব জগতের বিভিন্ন সমস্যার চিহ্নিতকরন ও সমাধানে প্রযুক্তির ব্যবহারের সক্ষমতা।

দৃশ্যগত সাক্ষরতা সম্পর্কিত দক্ষতা (Visual Literacy Skill) : এমনভাবে চিরাচরিত ও সমসাময়িক প্রযুক্তির ব্যবহারের দ্বারা চিত্র ও চলচিত্রের ব্যাখ্যাকরণ, ব্যবহার, রসাস্বাদন এবং সৃষ্টির ক্ষমতা যা চিন্তাশক্তি, সিদ্ধান্ত গ্রহন, জ্ঞাপন ও শিখনে সহায়ক হয়। শিক্ষার্থীদের Visual Literacy-র শর্তাবলীগুলি হল—

- Electronic Media-র সাহায্যে উৎপন্ন বা প্রদর্শিত দৃশ্য সম্পর্কিত ব্যবহারিক জ্ঞান।
- দৃশ্যমান নক্সা, পদ্ধতি ও মাধ্যমের মৌলিক উপাদান সম্বন্ধীয় বোধ।
- চাক্ষুস ধারনার উপর প্রাক্ষোবিক, মানসিক, শারিরিক এবং বৌদ্ধিক প্রভাব সম্বন্ধে সচেতনতা।
- উপস্থাপনযোগ্য, ব্যাখ্যামূলক, বিমূর্ত ও সাংকেতিক চিত্রের অর্থ অনুধাবন।
- Electronic Media-এ দর্শিত তথ্যের জ্ঞানের ব্যবহারে সক্ষম।
- দৃশ্যমান তথ্যের দর্শক, সমালোচক ও গ্রাহক।
- কার্যকরি দর্শনভিত্তিক জ্ঞাপনে সক্ষম।

তথ্যগত সাক্ষরতা সম্পর্কিত দক্ষতা (Information Literacy Skill) : মিডিয়ার বিভিন্ন ক্ষেত্রের পরিসরে তথ্য মূল্যায়নের ক্ষমতা; কখন তথ্যের প্রয়োজনীয়তা আছে তা অনুধাবন করতে পারা; কার্যকরি ভাবে তথ্যের সনাক্তকরন, সমন্বয় সাধন ও ব্যবহার; এবং যোগাযোগ মাধ্যম ও ইলেকট্রনিক সম্পদের সাহায্যে উল্লিখিত কর্ম সম্পাদন। শিক্ষার্থীদের Information Literacy-র শর্তাবলীগুলি হল—

- সমস্যার সমাধানের জন্য কি জানা আছে ও কি জানা প্রয়োজন তা নির্ণয়ে দক্ষ।
- পাঠ্য, ব্যক্তি, চলচিত্র, ধ্বনি এবং তথ্যভাণ্ডার-সহ অন্যান্য তথ্যের উৎস চিহ্নিতকরনের ক্ষমতা।
- বিশ্বাসযোগ্যতা ও প্রাসঙ্গিকতার ভিত্তিতে তথ্যসম্পদের গুরুত্ব অনুধাবনের ক্ষমতা।
- উৎস থেকে প্রাসঙ্গিক তথ্য শনাক্তকরন ও আহরনে দক্ষ। শনাক্তকরনে সহায়তার জন্য প্রযুক্তির ব্যবহার।
- বিফল তথ্য-সংগ্রহ প্রক্রিয়ার পুনর্বিন্যাস।
- আহরিত তথ্য প্রকৃত সমস্যা সমাধানে কতটা সহায়ক বা সহায়ক নয় তা বোঝা।

- বিশ্বাসযোগ্যতা এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, আইনি ও নীতিগত প্রভাবকের নিরিখে তথ্যের মূল্যায়ন। মূল্যায়নে সহায়তার জন্য প্রযুক্তির ব্যবহার।

বহুসাংস্কৃতিক সাক্ষরতা সম্পর্কিত দক্ষতা (Multicultural Literacy Skill) : নিজ সংস্কৃতি ও অপর কোনো সংস্কৃতির প্রথাগত, রীতিগত ও বিশ্বাসগত মিল এবং অমিলগুলি উপলব্ধি করা ও তার সমাদর করা। শিক্ষার্থীদের Multicultural Literacy-র শর্তাবলীগুলি হল -

- কিভাবে তার নিজের ও অন্য সকলের ভাবনা ও আচরনের ধারা সাংস্কৃতিক বিশ্বাস, রীতিনিয়ম ও সংবেদনশীলতা দ্বারা প্রভাবিত হয়, সে সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল।
- বিশ্বাস, বহিরং ও জীবনচর্যার মিল ও বিভিন্নতাগুলির সমাদর করা।
- কিভাবে প্রযুক্তি সংস্কৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করছে তা বুঝতে পারা।
- মূলস্রোত ও মূলস্রোত বহির্ভূত দেশীয় সংস্কৃতির ইতিহাস সম্বন্ধে জানা।
- অন্যান্য সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতি গ্রহনযোগ্যতা।
- পক্ষপাত, স্বজাতিকতা, কুসংস্কার প্রভৃতি বিষয়ে সংবেদনশীলতা।

বিশ্বব্যাপী সচেতনতা সম্পর্কিত দক্ষতা (Global Awareness Skill) : আন্তর্জাতিক সংস্থা, দেশ-জাতি, অর্থনৈতিক সংস্থা, সংস্কৃতি-ভিত্তিক সামাজিক গোষ্ঠী এবং পৃথিবী ব্যাপী বিভিন্ন ব্যক্তির আন্তঃসম্পর্ককে বুঝতে পারা ও মান্যতা দান। শিক্ষার্থীদের Global Awareness-এর শর্তাবলীগুলি হল—

- ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত, সামাজিক, ভাষাগত ও প্রকৃতিগত দিক দিয়ে পৃথিবীর সকল দেশগুলি যে একই বন্ধনে আবদ্ধ, তার উপলব্ধি।
- এই সংযোগের ফলাফল যে ভালো-খারাপ দুইই হতে পারে তার উপলব্ধি।
- আন্তর্জাতিক নীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নিজ রাষ্ট্রের ভূমিকা অনুধাবন।
- আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও সংযোগের উল্লেখযোগ্য ধারাগুলি চিহ্নিত করা, বিশ্লেষন করা ও মূল্যায়ন করতে সক্ষম।
- এই ধারাগুলির সাথে আঞ্চলিক ও দেশীয় গোষ্ঠীর সম্পর্ক সম্বন্ধেও জ্ঞাত।
- বিশ্বস্তরে কোনো ঘটনার ব্যাখ্যা কিভাবে বিভিন্ন জাতীয় সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয় তা বোঝে
- প্রযুক্তির ব্যবহারের ক্ষেত্রে গৃহীত জাতীয় সিদ্ধান্তের উপর ভাবধারা ও সংস্কৃতির প্রভাব কিরূপ তা বোঝে।

- গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ ও আন্তর্জাতিক খবরাখবরের ব্যাপারে ওয়াকিবহাল থাকার মাধ্যমে বিশ্ব-সমাজে অংশগ্রহণ।

5.5 সারসংক্ষেপ (Summary)

তথ্য প্রযুক্তি আজ উন্নত দেশের সমাজ ব্যবস্থায় বিপুল পরিবর্তন এনেছে। কম্পিউটার নির্ভর এই প্রযুক্তি সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে সহায়ক ও বিশাল সম্ভাবনাময় শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রূপ থেকে রাজনীতি, ফুটবল থেকে ফ্যাশন, জীবনের সর্বক্ষেত্রেই এর প্রভাব রয়েছে অপরিসীম। বদলে যাচ্ছে মানুষের চিন্তা-চেতনা, চাহিদা, অভ্যাস ও প্রবণতা। সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, বিজ্ঞান, ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যবস্থাপনা ও যোগাযোগে, শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে তথ্য প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার হচ্ছে। এর অবদান ছড়িয়ে পড়েছে সীমার মাঝে অসীম হয়ে। ঘরে বসে ই-লার্নিং, আউটসোর্সিং খুলে দিয়েছে এক বিশাল সম্ভাবনার দ্বার। সমকালে ওয়াইম্যাক্স, ই-গভর্নেন্স, ই-লার্নিং, এম-লার্নিং, ই-কন্টোল, ই-কমার্স, ই-ব্যাকিং, ওপেন সফটওয়্যার প্রভৃতি তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রে অত্যন্ত আলোচিত বিষয়। আমাদের মত দেশে এসব প্রযুক্তি নির্ভর ব্যবস্থা আত্মস্থ করে দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগের বিষয়টিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তথ্য-জ্ঞান ভিত্তিক দক্ষতার অর্থ—যুক্তিপূর্ণ ভাবে সমস্যা-কেন্দ্রিক প্রশ্ন উত্থাপন, বিভিন্ন উৎস থেকে সম্পর্কিত তথ্য সন্ধান, সম্পূর্ণ-অসম্পূর্ণ, আসল-নকল, ভালো-মন্দ, সত্য-অভিমত এই সকল গুনের নিরীখে তথ্যের নিখুঁত বিশ্লেষণ, যথাযত পদ্ধতিতে ঐ বিশ্লেষিত তথ্যাদিকে পূর্বে চিহ্নিত সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োগ করা এবং শেষে এই সমগ্র প্রশ্নকরণ, সমস্যা চিহ্নিতকরণ, তথ্যের বিশ্লেষণ, সমস্যা সমাধানে প্রয়োগ পদ্ধতিগুলিকে স্বতস্ফুর্তভাবে, cybermatic-পদ্ধতিতে, প্রকৃতিগত দিক থেকে মূল্যায়ন করা। Digital literacy হল digital এবং literacy এই দুই ধারনার সম্মিলন। যদিও প্রকৃতপক্ষে এটি ওই শব্দদুটির সংযোগের থেকেও অধিক অর্থবহ। Digital information হল তথ্যের প্রতীকি উপস্থাপনা। আর literacy এক্ষেত্রে জ্ঞান আহরণের জন্য পাঠ, যুক্তিপূর্ণ লিখন স্বামর্থ ও লিখিত বিষয়বস্তু সম্পর্কে যুক্তিগ্রাহ্য চিন্তন ক্ষমতা।

5.6 প্রশ্নাবলি (Questions)

1. তথ্য-জ্ঞান ভিত্তিক দক্ষতা বলতে কী বোঝ?
2. তথ্য-জ্ঞান ভিত্তিক দক্ষতার অন্তর্গত দক্ষতাগুলি কি কি?
3. প্রশ্নকরণ করার দক্ষতা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করো।

4. অধিগত করার দক্ষতার উপাদানগুলি কি কি?
5. মূল্যায়ন করার দক্ষতার সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলি সম্পর্কে আলোচনা করো।
6. প্রযুক্তিগত স্বাক্ষরতা কাকে বলে?
7. ডিজিটাল এজ স্কিল সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করো।
8. মৌলিক সাক্ষরতা সম্পর্কিত দক্ষতা বলতে কি বোঝ?
9. শিক্ষার্থীদের বৈজ্ঞানিক সাক্ষরতা সম্পর্কিত দক্ষতার শর্তাবলীগুলি কি কি?
10. অর্থনৈতিক সাক্ষরতা সম্পর্কিত দক্ষতা বলতে কি বোঝ?
11. প্রযুক্তিগত সাক্ষরতা সম্পর্কিত দক্ষতা সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ।
12. তথ্যগত সাক্ষরতা সম্পর্কিত দক্ষতার শর্তাবলীগুলি কি কি?
13. বহু সাংস্কৃতিক সাক্ষরতা সম্পর্কিত দক্ষতা সম্পর্কে যা জান লেখ।
14. বিশ্বব্যাপী সচেতনতা সম্পর্কিত দক্ষতার সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলি আলোচনা করো।

5.7 তথ্যসূত্র (References)

- Das, Rumpa (2012). *Integrating ICT in Teaching Learning Framework in India: Initiatives and Challenges.* Journal of Multidisciplinary Studies.
- Koehler, M. J., & Mishra, P. (2009). What is technological pedagogical content knowledge? *Contemporary Issues in Technology and Teacher Education,* 9(1), 60-70.
- Mehdipour, Y. & Zerehkafi, H (2013). Mobile Learning for Education: Benefits and Challenges. *International Journal of Computational Engineering Research,* 3(6), 93-101.
- Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological Pedagogical Content Knowledge: A framework for teacher knowledge. *Teachers College Record,* 108(6), 1017-1054. doi : 10.1111/j.1467-9620.2006.00684.x.
- Vajargah, K. F., Jahani, S., & Azadmanesh, N. (2010). Application of ICTs in teaching and learning at university level : the case of Shahid Beheshti

University. *The Turkish Online Journal of Educational Technology,* 9(2), 33-39.

- Erumbam, A. & Das, D. (2016). Information and communication technology and economic growth in India. *Telecommunications Policy archive*, 40(5), 412-431.